বিহাইন্ড দ্য

ইসলামোফোবিয়া

রকিব মুহাম্মদ

হাবিবুর রহমান রাকিব

ইসলামবিদ্বেষ ও
ইসলামভীতির
প্রতিক্রিয়াজাত
অবিশ্বাস ও
সংশয়ের পথ
ছেড়ে
বিশ্বাস, শান্তি,
সত্য ও সুন্দরের
পথে আহবান...

যাদের লেখা ও অনুবাদে বইটি সমৃদ্ধ

নোম চমস্কি
এডওয়ার্ড ডব্লিও সাঈদ
ড. ইউসুফ কারজাবি
ড. হাতেম বাজিয়ান
ড্যানিয়েল হাকিকাতজু
দীপা কুমার
মুজতবা ফারুক
জুলিয়া গ্রিন
ইলিয়াস জাভেরি
মুহায়লিমুল হুদা
ড. আব্বাস বারজিগার
যয়নব এরেইন

মুজাহিদুল ইসলাম
হাবিবুল্লাহ বাহার
রাকিবুল হাসান
রকিব মুহাম্মদ
হাবিবুর রহমান রাকিব
জাবির মাহমুদ

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

ইসলাম একটি আদর্শিক জীবনব্যবস্থা। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় ইসলামের ভূমিকা অত্যুজ্জ্বল। ইসলাম তার আবেদন নিয়ে পৃথিবীর সমগ্র মানচিত্রে ছড়িয়ে দিয়েছে এক অনুপম প্রাণশক্তি। ইসলামের মহান আদর্শই ইসলামবিদ্বেষীদের প্রতিহিংসার কারণ। বিশ্বব্যাপী তাদের অনুদার ও সংকীর্ণ প্রচারণায় ইসলামকে প্রতিনিয়ত দানবীয় রূপে হাজির করা হচ্ছে। প্রোপাগাণ্ডার মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে 'ইসলামোফোবিয়া' তত্ত্ব। ফলশ্রুতিতে আধুনিক বিশ্বের অনেকের কাছেই ইসলাম একটি ভীতিকর শব্দ, তাদের কাছে ইসলাম ধর্মের অনুসারী মানেই সন্ত্রাসী-উগ্রপন্থী।

ইসলামবিদ্বেষী এ মহামারীতত্ত্ব ছড়িয়ে পড়ছে পশ্চিম থেকে প্রাচ্যে; এমনকি বাংলাদেশেও এ তত্ত্বের আমদানি করা হচ্ছে সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে। 'বিহাইন্ড দ্য ইসলামোফোবিয়া' বাংলাভাষায় এ বিষয়ে সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। বইটিতে দেশ-বিদেশের গবেষকদের অনুসন্ধানী কলমে উঠে এসেছে পাশ্চাত্যে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে অনৈতিক প্রচারণার স্বরূপ। বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে বয়ান করা হয়েছে কেন পাশ্চাত্য জগতে ইসলাম ও আরববিশ্বকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেমনটা তারা নয়! কেন ইসলামকে অতিরঞ্জিত প্রদর্শনীর মাধ্যমে দানবীয় ও সন্ত্রাসী ধর্মে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়! কীভাবে রাজনৈতিক প্রয়োজনকে বৈধতা দিতে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা ছড়ানো হয়।

সংকলনটির গুরুত্ব বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অমুসলিমদের লেখাও এখানে স্থান পেয়েছে। বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা সামনে রেখে

প্রতিটি লেখা সাজানো হয়েছে। বইটি পাঠ করে গভীর মননশীল ব্যক্তিমাত্র উপলব্ধি করতে পারবেন, ইসলামের অনুপম বিষয়াবলি নিয়ে বছরের পর বছর ধরে চলে আসা পশ্চিমের দ্বিমুখী বক্তব্য, নেতিবাচক ও অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিভঙ্গি। অথচ এর বিপরীতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ইসলামের শক্তিশালী অবস্থান ও মানবিক মূল্যবোধ—যার ওপর কখনো পশ্চিমা পণ্ডিতদের চোখ পড়ে না। এ সময়ের নানা রাজনৈতিক ও সামরিক মেরুকরণ, নাইন-ইলেভেনউত্তর পাল্টে যাওয়া বিশ্ব পরিস্থিতি ও পশ্চিমি করপোরেট রাজনীতি ও তথাকথিত মানবতার স্বরূপ সম্পর্কেও জানা যাবে।

পাঠকের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি—ব্যক্তিগতভাবে মিডিয়ায় আন্তর্জাতিক ডেস্কে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে 'ইসলামোফোবিয়া'র নানান ঘটনা দৃষ্টিগোচর হতো। প্রায় চার বছর ধরে এমন একটি কাজের প্রচেষ্টার চালিয়ে আসছি কিন্তু তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি একারপক্ষে। তবে বন্ধুবর হাবিবুর রহমান রাকিবের আন্তরিক সহায়তা আমাকে এ কাজে মনোযোগী হতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। উস্তাদ কামরুল হাসান নকীব সাহস যুগিয়েছেন সবসময়। তিনি বইটির আদ্যোপ্রান্ত পড়েছেন, সম্পাদনার কাজে সময় দিয়েছেন। আরও নানাভাবে সহায়তা করেছেন মুজাহিদুল ইসলাম, রাকিবুল হাসান, জাবির মাহমুদ, হাবিবুল্লাহ বাহার প্রমুখ। রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মুভমেন্ট পাবলিকেশন্স— এ পথে আলো জ্বালিয়েছে। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আল্লাহ তায়ালা উত্তম প্রতিদান দিন সবাইকে। আমিন।

রকিব মুহাম্মদ
মুগদা, ঢাকা
১.০৩. ২০২১

ইসলামোফোবিয়াঃ ইন দ্য ফিল্ড

মুজতবা ফারুক

ইসলামোফোবিয়ার উৎপত্তির ব্যাপারে বলা হয় যে, পারিভাষিকভাবে এই শব্দটি সর্বপ্রথম যুক্তরাজ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞের মতে, '১৯৯১ সালে insight নামী আমেরিকান একটি বইয়ে এই পরিভাষা সর্বপ্রথম নজরে আসে সবার।[১] ইটন ডিমেট এবং সুলাইমান বিন ইবরাহিম ১৯২৫ সালে ফ্রান্সে এটাকে পরিভাষা হিসেবে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। তাদের ভাষ্য ছিল—occes detive islamphobia, যদিও সে-সময় এই পরিভাষা; বর্তমান ব্যবহারিক পরিভাষার সমার্থক ছিল না। কোনো জিনিস ও কর্মে ভয় পাওয়াকে 'ফোবিয়া' বলা হয়। এজন্য শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষায় ব্যবহার হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ওই ব্যক্তি; যার পানিভীতি রয়েছে– তার জন্য হাইড্রোফোবিয়া পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। তেমনি একটি পরিভাষা হলো– ফোবোফোবিয়া। এই রোগের রোগী কোনো দুর্ঘটনা দেখা মাত্রই ভীতবিহ্বল হয়ে পড়ে। কারো কারো উচ্চতা ভীতি রয়েছে। তারা হলো অ্যাক্রোফোবিয়ার রোগী। মনোফোবিয়া; একটি মানসিক অসুস্থতার নাম। যে রোগের রোগী একাকিত্বকে ভয় করে। 'ফোবিয়া' (phobia) ভয়, ডর এবং ঘৃণা পোষণকে বলে। এটা বিবেকের এমনই অসুস্থতার নাম; যা কারো পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ভয় অথবা কারো প্রতি ঘৃণা প্রকাশের হালে দৃশ্যত হয়।[২] চেম্বার ডিকশানারিতে ফোবিয়ার এই অর্থ লিপিবদ্ধ আছে— afear, aversion, or hatred esp, morbid and irrational (এক ধরনের ভয়, বিদ্বেষ, ঘৃণা, সংঘাত এবং অযৌক্তিক।)

'ফোবিয়া' অযৌক্তিক এবং অসুস্থ চিন্তার নাম। যেটা ভীতি, অনাকাঙ্ক্ষা এবং ঘৃণায় ভরপুর। যখন 'ফোবিয়া' শব্দকে ইসলামের সাথে জুড়ে দেয়া হয়; তখন তার অন্তঃস্থিত অর্থ দাঁড়ায়- 'ইসলামভীতি, ডর এবং ঘৃণা' যেটা ইসলামবিরোধী এবং -বিদ্বেষীদের দিল ও দেমাগে নিবাসিত। ইসলামের বাস্তবিক দৃশ্যকে পাল্টে দেয়া। মুসলমানদের বদনাম করা। তাদের মূর্খ ও

---

[১] ক্রিস অ্যালেন, ইসলামোফোবিয়া, লন্ডন, ২০১০, পৃষ্ঠা- ৫

[২] অক্সফোর্ড ইংলিশ-উর্দু ডিকশনারী, শানুল হক হক্কী, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১২৩৩

দুর্ধর্ষরূপে উপস্থাপন এবং মানসিক ও মনোজাগতিক দিক থেকে তাদের পেরেশান করা। কঠোরতার নিশানা বানানো। মসজিদ ও ইসলামি ঐতিহ্যগুলোর ওপর হামলা করা। মুসলিমদের পোশাকের ওপর সার্কাজমের ট্যাগ লাগানো। তাদের সোনালি সভ্যতাসমূহ, বৈধ কর্মকাণ্ড এবং হকসমূহ থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি। ইসলামোফোবিয়ার পার্থক্যপূর্ণ ধরন ও যুদ্ধ রয়েছে। যদি উপযুক্ত শব্দে সেটাকে বয়ান করা যায়; তাহলে এই সূরত সামনে আসবে।

ইসলামোফোবিয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য- ইসলাম, মুসলমান, ইসলামি সভ্যতা, রাজনীতিতে ঘৃণা ও ভীতির প্রকাশ এবং বিবিধ কর্মকাণ্ড। ইসলামোফোবিয়া এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি; যার অনুগামী হিসেবে পৃথিবীর সমস্ত অথবা অধিকাংশ মুসলমান পাগল প্রতিপন্ন হয়। যারা অমুসলিমদের ব্যাপারে গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। ইসলামিক সহযোগী সংগঠন (oic) ইসলামোফোবিয়াকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে- ইসলামের বিপরীতে অযৌক্তিক, আঘাতস্বর্বস্ব এবং কঠিন অপ্রীতিকর প্রকাশের নাম- 'ইসলামোফোবিয়া'। তেমনিভাবে ইসলামোফোবিয়া বাহানায় মুসলমানদের আত্মিক, সামাজিক এবং সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে হয়রানি করা। ইসলাম মান্যকারীদের দেশ ও জাতির ঐচ্ছিক-সামাজিক-রাজনৈতিক এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেককে কর্তৃত্বহীন করাও অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীতে মুসলিম সংখ্যালঘুদের সাথে কার্যত এমন আচরণই করা হচ্ছে!

ইসলামবিরোধীদের পক্ষ থেকে এই মূর্খতাসূচক কথাকেও রিপিট করা হয় বারবার 'ইসলামের কোনো সভ্যতাই নেই। যদি থেকেও থাকে তবে সেটা পশ্চিমা সংস্কৃতির তুলনায় সবদিক দিয়েই কম।' এর প+াশাপাশি তারা নিজেদের উঁচু এবং মুসলমানদের হেয়জ্ঞান করে।

ফরাসি উপনিবেশিক শাসক Alain Quellien-কে মনে করা হয় তিনিই সর্বপ্রথম একটি লিখিত দলিলে 'ইসলামোফোবিয়া' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।[৩] আরেকজন উপনিবেশিক প্রশাসক Maurice Delafosse, যার উপনিবেশিক প্রশাসনের ভেতর মুসলিমদের প্রতি ঘৃণাবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। শাসক নীতিগতভাবেই মুসলমানদের প্রতি ঘৃণাবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন।

---

[৩] The Muslim Policy in West Africa, 1910

পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে ফিলিস্তিন বংশোদ্ভূত আমেরিকান লেখক এডওয়ার্ড সাঈদ এ শব্দটি ব্যবহার করেন। সম্ভবত তিনিই প্রথম একাডেমিক জার্নালে এই শব্দ ব্যবহার করেন। জন্মগতভাবে এডওয়ার্ড সাঈদ একজন আরব খ্রিস্টান। কিন্তু সারাজীবন কাটিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তার পিতা একজন আমেরিকান সৈনিক। একাধিকবার তিনি আমেরিকার হয়ে যুদ্ধ করেছেন। সাঈদ পড়াশেনাা করেছেন স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যলয়ে। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তিনি একজন বামপন্থী চিন্তার মানুষ ছিলেন।

সাম্প্রতিক সময়ে 'ইসলামোফোবিয়া' বলতে আমরা যা বুঝি, তার সঙ্গে আক্ষরিক অর্থের মিল কম। বরং বর্তমান সময়ের 'ইসলামোফোবিয়া' ধারণাটিকে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পরিচিত করে তোলে যুক্তরাজ্যভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান 'রানিমেইড ট্রাস্ট'। রানিমেইড ট্রাস্ট যুক্তরাজ্যের প্রথম সারির একটি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, যারা বর্ণবাদবিরোধী গবেষণা করে এবং সরকার ও পাবলিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

১৯৯৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি ১৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করে, যার প্রধান ছিলেন অধ্যাপক গরডন কনওয়ে। এই ১৮ সদস্যের কমিটিতে ধর্মীয় পরিচয়ের দিক থেকে মুসলিম, খ্রিস্টান, হিন্দু, শিখ ও ইহুদি সবাই ছিলেন। এই কমিটি যে রিপোর্টগুলো প্রকাশ করে, তার শিরোনাম ছিল- Islamophobia a Challenge For Us All। রিপোর্টটি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিডিয়া ও অন্যান্য মাধ্যম এটা ব্যাপক প্রচার শুরু করে। অনেকে রিপোর্টটিকে স্বাগত জানায়, আবার কেউ কেউ এর বিরোধিতা করে। রানিমেইড ট্রাস্ট-এর এই রিপোর্ট প্রায় ২০ বছর পর আরও ফলোআপ করে প্রকাশ করা হয় Islamophobia –still a challenge to us all শিরোনামে। ফলোআপ রিপোর্টটির শিরোনামে বোঝা যায়, অন্তত রানিমেইড ট্রাস্ট মনে করছে, এই সমস্যাটি এখনো আমাদের সবার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ। দেখা যাক, রানিমেইড ট্রাস্ট ইসলামোফোবিয়া বিষয়টিকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে এবং এর সাথে যুক্ত অর্থবহতার সমস্যাকে কীভাবে উল্লেখ করেছে। সেখানে রয়েছে-

> *"ইসলামোফোবিয়া শব্দটি ইসলামের প্রতি অদৃশ্যমান শত্রুতা বা শত্রুভাবাপন্নতাকে নির্দেশ করে। এটা আরও নির্দেশ করে এ ধরনের শত্রুভাবাপন্নতার কারণে মুসলমান ব্যক্তি ও সম্প্রদায় অন্যায্য বৈষম্যের শিকার হয় এবং তাতে যদি মুসলমান নাগরিকদের মূলধারার রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ড থেকে ভিন্ন করে দেয়া হয়।"*

উল্লেখিত এই সংজ্ঞাটি আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় রিপোর্টটিতে। যেখানে এই সংজ্ঞা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এভাবে-

"আসলে ইসলামোফোবিয়া রিপোর্ট এ শব্দটি সম্পর্কে যে বিষয়টি উল্লেখ করেছে তা হলো, ইসলামের প্রতি অদৃশ্যমান বিদ্বেষ এবং এই বিদ্বেষ থেকে বাস্তবজীবনে মুসলমান ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মানুষ অন্যায় বৈষম্যের স্বীকার হওয়া। বিষয়টি খুব পরিস্কার। ইসলাম বা মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের ফলে যদি মুসলিম ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে বৈষম্যের শিকার হতে হয়, মূলধারার রাজনীতি ও সামাজিক সংগঠনগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়, সেটাই ইসলামোফোবিয়া।"

ইসলামোফোরিয়ার ইতিহাস

এসব তো আজকালের আলাপ। কিন্তু একটু পেছনে দৃষ্টিপাত করলেই দেখতে পাব যে, শতবর্ষ-চলিত প্রোপাগান্ডা এসব। ইসলামের বিরুদ্ধে হিংসা, বাধা, ঘৃণা এবং ভীতি; আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছিল। যখন তিনি জনতার মাঝে আল্লাহর পয়গাম পৌছানো শুরু করেন। তখন ইসলামের শত্রুরা ইসলামের বিরুদ্ধে কঠিন চক্রান্তে মেতে ওঠে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে যেখানে পয়গাম পৌছাতেন; তারা সেসব জায়গায়ই গিয়ে হাজির হতো। তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অগ্রহণীয় অভিযোগ এবং আপত্তি দায়ের করতো যে, ইনি [হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] নাউজুবিল্লাহ 'জাদুকর এবং কবি' ইত্যাদি। এবং লোকদের বলে বেড়োত যে, তার কথায় যেন কেউ কর্ণপাত না করে!

তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো- যখন তোফায়েল বিন আমর দাউসি রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু মক্কা গমন করেন। তখন কুরাইশদের সেসব এলিট ব্যক্তিবর্গ যারা লোকদের হুজুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সান্নিধ্য থেকে দূরে রাখত- তারা তাঁর কাছেও পৌছে এবং বলে যে, "তিনি আমাদের মাঝে আবির্ভূত হয়ে বিভাজনের প্রাচীর তুলে দিয়েছেন। জানা নেই, তার জবানে কেমন জাদু লেপ্টে আছে। যার জোরে সে পুত্রকে পিতার বিরুদ্ধে, ভাইকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে এবং স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়। আমাদের আশঙ্কা হয় যে, তুমি এবং তোমার গোত্রও তাদের মতো তার দলে আবার

ভিড়ে না যাও! এজন্য আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ থাকবে– তুমি না তার সাথে সাক্ষাৎ করবে আর না তার কথা শুনবে!” উদ্দেশ্য হচ্ছে, ওই লোকেরা তাকে সর্বপন্থায় বুঝিয়েই নবি কারীম সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তার সাক্ষাৎ ঠেকিয়ে দেয়। হুজুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা কানে এসে যাওয়ার ভয়েই তোফায়েল দাউসি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজের কানে তুলা গুঁজে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরিশেষে নবিয়ে পাকের জবানে কুরআন শুনে তিনি হয়রান হয়ে যান এবং ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করেন।[৪]

যে কাফেলাই সামনে অগ্রসর হয়েছে; ইসলামের শত্রুদের ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভয় ও আশঙ্কা, বাধা ও ঘৃণাও ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। নবি যুগের পর ফারুকী যুগে যখন মুসলিমরা জেরুসালেম ও সিরিয়া বিজয় করে নিয়েছিল, তখন তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানারকমের চক্রান্ত শুরু করে। এরপর দ্বিতীয় খ্রিস্টশতকে মুসলমানরা ইউরোপের পশ্চিমাংশের দিকে অগ্রসর হয়ে সেখানে ইসলামের দেদীপ্যমান শিক্ষাকে বিস্তার করে। পরবর্তীতে সুলতান মুহাম্মদ আল ফাতিহ (৩০ মার্চ, ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দ-৩ মে, ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দ) সেই ধারায় আরও বিস্তৃতি এনে ইসলামি হুকুমতের পতাকা স্থাপন করেন। এজন্য কুস্তুনতনিয়াকেও (ইস্তাম্বুল) বিজয় করে নেন। এরপূর্বে ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে খ্রিস্টান ও ইহুদিবিশ্বের সম্মিলিত ক্রুসেড যুদ্ধে তারা কেবল ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভয়, ঘৃণা এবং বিপরীতধর্মী আত্মপ্রতিক্রিয়ার কথাই পরিবেশন করে গেছে। ইসলামের ইতিহাসে ক্রুসেড যুদ্ধের যুগটা অত্যন্ত নাজুক সময় ছিল। সমগ্র খ্রিস্টানবিশ্ব মুসলমান এবং তাদের ধর্মাদর্শকে মুছে ফেলার জন্য উঠেপড়ে লাগে। কিন্তু তারা বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে শত্রুশক্তির মোকাবিলা করে, তাদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেয়। এটাকে মুসলিম ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল কৃতিত্বই বলা চলে।[৫]

‘ইসলামোফোবিয়া’ সুবিন্যস্তভাবে ক্রুসেড যুদ্ধ থেকে শুরু হয়েছে। খ্রিস্টান বিশ্বের সৈন্যদলের আধিক্য এবং অগণিত মাধ্যম থাকা সত্ত্বেও ফলত কোনো লাভ হয়নি! প্রসিদ্ধ লেখক ও নান ক্যারেন আর্মস্ট্রং ইসলামোফোবিয়ার

---

[৪] শাহ্ মঈমুদ্দীন আহমাদ নদভী, মুহাজিরীন, দ্বিতীয় খণ্ড, দারুল মুসান্নেফীন, শিবলী একাডেমি আজমগড়, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ২৪৭

[৫] সায়্যিদ সাবাহুদ্দীন আব্দুর রহমান, সেলেবি জঙ্গ, দারুল মুসান্নেফীন, শিবলী একাডেমি আজমগড়, ২০০৫, পৃষ্ঠা- ৩৯

পরিচিতিতে লিখেন– ইসলামোফোবিয়ার ইতিহাস ক্রুসেড যুদ্ধের সাথে গিয়েই মেলে।[৬] খ্রিস্টানবিশ্বে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা এবং ভয় লালনের ইতিহাস লিখিত ও সংরক্ষিত আছে।

৯/১১-র পর ইসলামোফোবিয়া

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের প্রান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি; ২০ শতকের সমাপ্তি এবং আরেকটু খাস করে বলতে গেলে ৯/১১-র (১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ খ্রিস্টাব্দ) পর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে। ইসলামি শিক্ষা এবং মর্যাদাকে পশ্চিমারা তাদের পরিবেশিত উদার গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে সাংঘর্ষিক আখ্যা দিয়ে বলে– 'ইসলাম ও মুসলিমবিশ্ব পশ্চিমা চিন্তা-মর্যাদা ও সভ্যতার উপযুক্ত নয়!' এই দৃষ্টিভঙ্গির ছায়ায় পশ্চিম এবং ইউরোপ তদীয় সভ্যতার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার জন্য; ইসলামকে খারাপ নাম দেয়া এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিত্যনতুন যুদ্ধের ট্যাগ লাগাচ্ছে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ খ্রিস্টাব্দে যখন কতক দুঃসাহসী অবৈধভাবে আমেরিকা 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে' হামলা করে। এরপর পশ্চিম এবং পশ্চিমের আশ্রয়ে ক্ষমতাশালী নানাস্থানে মুখোশধারী পশ্চিমাদের হাতে ইসলামের শিক্ষা-সভ্যতা ও ইতিহাসকে নিশানা বানানোর ক্ষেত্রে কোনো ধরনের নীতিই ফলো করা হয় না। তখন থেকে এখন পর্যন্ত মুসলমানদের সভ্যতা ও রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে মসজিদ, স্কুল এবং ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপরও হামলা করা হচ্ছে।

পশ্চিমে একককথাই বরাবর রিপিট করা হচ্ছে যে, ইসলাম উগ্রবাদিতার মাধ্যম। আমেরিকায় মার্চ ২০০২ খ্রিস্টাব্দে চালিত একটা জরিপে উঠে আসে, দেশটির শতকরা ২৫ শতাংশ মানুষের মতামত ছিল এটা। এমনকি ২০১৪ সালে এই সংখ্যা বেড়ে ৫০ শতাংশে পৌঁছে যায়।[৭] ব্রিটেনের অবস্থা এই– ক্যারেন আর্মস্ট্রং লিখেন– '৯/১১-র পঞ্চম বর্ষপূর্তিতে পোপ রেনেডেকার্ট জার্মানিতে আক্রমণাত্মক বয়ান দিয়েছেন। তিনি ইসলামোফোবিয়ার চুল্লিতে ইন্ধন সরবরাহ করেছেন। তার প্রদেয় বয়ান থেকে এটাই বুঝে আসে যে, ইসলামোফোবিয়ার আন্দোলনে অবসরকাল যাচ্ছে। এবং পশ্চিমাবিশ্ব এক নতুন ক্রুসেডের প্রস্তুতিসমেত এগোচ্ছে।[৮]

---

[৬] ক্যারেন আর্মস্ট্রং, দ্যা গার্ডিয়ান, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬
[৭] দ্যা ওয়াশিংটন পোস্ট, ৩ ডিসেম্বর ২০১৫
[৮] ক্যারেন আর্মস্ট্রং, ৭ ডিসেম্বর ২০০৬

পশ্চিম ও ইউরোপে ইসলাম এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ব্যাপক হাস্যরসে রচর্চা করা হয় এবং তামাশা করা হয়। কেননা তাদের জানা আছে যে, মুসলমানরা রাসূলে আরাবির শিক্ষা এবং তাঁর ওপর তুলনাহীন বিশ্বাস রাখে। এজন্যই পশ্চিম এবং ইউরোপে সবযুগে, সবসময় আল্লাহর রাসূলের ওপর ঘৃণ্য আক্রমণ করা হয়েছে। ঠিক এখানটাতে এসেই তাদের প্রশাসনাধীন এবং এর বাইরের রকমারি সংগঠনগুলোর মুখোশও উন্মোচিত হয়ে পড়ে। চাই সেটা প্রশাসনই হোক অথবা কুচক্রী কোনো মহল কিংবা বুদ্ধিজীবী, লেখক, শাস্ত্রবিদ অথবা সাহিত্যিকদের কোনো সংস্থা বা সংগঠন; তাদের উদ্দেশ্য এটাই যে, এদের মধ্য থেকে প্রত্যেকটা শাখা অথবা স্তরের; উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের সবাই ইসলাম এবং নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তার ওপর হামলায় সচেষ্ট।

প্রসিদ্ধ পশ্চিমা প্রফেসর মন্ট গোমেরি ওয়াট নবিয়ে পাকের পবিত্র সত্তার ওপর কালিমা লেপন করে পশ্চিমা ইতিহাসের প্রকৃত অবস্থা বয়ানে বলেন– 'ইতিহাসের কোনো বড়ো ব্যক্তিকেই এমনতরো ন্যক্কারজনক পন্থায় উপস্থাপন করা হয়নি; যেমন নাকি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করা হয়েছে।'[৯]

পশ্চিমে এই জোয়ারই সর্বত্র ধাবমান। কেমন যেন ইসলাম এবং মুসলিম-রিলেটেড প্রত্যেকটা জিনিসের দ্বিতীয় নাম চরমপন্থি এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী। পৃথিবীতে যত মুসলিম নর-নারী রয়েছে; তাদের সবার ওপরই একচেটিয়া এই প্রশ্ন তোলা হয় যে, তাদের পাসপোর্ট সন্দেহযুক্ত! নেকাব ও হিজাব আবৃত মহিলারাও এই সন্দেহের শিকার। যে ধর্মাদর্শকে সবচে বেশি টার্গেট করে সমালোচনা ও ভর্ৎসনা করা হচ্ছে; সেটা কেবলই 'ইসলাম'। **csew** (ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের মধ্যে অপরাধ জরিপ সংস্থা) এর অনুসন্ধান মাফিক ঘৃণা এবং শত্রুতার শিকার সবচে বেশি মুসলিমরাই। যার পরিসংখ্যান শতকরা ৮ শতাংশ, এর বিপরীতে ইন্ডিয়াতে শতকরা ৩ শতাংশ, খ্রিস্টানরা শতকরা ১ শতাংশ, অবশিষ্ট সকল ধর্মমত মিলে ৫ শতাংশা।[১০] এই পরিসংখ্যানও ক্রমশ প্রবৃদ্ধমান।

---

[৯] মন্ট গোমেরি ওয়াট, মুহাম্মাদ এ্যাট মাক্কা, লন্ডন, ১৯৫৩, পৃষ্ঠা- ৫২

[১০] দেখুন, **www.news.org-** দ্যা ফেয়ার অব ইসলাম

৯/১১-র পর মুসলিমদের ওপর কঠোরতারও বহু ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়েছে। cair (council on american islamic relations এর অধীনে একটি জরিপ পরিচালিত হয়। সেই জরিপে বলা হয়– ২০০৬ সালে ২ হাজার ৪৭২টি হামলার ঘটনার মধ্যে সবগুলো মুসলমানদের ওপরই ঘটে।[১১] এর বিপরীতে যদি পশ্চিমে ৯/১১-র পর কোনো মুসলমান থেকে কোনো জুলুম বা ভুলের ঘটনা ঘটেও থাকে তখন কেবল সেটাকে সন্দেহের চোখেই দেখা হয়নি বরং আইনের আওতায়ও নিয়ে আসা হয়েছে। এবং ইসলামের ওপর আঙুলও উত্তোলিত হয়েছে। বিপরীতে যদি কোনো অমুসলিম থেকে এমন জুলুম অথবা ভুলের প্রকাশ ঘটতো তখন কেবল ঐ ব্যক্তিকেই সমালোচনার লক্ষবস্তুতে পরিণত করা হতো!

ইসলামোফোবিয়া এবং পশ্চিমা মিডিয়া

মিডিয়া ইসলামোফোবিয়ার শেকড় মজবুত করা এবং বিস্তারে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক স্বাক্ষর রাখছে। মুসলমানদের গোঁড়া, পথভ্রষ্ট, মূর্খ, চরমপন্থি ও পাগলরূপে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ৯/১১-র পর থেকে পশ্চিম এবং ইউরোপের কোনো কোনো সংবাদপত্র ও বই এমন ছিল না যাতে ইসলাম ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে বিষ ছড়ানো হয়নি! ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রগুলো প্রতিমাসে আনুমানিক ইসলাম ও মুসলিম-সম্পৃক্ত পাঁচ শতাধিক আর্টিকেল প্রকাশ করে থাকে। সেগুলোর মধ্যে প্রতিটা বিষয়ে শতকরা ৯১ শতাংশ নেতিবাচকতাই পরিবেশন করা হয়। আর ইতিবাচকতা শতকরা ৪ শতাংশ। এছাড়া শতকরা ৬০ শতাংশ সংবাদ বা লেখায় ইসলামকে ইহুদি ও পশ্চিমাবিশ্বের জন্য হুমকিস্বরূপ জ্ঞান করা হয়। হুজুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে তারা সজ্ঞানে যেসব ইঙ্গিতবাহী শব্দ ব্যবহার করে; সেসবই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তেমনিভাবে মুসলিমবিশ্বে কোনো পুরুষ বা নারী ইসলাম অথবা ইসলামের নবির চেহারা অঙ্কনের চেষ্টা করেছে; তখন পশ্চিমা ও ভারতীয় মিডিয়া সেটাকে মুসলিম উম্মাহর জন্য তাকে 'রোল মডেল'রূপে উপস্থাপন করেছে। যার নিকৃষ্ট উদাহরণ হলো, ভারতীয় বংশোদ্ভূত সালমান রুশদী, বাংলাদেশি তাসলিমা নাসরিন, পাকিস্তানের মালালা ইউসুফ এবং সোমালিয়ার ইয়ান হারছে আলী এখানটাতে আলো ফেলে। ক্যারেন আর্মস্ট্রং লিখেন– 'পশ্চিমা স্কলাররা

---

[১১] আব্দুর রশীদ মাতিন, দ্যা ওয়েস্ট ইসলাম অ্যান্ড দ্যা মুসলিম ইসলামোফোবিয়া অ্যান্ড এক্সট্রিমিজম

ইসলামকে কুরুচিপূর্ণ প্রকাশ এবং মানহানিকর ধর্মাদর্শ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন এবং ইসলামের নবির ওপর মিথ্যা অপবাদ ও ইসলামকে তরবারির জোরে প্রতিষ্ঠিত মাযহাব হিসেবে প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে বারবার উল্লেখ করেছেন।'[১২]

ইসলামোফোবিয়া এবং পশ্চিমা শাসকরা

পশ্চিম এবং ইউরোপে; মিডিয়া, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি শাসক স্তরের লোকজন ইসলামোফোবিয়াকে বিস্তারের জন্য আগ বেড়ে অংশগ্রহণ করছে। আমেরিকায় তাদের অনেক উদাহরণ ব্যাপকতা লাভ করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে ফ্রান্স এমন একটি রাষ্ট্র; যেখানে সবচে বেশি মুসলমান (৬০ লাখ) বসবাস করে। মেরিন লতপন ওখানকার মুসলিমবিরোধী দল ফ্রন্ট ন্যাশনালে (প্রতিষ্ঠা; ৫ অক্টোবর, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ) ২০১০ সালে বিবৃতি দেয় যে, 'যখন মুসলিমরা গলি এবং সড়কে ইবাদত করে তখন আমাদের এমন মনে হয় যে, নাৎসি প্রভাবাধীন জার্মান অঞ্চল দ্বিতীয়বার ফ্রান্স করায়ত্ব করবে।' প্রশাসনের মাধ্যমে তারা হিজাব এবং মুসলিম মুহাজিরদের আগমণের ধারাবাহিকতার ওপর অনুসন্ধান করে আসছে। ইসলামবিদ্বেষী ইউরোপীয় শাসকদের মধ্যে হল্যান্ডের ব্যবসায়ীরা অধিক প্রসিদ্ধ।[১৩]

ইসলামোফোবিয়া এবং জাতিগত কুসংস্কার

কতিপয় বিজ্ঞজনের মতানুযায়ী ইসলামোফোবিয়া মুসলমান ও আরবদের বিপরীত জাতিগত কুসংস্কারের নাম। ধর্ম এবং জাতিগত কুসংস্কার অধিক হারে রয়েছে ডেনমার্ক, জার্মানি, হাঙ্গেরি, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, গ্রিস ও ইটালিতে।[১৪] পশ্চিমবিশ্ব এবং ইউরোপে মুসলমানদের জন্য **others** অর্থাৎ 'অপর' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

ডক্টর মোসেলা তানকেরি (হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি) লিখেন—

'ইউরোপ ও পশ্চিম; ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রথম থেকে শত্রু-জ্ঞান করে আসছে। মধ্যযুগ থেকে মুসলিমদের পশ্চিমবিশ্বে ভিন্ন নজরে দেখা হয়েছে। বিশেষত তুর্কি, গোত্র, ব্যক্তি এবং সেক্যুলারদের ভিত্তির ওপরই পশ্চিমারা এমন এক দৃষ্টিভঙ্গির ধারাবাহিকতায় ধাবমান; যার অধীনে ইসলামকে

---

[১২] ক্যারেন আর্মস্ট্রং, মুহাম্মাদ : এ বায়োগ্রাফি অব দ্যা প্রোফেট, নিউইয়র্ক, ১৯৯২

[১৩] সায়্যিদ আসেম মাহমুদ, দুনিয়ায়ে মাগরিব মে বাড়তা হোয়া ইসলামোফোবিয়া, লাহোর

[১৪] নিউজ উইক ১৫ মে ২০১৫

আদর্শহীন ট্যাগ লাগানো যায়। মুসলিমদের পরিচিতিকে উপযুক্ত আকাঙ্ক্ষা জ্ঞান করে অভ্যন্তরীণ শত্রুর দৃষ্টিতে দেখা হয়। এর পাশাপাশি পশ্চিমা সভ্যতার সাথে ইসলামকে বহিরাগত লড়াকু শত্রুও মনে করা হয়।[১৫]

অস্ট্রেলিয়ায় মুসলমানদের বিমুগ্ধ ব্যবহার এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা; বিধর্মীদের মোকাবিলায় আনুমানিক তিনগুণ বেশি করতে হচ্ছে। শতকরা ৬০ জন লোকের ভাষ্য এমন ছিল যে, তাদের ইসলামোফোবিয়ার কারণে অনেককিছুর মোকাবিলা করতে হয়েছে।[১৬] এমনিভাবে এয়ারপোর্টে, বিমানে ওঠা-নামার সময়ও মুসলমানদের সন্দেহের চোখে দেখা হয়। ২০১৫ সালের নভেম্বরে আমেরিকার অঙ্গরাজ্য শিকাগো থেকে ফিলাডেলফিয়াগামী বিমানের দুজন ভ্রমণার্থীকে সেই সন্দেহের জেরে বিমানে আরওহণে বাধা দেয় হয়। কেননা তারা আরবিতে কথোপকথন করছিল। যুক্তরাজ্য মুসলমানদের ওপর আক্রমণের হার ক্রমশ বৃদ্ধিই পাচ্ছে।[১৭] মুসলমানরা নিজেদের পশ্চিমা এবং ইউরোপের দেশগুলোতে দিনদিন শেকড়হীন, বিচ্ছিন্নই মনে করছে।

ভাষান্তর: জাবির মাহমুদ

---

[১৫] www.commongroundnews.org
[১৬] রোজনামা ইনকিলাব, নয়াদিল্লী, ১ ডিসেম্বর ২০১৫
[১৭] রোজনামা ইনকিলাব, নয়াদিল্লী, নভেম্বর ২০১৫

ফিলহাল ইসলামোফোবিয়া

ড. ইউসুফ কারজাবি

পশ্চিমের দেশগুলোতে ক্রমবর্ধমান ইসলামভীতি মুসলমান-খ্রিস্টান ঐতিহাসিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ককে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে। দুঃখজনকভাবে ইসলামভীতির প্রসারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী পশ্চিমের শক্তিশালী গণমাধ্যমগুলো। যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে আন্তর্জাতিক জায়নবাদী চক্র ও তাদের দোসররা। ইতোপূর্বে পশ্চিম সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিপজ্জনক লাল অক্ষ, চীনকে বিপজ্জনক হলুদ অক্ষ ও ইসলামি বিশ্বকে বিপজ্জনক সবুজ অক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। আফগানিস্তানে তালেবানের হাতে ঐতিহাসিক পরাজয়ের মধ্য দিয়ে পতন ঘটে পশ্চিমের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ও সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান ঘোষিত দুষ্টরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের। উদীয়মান প্রতিদ্বন্দ্বী চীনও পশ্চিমের সাথে একটা অলিখিত মীমাংসায় পৌঁছায়। ফলে পশ্চিমারা নতুন শত্রু হিসেবে ইসলাম ও মুসলমানদের মূর্তিমান করতে উঠেপড়ে লাগে। কারণ শত্রুবিহীন কোনো আদর্শ বা রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। দীর্ঘ নির্জীবতার পর ইতোমধ্যে নড়েচড়ে বসেছে মুসলিমবিশ্ব। স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটির সর্বত্র শিক্ষিতমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে ইসলামি চেতনার নব জাগরণ। গৌরবময় অতীতের মিশেলে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগা সমকালকে রূপায়ণের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে মুসলিম তরুণরা। পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো যুগ যুগ ধরে মুসলিম বিশ্বে যেভাবে দখলদারিত্ব, নিপীড়ন-নির্যাতন ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন চালিয়ে এসেছে। তারই যৌক্তিক প্রতিক্রিয়া এ মহাজাগরণ।

অবশ্য পশ্চিমের অনেক নিরপেক্ষ চিন্তক ও গবেষক ইসলাম নিয়ে পশ্চিমা মিডিয়ার একদেশদর্শী ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছেন। এদেরই একজন ওয়াশিংটনের জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির ধর্ম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও ইসলামি স্টাডিজের প্রখ্যাত অধ্যাপক জন এস্পোসিতো [John Esposito]। তিনি "দি ইসলামিক থ্রেট : ফ্যাক্ট অর মিথ" শীর্ষক বইয়ে দেখিয়েছিলেন কীভাবে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে ইসলামভীতির মিথ তৈরি করা হয়।

এটি পশ্চিমের প্রাচীন ব্যাধি

পশ্চিমাদের মাঝে ইসলামকে ঘিরে আতঙ্ক একেবারেই নতুন কিছু না। পশ্চিমা গবেষক, রাজনীতিবিদ এবং ধর্ম পণ্ডিতদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে সেটাই দেখাব আমরা। আমি আমার "ইসলামি সমাধানের শত্রুগণ" শীর্ষক বইতে বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করেছি। তাৎপর্যপূর্ণতার বিচারে এখানে সেই আলোচনার নির্বাচিত অংশটি তুলে ধরছি।

'ইসলামি পুনর্জাগরণের অন্ধবিরোধিতাকারীদের মধ্যে একেবারে প্রথম সারিতে আছে পশ্চিমা ঔপনিবেশিকরা। দেখুন প্রখ্যাত ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ H.A.R. Gibb (১৮৯৫-১৯৭১) ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলন নিয়ে কি ভয়াবহরকম শঙ্কিত। তিনি বলছেন, "ইসলাম কেবলই কিছু ধর্মাচারের সমষ্টি নয় বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা। এ সভ্যতার বিপজ্জনক দিকটি হলো এটি স্থান ও কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে পুরো মুসলিমজাতিকে একত্রিত করে রাখে। যা একটি বিপজ্জনক রাজনৈতিক অক্ষ তৈরিতে দারুণ সহায়ক। যে অক্ষের উত্থানের মানে হলো ইউরোপের জগতবিচ্ছিন্নতা ও পরাজয়। কারণ ভৌগোলিকভাবে ইউরোপ চারদিক থেকে মুসলিম ভূখণ্ড বেষ্টিত"।[১৮]

পাশ্চাত্য বেশ ভালো করেই জেনেছে যে, ইসলাম একটি সর্বব্যাপী বিপ্লবী আদর্শ। যা ব্যক্তির জন্মকাল থেকে মৃত্যু অবধি ব্যপ্ত। এ আদর্শ ব্যক্তিকে অন্য কোনো জাগতিক কিংবা ধর্মীয় মুবাদ- হোক তা প্রাচ্যদেশীয় কিংবা পাশ্চাত্যদেশীয়, গ্রহণ করতে অনুমতি দেয় না। ইসলাম তার অনুসারীদের এ সম্পর্কে গর্বিত হতে শিক্ষা দেয়। দীক্ষা দেয় শক্তি অর্জন ও আগ্রাসী শত্রুর হিংসা প্রতিরোধক জিহাদের। যা মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ও পুণ্যকাজ হিসেবে বিবেচিত হয়।

পাশ্চাত্য এও জেনেছে যে, মুসলিমজাতি জন্মভূমি, ভাষা ও বর্ণে যতই আলাদা হোক না কেন, ভ্রাতৃঐক্য লঙ্ঘন এখানে অমার্জনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। এ ঐক্যের ভিত অনেক গভীরে প্রোথিত। এটি মুসলমানদের আবেগ অনুভূতি ও চিন্তাজগতকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী সব সীমাবদ্ধতা ও পার্থক্য এর উত্তাপে দ্রবীভূত হয়।

ইসলামের বিপুল সুপ্ত শক্তি ও ভ্রাতৃচেতনা নিয়ে পাশ্চাত্যের শঙ্কার সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক উদাহরণগুলোর মধ্যে একটি হলো ফ্রান্সের সাবেক উপনিবেশ

[১৮] আল ইত্তিজাহাতুল ওয়াতানিয়্যা; ডক্টর মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ হুসাইন [২/১৯৮]

মন্ত্রকের পরামর্শক ও বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ গ্যাব্রিয়েলের Gabriel Hanotaux। এই লেখকের একটি নিবন্ধ ১৯০০ সালে কায়রোর আল মুয়াইয়াদ পত্রিকায় অনূদিত হয়ে ছাপা হয়। এটা আরববিশ্বে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছিল। মিসরের তৎকালীন প্রধান মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহু গ্যাব্রিয়েলের নিবন্ধের প্রান্তিকতা ও ভ্রান্তি তুলে ধরে নিরপেক্ষ সমালোচনা করেছিলেন।

গ্যাব্রিয়েল তার নিবন্ধে দেখিয়েছেন, কীভাবে এশিয়ার মুসলিমরাা তেজোময় দ্রুততায় পুরো উত্তর আফ্রিকা বিজয় করেছিল। তিনি তুলে ধরেছেন ইসলাম ও খ্রিস্টবাদের মাঝে বিরাজমান দীর্ঘ সংঘাতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও উনবিংশ শতকে ইসলামের ওপর খ্রিস্টবাদের আধিপত্য অর্জনের বয়ান। তবু তিনি শঙ্কিত কারণ ইউরোপকে একদিকে মরক্কো অন্যদিকে কনস্টান্টিনোপলের [ইস্তাম্বুল] মতো মুসলিম ভূখণ্ডগুলো ঘিরে আছে। তিউনিসিয়া, আলজেরিয়ার মতো ফরাসি উপনিবেশগুলো তো বটেই, খোদ ফ্রান্সেও এক্ষণে বিপুল সংখ্যায় মুসলমান বসবাস করছে। ইসলাম আজ পৃথিবীব্যাপী বিরাজমান। মরক্কো, লিবিয়া, মিশর আর যীশুর স্মৃতিসম্পদ ও মানবতার উৎসভূমি জেরুসালেমেও আজ পতপত করে উড়ছে ইসলামের গৌরব পতাকা। শুধু কি তাই! সুদূর চীনেও পৌঁছে গেছে ইসলামের অনুপম আদর্শ। সেখানে আজ ২ কোটি মুসলমানের বসবাস। মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনুযায়ী এ সংখ্যা সামনের বছরগুলোতে দশ কোটিতে পৌছাবে।[১৯]

এটি মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ পৃথিবীর এমন কোন স্থান নেই যেখানে ইসলাম পৌছেনি। এটিই একমাত্র ধর্ম যাতে কোনো ধরনের জোরজবরদস্তি ছাড়াই লাখ লাখ মানুষ গ্রহণ করেছেন । আজও অন্য যেকোনো ধর্মের চেয়ে ইসলাম সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক ও জীবন্ত। তদুপরি এই ধর্ম থিতু হয়ে আছে খ্রিস্টবাদের স্মৃতিভূমি কনস্টান্টিনোপলে। [২০] খ্রিস্টান জাতিগুলো দুর্ভেদ্য এ নগরী রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। হারিয়েছে

---

[১৯] এটি ফরাসি পররাষ্ট্র মন্ত্রকের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির দেয়া তথ্য। আরও কয়েক দশক পূর্বে প্রখ্যাত লেবানিজ চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ আমির শাকিব আরসালান চীনের মুসলমানদের সংখ্যা পঞ্চাশ লাখ উল্লেখ করেছেন।

[২০] গ্যাব্রিয়েলের কথার সাথে যোগ করে বলতে চাই, আমরা শুধু কনস্টান্টিনোপলেই নই, আছি আলবেনিয়া, কসোভো ও বসনিয়ায়। এছাড়া আরো অনেকগুলো ইউরোপীয় দেশে মুসলমানদের সংখ্যা একেবারেই ফেলে দেয়ার মতো না

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরের নিয়ন্ত্রণ। এভাবে পশ্চিমের দেশগুলো একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

ইসলামি ঐক্যের শক্তি

গ্যাব্রিয়েল আরও বলেছেন, ইসলাম পৃথিবীর সকল মুসলমানকে একই সূত্রে গেঁথেছে। এটি তাদের চিন্তা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। পৃথিবীর সুদূর প্রান্তের মুসলমানরা মনে মনে স্বপ্ন লালন করেন পবিত্র গৃহ কাবার সান্নিধ্য পাওয়ার। জমজমের স্বর্গীয় পানীয় আর রুপোর ফ্রেম বাধানো পবিত্র কালো পাথরের ছোঁয়া তাদের হৃদয়ে ধর্মীয় ভালোবাসার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বালায়। লাখো উপাসক[২১] একজন মাত্র ইমামের পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে নীরবে শ্রবণ করে কুরআনের এই বাণী, 'আল্লাহর নামে শুরু করলাম যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়াময়। সমবেত স্বরে সমস্ত লোকজন বলে ওঠে 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ মহান)।' অতঃপর পরম শ্রদ্ধায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহর স্মরণে।

তিনি আরও বলছেন, মনে করবেন না আমরা ফরাসিরা তিউনিসিয়া ও আলজেরিয়ার পরাধীন মুসলমানদের জগতের অন্য মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছি কিংবা তাদের স্বাধীনচেতা মনোভাব ও সংহতি নষ্ট করতে পেরেছি। আমাদের কলোনীগুলো যদিও ইসলামি ভূখণ্ড না কিন্তু মুসলিম পণ্ডিতরা এসব অঞ্চলকে যুদ্ধকবলিত ঘোষণা করেছে। যা তাদের আত্মচেতনা অটুট রেখেছে, হৃদয়ে জাগরুক রেখেছে ইসলামের প্রতি অসম্ভব ভালোবাসা। ইসলাম আজও তাদের বড়ো অংশটির কাছে সর্বোচ্চ প্রিয় ও শ্রদ্ধেয়। আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন মুসলমানদের অবস্থা সেই সিংহীর মতো যে চরম ক্রুদ্ধ হয়ে বন্দি শাবকের খাঁচার চারপাশে ঘুরঘুর করে। হতে পারে খাঁচার বুনন অসম্পূর্ণ কিংবা দুর্বল।

সবশেষে গ্যাব্রিয়েল উপসংহার টেনে বলেন, উপর্যুক্ত আলোচনা একথাই নির্দেশ করে যে, বিপর্যস্ত কিন্তু অদম্য এ জাতির সংহতি ও চিন্তা-চেতনার প্রোজ্জ্বল্য আমাদের জন্য হুমকিই হয়ে আছে।[২২]

গ্যাব্রিয়েলের এ নিবন্ধটি বেশ খোলামেলাভাবে আমাদের সামনে ইসলামকে ঘিরে পাশ্চাত্যের ভয়ংকর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে। বিশ্বাস ও আচারকেন্দ্রিক

---

[২১] হজ আমাদের সংহতির অনন্য নিদর্শন। ২০০৯ সালে ভয়াবহ ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারির মধ্যেও ৩০ লাখ মানুষ এতে অংশ নিয়েছে

[২২] তারিখুল উস্তাযিল ইমাম [২/৪০২-৪২৪], আল ইত্তিজাহাতুল ওয়াতানিয়্যা ফিল আদাবিল মুয়াসির, ডক্টর মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ হুসাইন [২/৩৪৭]

মুসলিম ভ্রাতৃঐক্য পাশ্চাত্যকে কতটা ভাবিত করে তাও সুস্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। গ্যাব্রিয়েল কথাগুলো অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বললেও পশ্চিমের অবস্থান যে একদমই বদলায়নি, তা-ই প্রমাণ করে সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমে ঘটমান ও ক্রমবিস্তারমান মুসলিমবিরোধী হিংসাগুলো।

ধর্মপণ্ডিতদের ইসলামভীতি

খ্রিস্টান মিশনারিদের মুখপত্র 'দি ইসলামিক ওয়ার্ল্ডের' একজন লেখক ইউমান লিখছেন, পশ্চিমা বিশ্বের কিছুটা ভীত হওয়া উচিত। কারণ মক্কায় আবির্ভূত হওয়ার পর ইসলাম কখনোই সাংখ্যিকভাবে দুর্বল হয়নি বরং মুসলমানদের সংখ্যা হু হু করে বেড়েছে। আমরা আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কখনোই পুরো একটি জনগোষ্ঠীকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে পারিনি। আদতে ইসলাম কেবলই একটি ধর্ম নয়, এটি একটি লেলিহান শিখা। যার প্রজ্জ্বালক জিহাদ।

ধর্মযাজক ক্যালহাউন সিহোন লিখেছেন, ইসলাম তামাটে বর্ণধারী জাতিগুলোর মাঝে মহাজাগরণের সৃষ্টি করেছে। তারা আজ ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পেতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আমাদের মিশনারিদের লক্ষ্য হলো ইউরোপের সভ্যতাকে হাইলাইট করে যুবসমাজকে আকৃষ্ট করা এবং ইসলামি শক্তিগুলোর মৌলিক শক্তি বিনষ্ট করা।

প্রফেসর লরেন্স ব্রাউন তার "ইসলাম অ্যান্ড দ্য মিশনারি" বইতে লিখেছেন, ঐক্যবদ্ধ একটি আরব রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে মুসলমানরা যদি ঘুরে দাঁড়াতে পারে তবে এটি পুরো পৃথিবীর জন্য বিপজ্জনক অভিশাপ কিংবা অনন্য আশীর্বাদ হতে পারে। আর যতদিন তারা শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে ততদিন পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহে তাদের কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকবে না। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত তার অন্য একটি বইতে লিখেছেন, "ইসলাম তার সুপ্ত প্রাণবন্ততা ও সম্প্রসারণশীলতার কারণে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে"।

ব্রাউনের বক্তব্যগুলো একেবারেই পরিষ্কার। মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই। এটি পাশ্চাত্যের গভীরে প্রোথিত ইসলামভীতির প্রতিই নির্দেশ করে। ইসলামের মধ্যপন্থা, ন্যায়নিষ্ঠতা, প্রাণোচ্ছলতা, ঐক্যচেতনা, সম্প্রসারণ ধর্ম, স্বাধীনচেতা মনোভাব ও জিহাদের বাধ্যবাধকতা পাশ্চাত্যের দুশ্চিন্তার অন্যতম কারণ।

উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলন ইসলাম পরিচালিত ছিল

ইসলামের প্রচার পদ্ধতি ও নব উজ্জীবনের কারণে পাশ্চাত্য শঙ্কিত। কারণ ইতোমধ্যেই সবগুলো মুসলিম দেশে দখলদার পশ্চিমারা রীতিমত নাকানি-চুবানি খেয়েছে। যদিও এসব আন্দোলন সংগ্রামের ফল সেক্যুলাররা লুটেছে কিন্তু আন্দোলনগুলো ইসলামপন্থিরাই করেছে। মিসরে নেপোলিয়নের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল, এর নেতৃত্বে ছিলেন আল আজহার বিশ্ববিদ্যলয়ের সম্মানিত আলিমরা। ফরাসিরা আজহারকে ঘোড়ার আস্তাবল বানিয়ে এর প্রতিশোধ নিয়েছিল। সুদানে ব্রিটিশদের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল, এর অগ্রভাগে ছিলেন মুহাম্মাদ আল মাহদি। যিনি ছিলেন একজন মহান আলিম। মিত্রশক্তি ও গ্রিসের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তুরস্কে যে আন্দোলন হয়েছিল, তা আগাগোড়া ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের আন্দোলন ছিল। যদিও এর ফলটা ভোগ করেছে কামালপন্থি সেক্যুলাররা। লিবিয়ায় ইতালির দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল, এর নেতৃত্ব দিয়েছেন "মরু সিংহ" উমার আল মুখতার। যিনি ছিলেন প্রখ্যাত আলিম।

মরক্কোর পল্লি অঞ্চলে স্পেনবিরোধী যে গণবিপ্লব হয়েছিল, তার নেতৃত্বে ছিলেন মরক্কোর গুরুস্থানীয় আলিম আবদুল কারিম আল খততাবি। পল্লি আন্দোলন দমাতে দখলদার স্পেন পুরো ইউরোপের সাহায্য নিয়েছিল। ধর্মযাজক উইলিয়াম ক্যাশ তার "ইসলামিক ওয়ার্ল্ড ইন রেভুল্যাশন" গ্রন্থে আবদুল কারিম খততাবির বিপ্লব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বেশ শ্লেষ নিয়ে বলেন, প্রাচীন আরব্য চেতনাধারী গ্রামীণ বিদ্রোহীদের সাথে লড়তে গিয়ে স্পেনীয়রা মরক্কোর সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ নগরীর নিয়ন্ত্রণ হারায়। উপকূলের সিউটা ও মেলিলার মতো অল্প কটি নগরীই শুধু বাকি ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথম কোনো ইউরোপীয় বাহিনী মুসলমানদের কাছে হেরেছে। অবশ্য তুর্কিরাও গ্রিসকে এশিয়া মাইনর থেকে বিতাড়িত করেছে।

আলজেরিয়ার সফল স্বাধীনতা আন্দোলন, যাতে ১৫ লাখ মুসলমান শহিদ হয়েছেন। এ আন্দোলনের মুজাহিদদের মূল চেতনা শক্তি ছিল ইসলাম। সে সময় ফ্রান্স ও তার দোসররা স্লোগান দিত– "আলজেরিয়া ফরাসি"। আর মুজাহিদরা প্রতিবাদী স্লোগান ওঠাতেন– ''আলজেরিয় জাতি মুসলমান, আরব্যবোধ তার চেতনা"। যেটি ছিল স্বাধীন আলজেরিয়ার স্বপ্নদ্রষ্টা শাইখ ইবনু বাদিস প্রদত্ত।[২৩]

[২৩] The Moslem World in Revolution by W.Wilson Cash, London 1928, P- 5

রাজনীতিবিদদের ইসলামভীতি

সাবেক ফরাসি প্রধানমন্ত্রী Guz Mollet বলেছেন, মরক্কোর ক্রমবিস্তৃত ইসলামি আন্দোলন আমাদের সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের জন্য হুমকি। ফ্রান্সের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী Geovrges Bidult ঘোষণা করেছিলেন, আমি কখনোই চাঁদকে ক্রুশের ওপর বিজয়ী হতে দেব না। ফরাসি লেখক ও রাজনীতিবিদ Farancis Jeanson তার L'Algérie hors বইতে লিখেছেন, '১৯৯৫ সালে শুরু হওয়া আলজেরীয় স্বাধীনতা আন্দোলন শুধুই ধর্মীয় বা জাতিগত কোনো আন্দোলন নয়। এটি নিপীড়ক শাসকের পীড়ন থেকে মুক্তির আন্দোলন। হ্যাঁ, ইসলাম আলজেরীয় মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রেরণা। আলজেরীয়রা প্রথম দিনেই বুঝেছিল ফরাসিরা তাদের মুসলিম পরিচয় মুছে দিতে চায়। সুতরাং মুক্তি পেতে হলে ইসলামকে সাথে করেই মুক্তি পেতে হবে।' [২৪]

পশ্চিমা রাজনীতিবিদরা প্রায়ই কোনো ধরনের রাখঢাক না রেখেই ইসলাম নিয়ে নিজেদের শঙ্কার কথা বলছেন। কারণ মুসলিম দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদ ও ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যতগুলো আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে সবগুলোর পেছনে সক্রিয় ছিল ইসলামি চেতনা। প্রখ্যাত ইহুদি ঐতিহাসিক বার্নার্ড লুইস রচিত 'দ্য মিডল ইস্ট: ব্রিফ হিস্ট্রোরি অব লাস্ট ২০০০ ইয়ার্স'' বইতে এসবের বিস্তারিত বিবরণ পাবেন।

আফগান জিহাদ

ইসলামি বিশ্বে সর্বশেষ আলোচিত প্রতিরোধ আন্দোলন আফগানিস্তানের সোভিয়েতবিরোধী গণজিহাদ। লালবাহিনীর সর্বাত্মক স্থল ও আকাশ হামলা উপেক্ষা করে ২০ লাখ আফগান জীবন বিলিয়ে অর্জন করেছিলেন স্বাধীনতা। পরাভূত হয়েছিল হানাদার লালবাহিনী। পতন হয়েছিল তৎকালীন পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের।

পশ্চিমীকরণের সাফল্য সত্ত্বেও উদ্বিগ্ন পশ্চিমারা

পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো ইসলামি বিশ্বে পশ্চিমাকরণের যে এজেন্ডা হাতে নিয়েছিল তা আজ অনেকাংশেই সফল। শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি, সমাজ ও শিক্ষাঙ্গনের সর্বত্র এর অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব। এতদসত্ত্বেও পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তি পর্যবেক্ষকরা ইসলামি শক্তিগুলোর আকস্মিক উত্থানের বিষয়ে শঙ্কিত।

---

[২৪] L'Algérie hors de loi bz Farancis Jeanson, 267-268

ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ H.A.R. Gibb লিখছেন, ভয়ংকর ও বিস্ময়করভাবে উত্থান ঘটছে ইসলামি আন্দোলনগুলোর। পর্যবেক্ষকদের সব ধারণা ভণ্ডুল করে দিয়ে যেকোনো সময় বিস্ফোরিত হতে পারে ইসলামি আন্দোলনগুলো। সালাহুদ্দিন আইয়ুবির মতো যোগ্য নেতৃত্বেরই শুধু ঘাটতি।[২৫]

জার্মান লেখক হেনরি কুস্তার ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত পলিটিক্যাল ইসলাম[২৬] শীর্ষক নিবন্ধে লিখেন, "মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান ঘটনাপ্রবাহে ইসলাম কতটা প্রভাব বিস্তার করে আছে তা পাশ্চাত্যের কাছে সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, এ অঞ্চলের ঘটনাপ্রবাহ অনেকাংশেই ইসলাম নিয়ন্ত্রণ করে। এশিয়া ও আফ্রিকায় ঘটমান নানা ঘটনার পেছনে আছে মুহাম্মাদি বিশ্বাস। এটি বাস্তব সত্য, যদিও পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীরা তা মানতে না চান"।

সমসাময়িক ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ অ্যান্টনি নাটিং তার "দি অ্যারাব" বইতে লিখেছেন, "সপ্তম শতকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সংগঠিত হওয়ার পর থেকে আরবরা ক্রমসম্প্রসারিত হয়েছে। যা এখনও থেমে নেই। পশ্চিমা বিশ্বের উচিত ইসলামকে শক্তিশালী ও স্থায়ী শত্রু হিসেবে বিবেচনায় নেয়া। যা ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে পশ্চিমা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করছে। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় মুসলমানরা তেরো শতাব্দী সবল-দুর্বল সর্বাবস্থায় খ্রিস্টান বাহিনীর মোকাবেলা করেছে"।[২৭] এ হলো মুক্তচিন্তার ধ্বজাধারী পশ্চিমের রাজনীতিবিদ, চিন্তক ও পর্যবেক্ষকদের উপলব্ধি।

ইউরোপের বর্তমান বাস্তবতায় ইসলামভীতি

এ তো মোটামুটি পুরনো কিছু বক্তব্য। যদিও ইউরোপের বর্তমান বাস্তবতায় এগুলো নতুন মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এইতো সেদিন ২০১০ সালের শেষদিকে সুইজারল্যান্ডের চরম ডানপন্থি খ্রিস্টান রাজনৈতিক দল সুইস পিপলস পার্টি দেশটিতে মসজিদের মিনার নির্মাণের ওপর নিষেধাজ্ঞার আইন চালু করার লক্ষ্যে এক গণভোটের আয়োজন করে। ৫৭ শতাংশ সুইস জনগণ

---

[২৫] আল ইত্তিজাহাতুল ওয়াতানিয়্যা, ২/২১৬

[২৬] রাজনৈতিক ইসলাম শিরোনামটি ইউরোপীয়দের সৃষ্ট বিভ্রান্তি। যা সাইদ আশমাভির মতো পশ্চিমা দাসরা ব্যাপক প্রচলন দেয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আদতে ইসলামে রাজনৈতিক অরাজনৈতিক কোনো ভাগ নেই। ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ধর্ম যাতে রাজনীতিসহ সকল বিষয়ের সহজ সুন্দর সমাধান রয়েছে

[২৭] আল গযউল ফিকরি; প্রফেসর জামাল কুসক, পৃ- ২১

তাদের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। এ ঘটনা ইউরোপে ইসলামবিদ্বেষী মনোভাবের তীব্রতা ফুটিয়ে তুলেছে। গণভোট আয়োজনকারীদের যুক্তি ছিল মুসলমানরা আজ মিনার নির্মাণ করে সাংস্কৃতিক প্রভাব বাড়াচ্ছে তো কাল শরিয়াহ আইনের দাবি তুলবে।

ওআইসি, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাতিসংঘের কর্মকর্তারা এর নিন্দা জানিয়েছেন। ভ্যাটিকান এ ফলাফল নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ইসলামি ধর্মতাত্ত্বিকদের অভিজাত সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলারস এক বিবৃতিতে গণভোট আয়োজন নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে মুসলমানদের ইসলামি দাওয়ার পরবর্তী পর্যায়ের মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানায়। পাশাপাশি মুসলমানদের নিজেদের মধ্যকার মতপার্থক্য ও ভেদাভেদ ভুলে ধৈর্যের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ধরে রাখার পরামর্শ দিয়েছে।

পুরো বিষয়টি ইউরোপে তীব্র ইসলামবিদ্বেষের সৃষ্টি করেছে। গণভোটের কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে হল্যান্ডের কট্টর ডানপন্থিরা তাদের দেশে অনুরূপ গণভোট আয়োজনের দাবি জানায়। অস্ট্রিয়ার ফ্রিডম পার্টি ও ফ্রান্সের ফ্রন্ট ন্যাশনালও একই পথে হাঁটছে।

ইউরোপে খ্রিস্টবাদী চরমপন্থার উত্থান নিঃসন্দেহে মুসলিম তরুণদের ক্ষুব্ধ বরং অনেক ক্ষেত্রে খ্রিস্টবাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তুলবে। তারা বিশ্বাস করবে যে, পাশ্চাত্যের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ফাঁকা বুলি ছাড়া কিছুই নয়। সশস্ত্র পদক্ষেপ ও শক্তি প্রয়োগই এর একমাত্র সমাধান। তবু আমরা আশা হারাতে চাই না। আমরা আমাদের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান ধরে রাখতে চাই। এটিই ইসলামের মহান শিক্ষা। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেই ইসলামোফোবিয়ার মোকাবেলা হোক।[২৮]

ভাষান্তর : হাবিবুল্লাহ বাহার

---

[২৮] বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত কিছু আলোচনা ফিকহুল জিহাদ বইয়ের নবম সংযুক্তিতে আছে। আগ্রহী পাঠক দেখে নিতে পারেন।

কল্পিত ইসলামোফোবিয়া এবং ভয়ের পলিটিক্স

ড. হাতেম বাজিয়ান

১৪ মার্চ ২০১৬। ভিয়েনার উইনার এভিয়েশনে চলছে রিপাবলিকানদের নির্বাচনি প্রচারণা। প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্দেশে সাংবাদিক এন্ডারসন কপারের ছুড়ে দেয়া প্রশ্ন– 'যদি ইসলাম পশ্চিমাদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে' এর জবাবে সে বলে, "আমার ধারণা মুসলিমরা আমাদের ঘৃণা করে। তাতে ভয়ংকর রকমের ঘৃণা রয়েছে। আমাদের হতে হবে সজাগ ও সতর্ক। মুসলিম ও আমেরিকার প্রতি ঘৃণা পোষণকারী ব্যক্তিদের আমরা এ দেশে প্রবেশাধিকার দিতে পারি না।"

এভাবেই বিভিন্ন টকশো ও টিভি সংবাদে ট্রাম্প প্রদত্ত তথ্যাবলি বেতার ও জনজীবনে ইসলামোফোবিয়ার পরিব্যপ্তি ঘটায়। সেখানে মিডিয়ার সম্প্রচারে ও প্রকৃত সত্য গ্রহণের পরিবর্তে আরও অমার্জিত-নকল গ্রহণে আর আদর্শিক ভদ্র বর্ণবাদের চাল চালার প্রয়োজনে তারা বারবার কর্তৃত্ব ফলিয়ে যাচ্ছে।

মিডিয়ার সম্প্রচার ও জাতীয় আলাপন ইসলামোফোবিয়ার এমন এক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে, যা ইসলাম, মুসলমান এমনকি সামাজিক চিন্তা-চেতনাকে প্রভুত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ফেলে। পশ্চিমা দেশগুলোতে দীর্ঘদিন ধরেই ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে মনগড়া গল্প-কাহিনি নির্মাণাধীন রয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা ক্রুসেডে ফিরে যাওয়ার আশঙ্কার উদ্রেক করে। এই অলীক উপাখ্যানে ইসলাম ও মুসলিমদের মনগড়া ও কল্পিত এক ছাঁচ ও কাঠামোতে বিবেচনা করা হয়। ফলে তারা কখনো স্বাধীনভাবে আলাপচারিতার কিংবা এই মনগড়া গোলকধাঁধার বাইরে যাওয়ার অনুমোদন পায় না। প্রকল্পিত, স্বাপ্নিক ও সূচিত এমন এক অভ্যন্তরীণ ক্লোজ সার্কিটব্যবস্থায় ইসলাম ও মুসলিমদের কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে, যা সর্বদাই তাদের চিন্তার দিকে ফিরে আসে। ইসলামকে কোণঠাসা করতেই তাদের ইসলামোফোবিয়া ছড়ানোর এই প্রকল্প। একটি চলচ্চিত্র অলীক স্থান, সময় ও মানবিক মিথক্রিয়া তৈরি করে, যা একবার পেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই (সমাজে) নির্মিত বিষয়ে আলোচনার কাঠামো তৈরি করতে শুরু করে। জর্জ লুকাস প্রতিষ্ঠিত Star Wars অপেরার সমৃদ্ধ, অবাস্তব ও অলীক চলচ্চিত্রগুলোর মতো ইসলামোফোবিয়ার জালও সফলভাবেই বিছানো হয়েছে। কল্পনাসই

ইসলামোফোবিয়া গঠনে নিপুণ হাতে তৈরি হয় বিভিন্ন চরিত্র ও উপজীব্য দিয়ে বিন্যস্ত চলচ্চিত্র, তা দেখার প্রভাবে মানুষজন প্রাত্যহিক জীবনে লাভ করে ইসলামোফোবিয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা। সংবাদ ও সামাজিক নেতাদের ইচ্ছামতে নিপুণভাবে পুনর্গঠিত কাল্পনিক চিত্রায়ণে প্রাত্যহিক জীবনকে প্রভাবিত করে।

অধিকন্তু যখন এক মুহূর্তের জন্য বা সম্পূর্ণ ত্রুটির মধ্যে উপাখ্যানটি কল্পিত আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় তখন একে প্রভাবশালী আদর্শিক (পশ্চিমা আদর্শ) বলে চালানোর পরিবর্তে কল্যাণকর প্রত্যাশায় নির্মিত বলে ইঙ্গিত করা হয়। আর ঠিক তখনই মুসলমানদের ভালো-মন্দ ফ্রেমে আবদ্ধ করার সময় ব্যতিক্রমী কণ্ঠগুলো পশ্চিমা অদর্শকে superior হিসেবে প্রতিফলিত করে। ফলে ইসলামোফোবিয়ার কাল্পনিক রূপ চূড়ান্ত সফলতার মুখ দেখে।

কাল্পনিক এ ইসলামোফোবিয়া ইসলাম ও মুসলিমদের এক সংকুচিত ফ্রেমে আবদ্ধ করে দেখে যা নেতিবাচক আর কেবল সহিংস ও সন্ত্রাসবাদের সম্পৃক্ততায় গড়ে উঠেছে। শুরু থেকে নির্মিত ছাঁচে সবকিছু বিবেচিত হওয়ায় এবং একইভাবে মেধা-মনন নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ইসলামোফোবিয়ার সৈনিকদের নিকট বিভিন্ন ঘটনা, বর্ণনা ও তথ্যগুলোর প্রকৃত রূপ যেন অবান্তর কিছু (দেখেও দেখে না ভাব)। তার মন-মগজ কিছুতেই সেই রূপকে গ্রহণ করতে রাজি হয় না। ক্রীড়াবিদদের যেমনিভাবে প্রতিযোগিতা বা খেলার পূর্বে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যাতে খেলা একবার শুরু হলে তারা তা কার্যকর করতে পারে। ইসলামোফোবিয়ার ক্ষেত্রেও ঠিক একই পদ্ধতি অনুসৃত হয়; ইসলাম ও মুসলমানদের প্রশ্নে তারা সমাজে পূর্বশর্ত তৈরি করে নেয়।

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এর পর সহসাই 'তারা কেন আমাদের ঘৃণা করে?' প্রশ্নটি পুনরুত্থাপিত হচ্ছিল মিডিয়া এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দ্বারা। ফলত আমেরিকান জনগণ সন্ত্রাসী এ হামলার কষ্ট-বেদনায় ক্লিষ্ট হচ্ছিল। প্রশ্নের মধ্যে সমস্যা খোঁজা আর তা নীতির আওতার বাইরে রাখা কোনো সদুত্তর হতে পারে না। তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্নতার ফলে এ সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে মানুষের মনে মুসলমানদের প্রতি সন্দেহ উসকে দেয়। তারা মুসলমানদের একটি গ্রুপ হিসেবে চিত্রিত করে। যা সংবাদমাধ্যম CNN-এর ইন্টারভিউতে সংখ্যাগুরুদের (মুসলমানদের '১.৬ বিলিয়ন মুসলিম') দোষারোপের মাধ্যমে ট্রাম্প পুনরুজ্জীবিত করে।

যদি এক মুহূর্তের জন্য CNN-এ প্রদত্ত বিবৃতি সত্য বলে ধরে নেই; তবে জিজ্ঞেস করা যাক, প্রকৃত ইহুদিদের এ ঘটনার প্রতি কী প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত ছিল? আর ধর্মান্ধতার গভীরে প্রোথিত এমন বিষয়ে একজন নির্বাচনি প্রার্থীর অকপট স্পর্ধার সাথে এমন দাবি তোলা কীভাবে সম্ভব![২৯]

এ বিষয়ে কারো থেকেই আমি উত্তর প্রত্যাশা করি না; এমনকি সঠিক সত্যটি জানার জন্য ও সমাধানের জন্য ট্রাম্প থেকেও না। কারণ তার মননও ইসলামোফোবিয়ার বেড়াজালে আবদ্ধ; যেখানে ধর্মান্ধতা, বর্ণবাদ আর তর্জন-গর্জন ছাড়া বাস্তব কিছুই নেই।

ভয়ের পলিটিক্স ও ব্যালটবক্সের দর্শন

মুসলমানদের প্রতি আমেরিকানদের নেতিবাচক আচরণ সর্বদা তুঙ্গে থাকে এবং এ প্রবণতা সুদূর ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। তবে উদ্বেগের বিষয় হলো–এই ইসলামোফোবিয়ার সাথে ব্যালটবক্সের সম্পর্ক ও সংযোগ। ইউরোপ-আমেরিকার রাজনীতিবিদরা ইসলাম ও মুসলিমদের মধ্যে ভীতি ও অস্থিরতা ছড়ানোর মাধ্যমে খুঁজে পেয়েছে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার নতুন মন্ত্র। অর্থনৈতিক ব্যর্থতার জাঁতায় পিষ্ট, আউটসোর্সিংয়ের দরুন কর্পোরেট অধঃপতন, বিপুল ঋণে জর্জরিত, উন্মুক্ত যুদ্ধ আর শ্রেয়তর ভবিষ্যতের আশা হারানো অবসন্ন মানবতার নিকট বাণিজ্য ও বিকিকিনিতে ভয় একটি সহজসাধ্য ও উপযুক্ত পণ্য।

এক সময় আমেরিকান কর্পোরেট অভিজাতরা মধ্যবিত্তদের নিশ্চিহ্ন করে একটি অভূতপূর্ব স্থায়ী বৈষম্য তৈরি করেছিল। তাদের নির্মিত এ স্বপ্নিল ভুবনে মুসলমানরা তাদের ভাবনায় সবচে ভয়ানক বুগিম্যান। যেন সাজানো এ বাগানটিকে তারা তছনছ করে ছাড়বে।[৩০]

চায়না, ম্যাক্সিকান অভিবাসী, আফ্রিকান-আমেরিকান, মহিলা ও মুসলিমসহ আরও কিছু নাম উল্লেখ করে মধ্যবিত্তদের অধঃপতন ও কল্পনানুসারে দেশি শক্তি হ্রাসের দায় তাদের ঘাড়ে চাপায়। আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের

---

[২৯] পরোক্ষভাবে বিশ্ব নিয়ন্তা ইহুদিদের সমর্থন আছে বলেই এতটা নিঃসংকোচে ট্রাম্প এ দাবি তোলার সাহস করতে পেরেছে; বরং এ দাবি তোলার মাধ্যমে সে তাদের সমর্থন ও আস্থা লাভ করেছে।

[৩০] বুগিম্যান হচ্ছে সেই কল্পচরিত্র যে মানুষকে ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখিয়ে ভীত করে তোলে, পশ্চিমারা মুসলমানদের সবচে ভয়ংকর বুগিম্যান হিসেবে গণ্য করে।

গ্রেট আমেরিকা এগেইন' একটি ফাঁকা বুলি। কেননা আমেরিকান অভিজাতদের সাথে দেশি বিষয়াবলি নিশ্চল হয়ে থাকার প্রকৃত কারণ তার বর্ণবাদী ও বৈষম্যপূর্ণ প্রচারণার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় না।

ইতোপূর্বেও নির্বাচনগুলোতে রিপাবলিকানদের প্রেসিডেন্সিয়াল প্রচারণা কমিয়ে আনা হয়েছিল একটি প্রতিযোগিতার জন্য। যার উপজীব্য ছিল, কে মুসলিমদের প্রতি অধিক বর্ণবাদী হতে পারে, অভিবাসী ও আফ্রিকান-আমেরিকানদের আন্তঃশহরে সহিংসতার অপবাদে কোণঠাসা করতে পারে। আমেরিকায় যেকোনো ভুলের জন্যই ইসলামোফোবিয়া আর বর্ণবাদকে হাতিয়ার করে মায়াকান্নার রব ওঠে। মাত্রাতিরিক্ত বর্ণবাদ নতুন করে পুনরুত্থিত হচ্ছে। আর 'আমেরিকাকে শক্তিশালী করা'র গূঢ়ার্থ হচ্ছে নাগরিক অধিকার, ধর্মীয়-সামাজিক বৈষম্য পূর্বের ন্যায় পুনরায় গ্রহণযোগ্য করে তোলা।

আমরা এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি যখন কারো গাড়ি যদি বিকল হয় তা যেন হওয়ারই ছিল। কেননা হয়তো কোনো মুসলমান বা ম্যাক্সিকান ইঞ্জিনে লুকিয়েছিল! যদি কারো স্বামী অথবা কারো স্ত্রী রাগান্বিত হয়, তা যেন পূর্ব নির্ধারিত বিষয়, কেননা একজন মুসলমান ফ্রিল্যান্সার তার জব ছিনিয়ে নিয়েছে বা কোনো ম্যাক্সিকান কম পারিশ্রমিকে তার কাজ হরণ করেছে। যদি কেউ কাজে ব্যর্থ সমাপ্তির সম্মুখীন হয় তা যেন ছিল অশুভ নিয়তি! কেননা, এটা মুসলমানের কাছ থেকে নেয়া অশুভ লোনের ফল। নিশ্চিতভাবে, আমরা আমেরিকানদের দুর্বলতার কারণে রাজনীতিবিদদের দ্বারা সন্ত্রাসবাদী হুমকিতে আছি। তবে অতিরঞ্জিত এ ভয়ের ব্যাপারে কাউকে সঠিক চিন্তা করতে বাধাও দেইনি আর সমাজ-অভিমুখী কোনো সমস্যা সমাধানে কাউকে দায়িত্বও অর্পণ করিনি। সন্ত্রাসবাদ একটি হুমকি বলেই একে তার যথোপযুক্ত স্থানেই রাখতে হবে। যাতে স্নায়ু যুদ্ধ ও সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধের সাথে এর সংযোগ তৈরি না হয়।

ব্যালটবক্স জয় করতে শক্তিহীন ও প্রান্তিক মানুষজনদের জীবন্ত নরকের ভয় দেখিয়ে বলিরপাঁঠা বানানো রাজনীতিবিদদের পুরান একটি কৌশল। এর জন্য তাদের তেমন শ্রম দিতে হয় না। ইউরোপ ও আমেরিকাজুড়ে এমন বিপর্যয়কয় ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বারবার দৃশ্যমান হয়েছে।

বর্তমানে চলমান নিরাপত্তা বিতর্কগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের সমাজ-কাঠামোর প্রতি ইঙ্গিত করে এবং বিচূর্ণ আশা ও প্রত্যাশার পাশাপাশি ভবিষ্যতে ইউরোপ-আমেকিায় কী ধরনের ধর্মীয় ও জাতিগত সম্প্রীতিপূর্ণ বৈচিত্র্য রক্ষা হবে তাও ইঙ্গিত করে। নিশ্চিতভাবে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দ্রুত পরিবর্তনগুলোর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক ফলাফল সত্ত্বেও রাজনীতিবিদরা নিজেদের সংকীর্ণ নির্বাচনি সুবিধা ও স্বার্থের জন্য এসব উগ্র অস্থিরতা আবাদ করে যাচ্ছে। নির্বাচনে জয়ী হতে ও ক্ষমতার আসন বাগিয়ে নিতে ভীতি প্রদর্শন ও অরাজকতা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে ইসলামোফোবিয়া এবং বর্ণবাদকে।

বর্তমান নির্বাচনি চক্রে ভীতি (ইসলামোফোবিয়া) এমন এক গুরুত্বপূর্ণ পারিতোষিক উপাদান যার প্রভাবে মানুষজন তাদের উন্নত বিবেচনা ও দীর্ঘদিনের পছন্দের বিরুদ্ধে গিয়ে ভোট দেয়। ভীতি মানুষের ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দুয়ার রুদ্ধ করে দেয়। রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বে নিরাপত্তা আর উন্নতির বিহ্বলতায় জনগণ দুর্দশাগ্রস্ত নিষ্প্রাণ অতীতের দিকেই ফিরে চায়। সমসাময়িক কৃত্রিম বিশৃঙ্খলা ও সমস্যাবিধান হিসেবে কল্পিত বা বাস্তব দুর্দশাগ্রস্ত সুদূর অতীতকে স্মৃতিকাতর করে অর্পণ করে। ভয় রাজনৈতিক সংশোধনীকে (সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা জনমন থেকে বিস্মৃত করে দেয়) দুর্বল করে তোলে। ফলে আমেরিকান সমাজব্যবস্থার এই অধঃপতন আর সমস্যাগুলোর প্রকৃত সমাধান অধরাই থেকে যায়। সম্প্রদায়ের প্রতি বর্ণবাদী ভাষা আর যৌন বক্তব্য যেন অবক্ষয়গ্রস্ত আমেরিকাকে পুনরায় মহৎ করে তোলার দাবির প্রতি কুর্নিশ জানানো। আহ্বানটি যেন আমেরিকাকে নতুন করে বর্ণবাদী ও যৌনবাদী করে তোলা!

নির্বাচনি প্রচারণায় বর্ণবাদ আর ধর্মান্ধতায় ব্যালটবক্সে ভোট নগদীকরণার্থে ইসলামোফোবিয়া একটি সুচিন্তিত কৌশল (বর্ণবাদ-ধর্মান্ধতা পুরান ইস্যু আর ইসলামোফোবিয়া নতুন; ইসলামোফোবিয়া প্রচারের মাধ্যমে পুরান ইস্যুগুলোও মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, সেই সাথে ভোটে পূর্ণ হলো ব্যালটবক্স –অনুবাদক)। আমেরিকান উৎপাদন কাজ হ্রাস ও মধ্যবিত্ত বিলুপ্তির সহজ সমাধানকল্পে দেশকে পুনরায় বর্ণবাদী করে তোলার প্রস্তাবনা ওঠে। প্রচারণায় বর্ণবাদকে চাঙা করে তোলা, প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের শেতাঙ্গদের কাজে নিয়োগ, ধর্মান্ধতা এসব মূলত সুশীলসমাজের ক্ষমতালোভী ব্যক্তির প্রাচীন চাল।

ভয়, বর্ণবাদ, সমাধানহীনতা– এসব ছিল ট্রাম্পের নির্বাচনি প্রচারণার হাতিয়ার। ব্যালট বক্স ইসলামোফোবিয়ার সবচেয়ে বড় সুবিধা লাভ করেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০১৬ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে ট্রাম্পের 'মুসলিমদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সম্পূর্ণ সমাপ্তি'র প্রচার অভিযান ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। তিনি বলেন, এই নিষেধাজ্ঞা স্থির থাকবে যতক্ষণ না দেশের প্রতিনিধিরা "কী ঘটছে তা বের করতে পারে"। সম্ভবত, তার সব বুদ্ধিমত্তার সত্ত্বেও, তিনি এখনও এটি উপলব্ধি করতে পারেনি।

ধর্মভিত্তিক সুরক্ষার দাবি তোলে সেই ভয়ের শাখাগুলোকে চাঙা করে তোলা হয়েছে ফলত তৎকালীন রিপাবলিকান প্রার্থীদের প্রয়াস বিজয়ের পথে এগিয়ে গিয়েছে অনেকদূর। আমেরিকার ভবিষ্যত– বৈচিত্র্য, সর্বসাধারণের অন্তর্ভুক্তি ও পরিবর্তনের দোহাই দিয়ে ব্যালটবক্সকে ইসলামোফোবিয়া ও বর্ণবাদের শিকারে পরিণত করা একেবারেই অনুচিত।

ভাষান্তর : হাবিবুর রহমান রাকিব

ইউরোপজুড়ে ইসলামোফোবিয়ার হালচিত্র

রাকিবুল হাসান

কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস (সিএআইআর) এবং ইউসি বার্কলে সেন্টারের রেস অ্যান্ড জেন্ডারের ২০১৬ সালের এক রিপোর্ট অনুসারে, বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৩২টি সংগঠন ইসলাম ও মুসলিমঘৃণা প্রচারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিয়ে একটি 'অভ্যন্তরীণ কোর' গঠন করেছে[৩১]। ২০০৮ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে এই সংস্থাগুলো ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি পরিমাণে অকাতরে খরচ করেছে মুসলিমবিরোধী উদ্দেশ্য হাসিলের অভিপ্রায়ে।

ইসলামোফোবিয়া বিষয়ক গবেষক ও লেখক নাথান লিয়ানের[৩২] গবেষণা মতে, ইসলামোফোবিয়া ইন্ডাস্ট্রি (২০১২), 'বিশেষজ্ঞদের' একটি আদর্শগত ব্র্যান্ডে পরিণত হয়। ধারাবাহিকভাবে বেশ কয়েকটি নিউজ এজেন্সি দ্বারা নিয়মিতভাবে মুসলিম ও ইসলামের সহিংস, নেগেটিভ ও স্টেরিওটাইপ প্রতিচ্ছবি প্রচার করা হতে থাকে। এই বিশেষ দল কেবল ইসলাম আর মুসলিমদের নির্দিষ্ট করে বাছাই করে নিয়েছে, মানুষের কাছে একে সন্ত্রাসের তকমা দেয়াটা সুচারু´ভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। মুসলিমবিরোধী মনোভাবের এই পদ্ধতিগত প্রচারে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, অপব্যবহার এবং সহিংসতার প্রতিবেদনলো ভয়ংকর ইঙ্গিত দেয়।

শুধুমাত্র ২০১৮ সালের জানুয়ারী থেকে জুনের মধ্যেই ইসলামোফোবিয়ার ৬০৮টি ঘটনার কথা জানায় যুক্তরাজ্যভিত্তিক টেল মামার[৩৩] প্রতিবেদনে। পরিস্থিতি এতই গুরুতর যে, গত বছর ইউরোপীয় কমিশন বিচার বিভাগের পরিচালক ইউরোপ মহাদেশজুড়ে ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একটি টুলকিট চালু করেছে।

এদিকে ইউরোপজুড়ে চলমান ইসলামোফোবিয়ার সকল ঘটনাকে আলাদা করে নথিভুক্ত করা হয় না। তবে আইনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সদিচ্ছায়

---

[৩১] দেখুন, 'সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট

[৩২] পশ্চিমা গবেষক ও ইসলামোফোবিয়া বিষয়ক একাধিক গবেষনার জনক

[৩৩] মুসলিমবিরোধী হামলার পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা

ইসলামোফোব ঘটনাগুলো আলাদা নথিভুক্ত হলে তা প্রতিবিধান করা সহজসাধ্য হতো। দুঃখের কথা হলো, ছলচাতুরিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে ইউরোপিয়ান দেশগুলোর অনেকেই উল্টো দাবি তোলে– তারা ইসলামোফোবিয়ার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে। ইসলামোফোবিয়া নামক পরিভাষা নাকি মুসলমানদের নিজেদের হাতে তৈরি। তারা নিজেদের সুবিধার জন্য এ টার্মের অবতারণা করেছে। এ জাতীয় কথাবার্তা টেনে এনে ইউরোপিয়ান সাংবাদিকগণ সাধারণ মানুষদের দৃষ্টি অন্যত্র ফেরানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে।

একটি ছোট্ট উদাহরণ- ১৯৯৫ সাল। বসনিয়া হার্জেগোভিনায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর ঘটে যায় এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। মুসলিমদের ওপর চালানো বর্বোরচিত সেই গণহত্যাকে মিথ্যা বানিয়ে দেয় মিডিয়া, যেন দিনকে রাত বলা। ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট ও ক্রোয়েশিয়ান রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তার অস্বীকৃতির আওয়াজ ওঠে জোরেশোরে। তারা বসনিয়ার নিরাপত্তার কথা তুলে বসনিয়ার ভুখণ্ডকে ভাগ করতে উদ্যত হয়।

বৈধতার চাদরে বিদ্বেষের লুকোচুরি!

ইউরোপজুড়ে যেখানে বিদ্বেষচর্চার ঢেউ, সে ঢেউকে ফেনিয়ে তুলতে অনেকের প্রচেষ্টা নজর কাড়ার মতো। ইসলামবিদ্বেষকে স্থায়িত্বদানের জন্য বৈধতার চাদরে আবৃত করার পথ খোঁজে। ইউরোপের ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম বেলজিয়াম। মুসলিমরা দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। এ দেশে সাংসদদের ভোটের ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিক পশু জবাই তথা কুরবানির প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। মূলত মুসলিমদের কুরবানির পথ রোধ করাই এ নিষেধাজ্ঞার নেপথ্যে। এরই সাথে বেলজিয়ামের গ্রান্ড মসজিদ অপসারণের রব ওঠে। দেশটির প্রধান মুসলিম এ সেন্টারটি নাকি মরক্কোর গোয়েন্দায় পূর্ণ, তারা উদ্বিগ্ন হয় মসজিদে আবার উগ্রবাদের চর্চা হয় কি না?

দানিউব উপত্যকায় অবস্থিত পূর্ব-মধ্য ইউরোপের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত দেশ হাঙ্গেরি। দেশটির এক মেয়র তার অধীন এলাকায় মসজিদ-মিনার নির্মাণ, মসজিদে আজান প্রদানের সাথে সাথে মেয়েদের জন্য চাদর, নিকাব ও বোরকা নিষিদ্ধ হয়। মেয়র শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে গিয়ে বলেন, শতবছর ধরে লালিত-পালিত হাঙ্গেরির ঐতিহ্যকে রক্ষার্থেই তার এ

প্রয়াস। শেষমেষ যদিও সে সফল হয়নি, আন্দোলনের তোপের মুখে এ আইন উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

এমনিভাবে ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, রোমানিয়াসহ বহু দেশেই হিজাব নিষিদ্ধকরণ চলছে। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কাতেও হিজাব নিষিদ্ধ করা হলো। মুসলামনদের নানাভাবে কোণঠাসা করতে অভিনব ও হঠকারী সব আইন নিয়ে আসে তারা। FRA-এর তথ্য মতে ইউরোপীয় ইউনিয়নে হর্তাকর্তাদের নিকট দাখিলকৃত রিপোর্ট অনুযায়ী মাত্র ১২ শতাংশ মুসলিম বৈষম্যের শিকার। তবে আসল চিত্রে অন্য রূপ ফুটে ওঠে। মুদ্রার যে পিঠ আজ নামধারী সভ্য সমাজ এড়িয়ে যায়। চলুন তা দেখে নেয়া যাক- নিম্নে প্রদত্ত ঘটনাপ্রবাহ।

একটি সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান

ডেনমার্ক ন্যাশনাল পুলিশের তথ্যমতে, ৫৬টি ইসলাম বিদ্বেষের ঘটনা নথিভুক্ত হয় শুধু ২০১৬ সালেই। সে বছরের ২০ শতাংশ ঘটনা শুধু মুসলিমদের কেন্দ্র করে। সিসিআইবি তথ্যমতে, মাত্র এক মাসে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ঘটে ৩৬টি ইসলাম-বিদ্বেষমূলক ঘটনা। EIR রিপোর্ট অনুযায়ী ২৫৬টি ইসলাম-বিদ্বেষমূলক ঘটনা তালিকাভুক্ত হয় কেবল অস্ট্রিয়াতে। 'অবজারভেটরি অব ইসলাম' নামক একটি সংস্থার তথ্যমতে, ফ্রান্সে ১২১টি ইসলাম-বিদ্বেষমূলক ঘটনা রিপোর্ট করা হয়। সরকারের হস্তক্ষেপে ১৯টি ইবাদতগাহ তথা মসজিদে তালা ঝোলানো হয়। ৭৪৯ জন মুসলিমকে ঘর থেকে আটক করা হয়। সাড়ে চার হাজারের অধিক পুলিশি হামলা চালানো হয়। সরকারি নজরদারিতে রাখা হয় ২৫ হাজার মুসলিমকে। ১৭ হাজার ৩৯৩ ব্যক্তির নাম টেরোরিজম প্রিভেন্ট ডাটাবেজে তালিকাভুক্ত করা হয়।

DITIB-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ১০০টি আক্রমণ ঘটে শুধু মসজিদকে কেন্দ্র করে। জার্মান মুসলিমদের টার্গেট করে হামলার ঘটনা ঘটে ৯০৮টি। ৬০শতাংশ মুসলিম অধ্যাপক বৈষম্যের শিকার হয়। মুসলিম শরণার্থীরা ১৯০৬টি সন্ত্রাসী হামলার মুখোমুখি হয়। প্রতিদিন প্রায় ৫.২টি আক্রমণ। অপরদিকে শরণার্থী আশ্রয়কেন্দ্রজুড়ে ঘটে ২৮৬টি মর্মান্তিক ঘটনা। সন্ত্রাসী ও শারীরিক হামলার ও হতাহতের ঘটনা ঘটে শরণার্থী। ১৩২টি সাথে। মাল্টার মতো ছোট্ট একটি দেশেও ৭ শতাংশ মুসলিম শিশুদের সহিংসতা ও ২৫ শতাংশ মুসলিম নানাভাবে পরিকল্পিত হয়রানির শিকার হয়। শারীরিক

শান্তি সূচকে টেক্কা দানকারী দেশ নরওয়ে। সেই নরওয়েতেও মুসলিম বিদ্বেষের চিত্র স্পষ্ট। ২০১৭ সালে ১৪ শতাংশ মুসলিম নানাভাবে হয়রানির সম্মুখীন হয়। এনি ফ্রাঙ্ক ফাউন্ডেশনের তথ্যমতে, শুধু ২০১৬ সালেই মুসলিমবিদ্বেষের ঘটনা রিপোর্ট হয় ৩৬৪টি। এরপর ২০১৭ সালে সরাসরি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয় মুসলিমদের। ২০ শতাংশ বিদ্বেষমূলক ঘটনা ঘটে মুসলিমদের কেন্দ্র করে। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ১৭-এর জানুয়ারি থেকে অক্টোবরেই ৬৬৪টি মুসলিমবিদ্বেষী সন্ত্রাস ঘটে। তবে ২৯ শতাংশ ঘটনার অভিযোগ দায়ের করা হয় মাত্র।

আমেরিকার ম্যানচেস্টার অঞ্চলে ইসলামবিদ্বেষমূলক সন্ত্রাস পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। লন্ডনজুড়ে ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পায় ইসলামবিদ্বেষ। ফলে ১৬ সালে ঘটে যাওয়া বিদ্বেষমূলক সন্ত্রাস ১২০৪ থেকে বেড়ে ১৬৭৮-এ গিয়ে দাঁড়ায়। যার প্রবৃদ্ধি প্রায় ৪০ শতাংশ হারে হয়েছিল। ২০১৭-এর মার্চ-জুলাই। এ সামান্য সময়ে মসজিদ আক্রমণের সংখ্যা ১৬ সালের ৪৭টি থেকে বেড়ে ১১০-এ গিয়ে দাঁড়ায়। ২০১৬ সালে Tell MAMA-এর নেটওয়ার্কে ১২২৩টি ইসলামোফোবিয়ার আক্রমণ রিপোর্ট করা হয়। যার ২০ শতাংশ-এ শারীরিক নির্যাতনের নজির মেলে। আক্রান্তদের ৫৬ শতাংশ ছিল মহিলা। পিসিসিআই-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৭ সালে ৫৪৬টি ইসলাম বিদ্বেষের ঘটনা ঘটে। সুইডিশ ক্রাইম সার্ভের তথ্য মতে ৪৩৯টি বিদ্বেষমূলক সন্ত্রাস নথিভুক্ত হয়।

এদিকে ২০১৮ সালে ইউরোপজুড়ে ইসলামোফোবিয়ার চিত্র আরও ভয়াবহ। বেলজিয়ামে প্রায় ৭০টি ইসলামোফোবিক ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ৭৬ শতাংশ ভিকটিম নারী। অস্ট্রিয়ায় ৫৪০টি ইসলামোফোবিক ঘটনা ঘটেছে। অথচ ২০১৭ সালে ছিল ৩০৯টি। ফ্রান্সে ৬৭৬টি ঘটনা ঘটেছে। ২০১৭ সালে ছিল৪৪৬টি। ৬৭৬ জনের মধ্যে ২০ জন শারীরিক আক্রমণের শিকার। ৫৬৪ জন বৈষম্যের শিকার। ৮৮ জন মৌখিক লাঞ্ছনার শিকার। জার্মানে ৬৭৮টি ইসলামোফোবিক ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে ৪০টি ঘটেছে মসজিদে। শরণার্থীদের ওপর আক্রমণ হয়েছে ১৭৭৫টি। এদের মধ্যে ১৭৩টি আশ্রয়কেন্দ্রে। ৯৫টি জার্মানিতে কাজ করতে আসা কর্মীদের ওপর। নেদারল্যান্ডে পুলিশের কাছে দায়ের করা ১৫১৫টি ধর্মীয় বৈষম্যের অভিযানগুলোর মধ্যে ৯১ শতাংশই মুসলমানদের বিরুদ্ধে।

২০১৯ সালে এসে ইউরোপীয় মুসলিম দেশগুলো একইরূপ ইসলামোফোবিয়ার আক্রমণ আঁচ করতে পারছে। ফ্রান্স, জার্মানি, নরওয়ে এমনকি যুক্তরাজ্যে মসজিদগুলোও আক্রমণের শিকার হচ্ছে। তদুপরি, 'গ্রেট রিপ্লেসমেন্ট'-এর মতো সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রমূলক অধিকার আদায়ের প্রচারণা রটে চলছে। ইউরোপে অমুসলিমদের প্রতিস্থাপনের পক্ষে মুসলিমরা এগিয়ে যাচ্ছে; অপরদিকে তারা ছদ্মবেশে ছড়িয়ে পড়ছে আর শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য বিস্তারে সন্ত্রাসী আক্রমণে মদত দিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেদনে 'সর্বব্যাপী শিক্ষার জন্য আরও সক্রিয় পন্থা ও সহায়তা' গ্রহণ প্রয়োজনীয় বলে ইউরোপীয় দেশগুলোর সরকারপ্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

২০১৯ সালে ৮৭১টিরও বেশি মুসলিম-বিদ্বেষমূলক অপরাধ লিপিবদ্ধ হয়েছে। যার ৫৮টি মুসলিম ধর্মীয় স্থান সম্পর্কিত। অন্য আরও ৪৬টি ছিল ইসলাম-বিদ্বেষী ধর্মান্ধদের দ্বারা শারীরিক নিপীড়নের কেইস। অনুরূপভাবে ফ্রান্সেও ১০৪৩টি ইসলামোফোবিয়ামূলক ঘটনা নিবন্ধিত হয়েছে। যার মধ্যে শারীরিক নিপীড়ন, ধর্মীয় স্থান নিয়ে নানা উস্কানিমূলক বক্তব্যসহ আরও অনেক কিছুই জায়গা করে নিয়েছে।[৩৪]

ইউরোপজুড়ে ইসলামোফোবিয়ার নেপথ্যে

ডানপন্থি আন্দোলনের প্রভাব বৃদ্ধির কারণেই পুরো ইউরোপজুড়ে ইসলামোফোবিয়া বাড়ছে– আঙ্কারাভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্কের প্রতিবেদনে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। ফাউন্ডেশন ফর পলিটিক্যাল, ইকোনোমিক অ্যান্ড সোস্যাল রিসার্স (এসইটিএ) কর্তৃক প্রকাশিত 'ইউরোপীয় ইসলামোফোবিয়া : রিপোর্ট ২০১৮' ইউরোপে মুসলিম-বিরোধী বর্ণবাদের উত্থানকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করে, এমনকিছু কারণের ওপর আলোকপাত করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'মানবাধিকার, বহুসংস্কৃতিবাদ এবং ইউরোপের রাষ্ট্রীয় আইনের ক্ষেত্রে সবসময় মুসলিমবিরোধী আলোচনা করার কারণেই বৃদ্ধি পেয়েছে ইসলামোফোবিয়া এবং বর্ণবাদ। মুসলিমবিরোধী এই বর্ণবাদের প্রজনন ও প্রতিপালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ইউরোপের

---

[৩৪] এসইটিএ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতি বছরের (European Islamophobic Report 2017,2017,2018) প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। এসইটিএ হলো জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণামূলক একটি প্রতিষ্ঠান।

গণমাধ্যম। ইউরোপের এমন কম গণমাধ্যমই আছে, যারা মুসলিমদের ইতিবাচক দিকগুলো ফুটিয়ে তোলে। বরং নেতিবাচকভাবেই মুসলিমদের তুলে ধরে সবসময়। আর ইন্টারনেটের বিভিন্ন মাধ্যমে ক্রমাগত মুসলিবিদ্বেষ তো আছেই।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, মুসলমানদের চিত্রিত করার ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের রাজনীতিবিদদের ইসলামোফোবিক ভাষা এবং ডানপন্থিদের বর্ণবাদী ভাষা– ইসলামোফোবিয়াকে আরও বাড়িয়ে তুলছে এবং বিশ্বকে সন্ত্রস্ত করছে। এখন ইসলামোফোবিয়া কেবল মুসলমানদের নয়, ইউরোপের সুরক্ষা ও স্থিতিশীলতার জন্যও হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও নির্বাচনি উদ্দেশ্যে তারা এই বর্ণবাদ ও ইসলামোফোবিয়াকেই উসকে দেয়।

ইসলামোফোবিয়ার শেকড় সন্ধানে

দীপা কুমার[৩৫]

বিশ্বজুড়ে ইসলামোফোবিয়ার বিষাক্ত উত্থান চরমপর্যায়ে পৌঁছেছে। যখন উদারপন্থি লেখক মাইকেল টমাস্কি মুসলিমদের আমেরিকার সুনাগরিক প্রমাণে সচেষ্ট হলেন; এক সপ্তাহের মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প মুসলিমদের সেই দেশে অভিগমন বন্ধের প্রস্তাব করে বসলেন। এমন পরিস্থিতিতে কী করা উচিৎ, এমন মিথ্যাচারের প্রতি কি উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়?

আমাদের অন্তত দুটি কারণে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। প্রথমত, সানবার্নিডো আর প্যারিসের ঘটনার পর ইসলামোফোবিয়া ও বিদ্বেষর্চচার ক্রমঃবৃদ্ধি আমাদের নজর কেড়েছে। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে গ্লেন গ্রিনওয়ার্ল্ড মুসলমানদের ওপর হুমকি-হামলার তালিকা সংগ্রহ করেছে, যা বস্তুতই আতংকজনক। ৯/১১-র ঘটনার পর অনেক বন্ধুমহলেই হিজাবের ওপর হুডি পরে অপরিচিতদের কটাক্ষ-আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে দেখা গেছে।

বর্ণবাদী আক্রমণ নতুন কিছু নয়, শুধু এটা নতুন মাত্রায় তীব্রতর হচ্ছে। ৯/১১-র মতো 'গ্রাউন্ড জিরো মসজিদ'[৩৬] বিতর্ক আর বুস্টনে একটানা

---

[৩৫] ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান বার্নিডোতে এক মুসলিম দম্পতির হামলায় ১৪ জন নিহতের ঘটনার পর রিপাবলিকান প্রার্থ ডোনাল্ট ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার দাবি করেন। তার এই বক্তব্য বিশ্বজুড়ে ঝড় তোলে। পরে ডোনাল্ট ট্রাম্প নিজের কথাকে ঘুরিয়ে বলেন, 'ওটা ছিল সার্ন বার্নিডো হামলার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া।' তবে এর কিছুদিন আগে ফ্রান্সের প্যারিসে এক সন্ত্রাসী হামলার দায়ও চাপানো হয় নিরীহ মুসলিমদের ঘাড়ে। তখন চলছিল নির্বাচনি মৌসুম, মুসলিমদের অপরাধী বানিয়ে শুরু হয় ইসলামফোবিয়ার খেলা। এরই জের ধরে আমেরিকাজুড়ে ইসলামোফোবিয়ার শেকড় সন্ধান করেন Islamophobia and the Politics of Empire বইয়ের লেখক ও সাংবাদিক দীপা কুমার।

[৩৬]. ৯/১১-এর হামলার পর সেই হামলাস্থলই আজ পরিচিত 'গ্রাউন্ড জিরো' হিসেবে। সেখানেই পশ্চিমা বিশ্ব ও মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং সম্প্রীতির প্রতীক হিসেবে একটি মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেয় স্থানীয় একটি গ্রুপ 'কর্দোবা ইনিশিয়েটিভ'। কিন্তু এমন একটি

বোমাবর্ষণ এমন প্রতিটি ঘটনাই সেই নেতিবাচক প্রবাহের ঢেউয়ে নতুন মাত্রাযোগে আরও উদ্বেলিত করে। ইসলামোফোবিয়াকে হাতিয়ার করে সন্ত্রাসী অভিযান পরিচালনা করা যেন আমেরিকান সমাজব্যবস্থার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, কেননা এটি সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদকে বিশাল এক সুরক্ষা বলয়ে আবৃত করে রাখে।

দ্বিতীয়ত. সে পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে, প্রথমত; প্যারিস আক্রমণের রেশ কাটাতে আন্তর্জাতিকভাবে তা আরোপিত হয়। দ্বিতীয়ত; এটা রাজনৈতিক মৌসুমকে বেগবান করা হয়েছে। বিগত বছরগুলোর মতো রিপাবলিকানরা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইসলামোফোবিয়াকে হাতিয়ার বানিয়ে আদানুন খেয়ে মাঠে নামে। তাদের অবান্তর বক্তব্যগুলোকে মূলধারায় পৌঁছানোর জন্য মূলধারার রাজনীতিবিদদের বাগে এনে তাদের মাধ্যমে নিজেদের উপস্থাপন করতে চায়। তাই নিজেদের খোলস বদলে নির্লজ্জভাবে ওয়েলফান্ডেড ইসলামোফোবিয়াকে নিয়ে বর্ণবাদ ও ডানপন্থির রূপ ধারণ করে বারবার। ফলত আমরা কী প্রত্যক্ষ করেছি! আন্তর্জাতিক ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্কের আঁচলে লালিত ডানপন্থি ধারণার উত্থান, যার নাম দেয়া হয়েছিল 'কাউন্টার জিহাদ মুভমেন্ট' বা জিহাদবিরোধী আন্দোলন। বিশ্বের আনাচে-কানাচে যা প্রতিধ্বনিত হয়েছে রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীদের মুখে মুখে। তাদের মধ্যে ট্রাম্প অগ্রগণ্য।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংস্থার গবেষণা জরিপে ফুটে উঠেছে 'কাউন্টার জিহাদ মুভমেন্ট' ধারণা কীভাবে কুয়া থেকে সাগরে মিশেছে (এক প্রান্ত থেকে জাতীয় রাজনীতির অংশে একীভূত হয়েছে।) আর বৈশ্বিক মদতপুষ্ট হয়েছে, আর তা বাস্তবায়নের চাকায় ট্রাম্পের মতো লোকজন কী পরিমাণ ইন্ধন দিয়েছে।

ইদানীং রিপাবলিকান কিছু প্রার্থীসহ অনেকেই ট্রাম্পের মুসলিম অভিবাসন বন্ধ করা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য ছুড়ছে। বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের হুঁশ ফিরেছে। ট্রাম্প সীমা অতিক্রম করেছে, তাকে অযোগ্যপ্রার্থী বলে ঘোষণা করা উচিত বলে তারা মন্তব্যও করেছে।

জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা ঠিক নয় এই যুক্তিতে, এর ঘোর বিরোধিতা শুরু করে নিউইয়র্কবাসী।

ট্রাম্প প্রত্যুত্তরে বুক ফুলিয়ে বলেছিল, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৯৪২ সালে পার্ল হারবার আক্রমণকে কেন্দ্র করে যে নীতি অনুসরণ করেছিল তার পরিকল্পনাও তা থেকে ভিন্ন কিছু নয়। যখন সে ১১০,০০০ (যাদের ৬০ শতাংশ-ই জন্মগতভাবে আমেরিকান) জাপানিজ আমেরিকানদের অভ্যন্তরীণ কার্যনির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছিল। বস্তুত ট্রাম্প যথাযথ একটি উপমা টেনেছে, সেই শীতল যুদ্ধ থেকে শুরু করে বর্তমান সন্ত্রাসী যুদ্ধ পর্যন্ত ডেমোক্রেট আর রিপাবলিকান উভয়েই রাষ্ট্রকে সুসংহতকরণ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে উসকে দিতে বর্ণবাদী পুলিশিব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছে। বস্তুত কেউ একজন দেশের সাথে সম্পৃক্ত দুটি বিষয়ে মজবুত এক সংযোগ তৈরি করতে পারে।

ট্রাম্পের ১৯৪২ সালের পূর্বেকার কোনো নজির উপস্থাপনের প্রয়োজন পড়েনি। ৯/১১-র পর থেকে তার বিনোদন প্রস্তাবনা বিভিন্ন ধাচে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কয়েক সহস্রাধিক মুসলিম অভিবাসী ও নাগরিকদের কারা-শিল্পের জটিলতার মধ্যে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে।

৯/১১-র পক্ষান্তরেই ১২০০ মুসলিম নাগরিক ও অভিবাসীকে এফবিআইসহ রাষ্ট্রীয় আরও আইনি সংস্থাগুলো জিজ্ঞাসাবাদ করে। যদিও তাদের মধ্যকার কারোরই ৯/১১-র ঘটনার সাথে যোগসূত্র মেলেনি। আর তখন থেকেই কয়েদ ও বাস্তুচ্যুত করার প্রবণতা বেড়েছে হুড়োহুড়ি করে। বুশ ও ওবামার আমলে মসজিদ, কমিউনিটি সেন্টার আর শিশুদের আনন্দালয়গুলো ছিল নিবিড় নজরদারির আওতায়।

ট্রাম্প যখন সকল মুসলমান নিবন্ধনসম্বলিত তথ্যপুঞ্জি তৈরির নির্দেশনা দেয়, হিলারি ক্লিনটন টুইটেএকে 'মর্মান্তিক দাবি' বলে আখ্যা দেয়। তবু সে এক দশকের বেশি সময় ধরে চলে আসা প্রক্রিয়াকে উপেক্ষা করে, যেমন- ২০০২-এর জাতীয় সুরক্ষা প্রবেশ-প্রস্থান নিবন্ধন পদ্ধতি যা তার স্বামীর ১৯৬৬ সালের সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের ভিত্তি ছিল।

পঁচিশটি পৃথক দেশের যোলো-উর্ধ্ব পুরুষদের সাক্ষাৎকার প্রদান, ছবি তোলা, আঙ্গুলের ছাপ প্রদান এবং অর্থনৈতিক তথ্যাবলি প্রদান করা আবশ্যক ছিল এ প্রক্রিয়ার আওতায়ীন। ২০০৩-এ পতনের পর প্রায় ৮৩,০০০ অভিবাসী এ পদ্ধতিতে নথিভুক্ত হয়।

তাই আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না যে, রিপাবলিকান আর ডেমোক্রেট উভয়েই এক নায়ের মাঝি। তাদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের কারণেই আজ

বিশ্বের এই হাল। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ এনোক পল ইংল্যান্ডে 'রক্ত নদী' নামক যে খেলার আবির্ভাব করেছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প তার কুখ্যাত বক্তব্যেও এর আবদান রাখে। যা বর্ণবাদ, অভিবাসনবিরোধে পূর্ণ ছিল ফলত সে রাজনৈতিক অঙ্গনে তার নবরূপের আবির্ভাব হয়।

এ. শিবানন্দ, পল-এর 'রক্ত নদী' বিষয়টাকে এভাবে ফুটিয়ে তুলেছে যে, 'আজ এনোক পল যে রব তুলছে, কাল তা নিয়ে কনজারভেটিভ পার্টি উঠেপড়ে লাগবে, আর পরশু তাতে ইন্ধন জোগাবে লেবার পার্টি। বস্তুত সব শিয়ালের এক রাঁ। ১৯৭০ দশকের পর থেকেই আমেরিকায় এ ধরনের গতিশীলতা দৃশ্যমান। ফলে সেখানে রাজনৈতিক চর্চাঙ্গন এতটা সংকীর্ণ, যে কারণে কেউ চাইলেই ট্রাম্পের মতো ব্যক্তিবর্গের হেঁয়ালি বা দলছুট নেকড়ে তথা ব্যতিক্রম আখ্যা দিয়ে অপসারণ করার সিস্টেমে কোনো প্রভাব ফেলতে অপারগ।

মাইকেল টমাস্কি মুসলিম আমেরিকানদের তাদের বৈধতার প্রমাণ চাইলেন। ঠিক একই স্বরে বারাক ওবামার একটি ভাষণও প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। ওবামা যুক্তি দাঁড় করিয়েছিলেন যে, যেহেতু মুসলিম কমিউনিটিতে চরমপন্থি বা সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়েছে তাই এটা কোনো অজুহাত ছাড়া মোকাবিলা করা মুসলমানদের কর্তব্য।

ওবামার বইতে পুনরায় এ বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে, সেখানে সানবার্নিডোর ঘটনার জন্য শ্বেতাঙ্গ খ্রিস্টানদের বাদ দিয়ে মুসলমানদের ওপর দোষারোপ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারণ, ঘটনার মূল হোতা রোবার্ট ডিয়ার।

স্পষ্টত ডিয়ার একজন ধর্মপ্রচারক খ্রিস্টান, যে ঈশ্বরের সেনাবাহিনী নামে গর্ভপাতবিরোধী একটি দল গঠন করেছে। যারা ৯/১১-র পর থেকে অসংখ্য বোমাহামলা আর হত্যাকাণ্ড নির্দ্বিধায় ঘটিয়ে চলছে। তথাকথিত জিহাদী নামধারী পক্ষের চেয়েও এই ডানপন্থি সন্ত্রাসীরা অধিক হত্যাকাণ্ডে জড়িত।

তারপরও কেন শ্বেতাঙ্গ খ্রিস্টানদের এসবের দায়িত্ব নিতে বলা হচ্ছে না। ডিয়ারের অপকর্ম চাপা দিয়ে সানবার্নিডোকে ঘিরেই কেন সব মনোযোগ আকর্ষিত হলো! ওবামা যখন উচ্চারণ করে 'বিশ্বব্যাপী বিপদগামী মতাদর্শ যা মৌলবাদের দিকে নিয়ে যায়, তার মূলোৎপাটন করা মুসলমানদের দায়িত্ব'– এর মাধ্যমে সে ইসলামোফোবিয়ার দারাজদিল সংস্করণ প্রবর্তন করলেন; যা

সিংহভাগ মুসলমান শান্তিপ্রিয় হলেও ইসলাম যেন সন্ত্রাসবাদের একটি দ্বার চির উন্মোচন করেই রেখেছে!

এ বিতর্কিত বিষয়াদির প্রতি নজর বুলালে যদিও যৎসামান্য পরিবর্তন আঁচ করা যায়: তবে ইসলামোফোবিয়ার উদারপন্থি রূপগুলোতে গিয়ে বিতর্ক আটকে আছে। যেন তা দুধে ধোয়া তুলসি পাতা, ময়ূরের পালক পরে কাকের নেক সুরতে দেয়া ধোঁকা। তাই এটা স্পষ্ট যে, ট্রাম্পের বক্তব্যে যেমন রিপাবলিকানরা তীব্র সমালোচনা করেছে ঠিক একই দৃষ্টিতে গণতান্ত্রিকভাবে রিপাবলিকানরাও নিন্দিত।

যখন ডানপন্থিরা মুসলমানদের পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য পঞ্চম কলাম বা সমস্যাজনক বলে মনে করে, তখন উদারপন্থি/ডানপন্থিদের যৌক্তিক রূপে উপস্থাপন করা হয়, যেন তারা মুসলমান ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্যকারী। তবুও এটি সম্পূর্ণ একটি দলকে দায়ী করে বিধায় সন্ত্রাস দমনের দায়ভার মডারেট মুসলিমদের কাঁধে চাপাতেই উদারপন্থিরা বদ্ধমূল। যাতে বামপন্থি ও বর্ণবিরোধীরা তাদের রাজনৈতিক ভিত টান করে দাঁড়াতে পারে আর যুদ্ধচর্চা, সন্ত্রাসবাদিতা, আটক করা, ড্রোনহামলায় হুরহুর করে মানুষজন তাদের পক্ষ নেয়।

সাম্রাজ্যবাদের প্রেক্ষাপট সচরাচর চাপা থাকে। বহির্বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের ভিত গড়ে ওঠার উপাখ্যান, এই আঘাতগুলো পুনরায় আমেরিকার মাটিতে কীভাবে প্রতিঘাত তৈরি করে, বর্ণবাদের অন্তর্নিহিত কী অর্থ তারা দাঁড় করায়, সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপকে চালিত করতে দেশে বিদেশের কী পরিমাণ সহিংসতা যে মার্কিন রাজনৈতিক সংস্থার মদতপুষ্ট তার ইয়ত্তা নেই।

আতঙ্ক ও ধর্মান্ধতায় মিডিয়ার ইন্ধন

হাল আমলে কেবল কর্পোরেট মিডিয়ার মদতেই ট্রাম্পের উন্মত্ত বক্তব্য এতটা আলোচিত হচ্ছে ও নজর কাড়তে সমর্থ হচ্ছে। এতে কিছু বাস্তবতাও বিদ্যমান। মিডিয়া খুব আগ্রহের সাথে বিতর্কিত ও চাঞ্চল্যকর বিষয়গুলো কভার করে। যাতে বৃহৎসংখ্যক শ্রোতা আকর্ষণ করতে পারে এবং নিচের বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে। যেমন– ট্রাম্পের লাখ লাখ ল্যাটিন আমেরিকান অভিবাসীকে বাস্তুচ্যুত করে ওয়াটারবোর্ডিংয়ে ফিরিয়ে আনার আহ্বানকে কারণ দর্শিয়ে সংবাদযোগ্য বলে উপস্থাপন করে। বস্তুত আর্থিক প্রণোদনা লাভের আশায়ই অধিকাংশ সংবাদ প্রচারণা সংস্থা এসব প্রচারে লিপ্ত হয়।

তবে ইসলামোফোবিয়ার উত্থানের পেছনে কেবল ডোনাল্ড ট্রাম্প বা মিডিয়া ইন্ধন জোগায় ভাবলে ভুল হবে। ইসলামোফোবিয়া নিয়ে আমার বইতে নিরীক্ষণ করে দেখানো হয়েছে 'ম্যাট্রিক্স অব ইসলামোফোবিয়া' বা ইসলামোফোবিয়ার উৎসমূল। যাতে মুসলিম-বিরোধী মতবাদ ও তার চর্চায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোর রূপরেখা প্রদত্ত হয়েছে, যেখানে রাজনৈতিক স্থাপনা (ডেমোক্রাট ও রিপাবলিকান উভয়েরই), জাতীয় নিরাপত্তা যন্ত্রাদি, বিশ্ববিদ্যলয়সমূহ, থিঙ্কট্যাংক বা নীতিনির্ধারণী সংস্থার অন্তর্ভুক্তি রয়েছে। এদের প্রত্যেকেই দু ধরনের ইসলামোফোবিয়ার প্রচার-প্রসারে লিপ্ত– উদার ও গোঁড়া।

এ ধরনের প্রপাগান্ডা জনমনে প্রচারিত হওয়ার মূল হোতা হচ্ছে মূল ধারার মিডিয়াগুলো। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে তারা বক্তব্য প্রচারণা এগিয়ে রাখে এবং রক্ষণশীল আর উদারপন্থিদের মধ্যকার বিতর্কের লাগামও হাতে রাখে।

এটা এমনই এক বিরল দৃষ্টান্ত যেখানে বামপন্থি যে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে। এসব প্রেক্ষাপট যা সর্বদাই সামাজিক আন্দোলন ও প্রতিবাদের ফসল। মিডিয়া বিতর্কের পরিধি বাড়াতে যথেষ্ট শক্তিশালী (১৯৯৭ সালের ইউপিএস ধর্মঘট নিয়ে ঘটা এক দৃষ্টান্ত আমার বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে)।

সানবার্নিডো ও অন্যান্য ঘটনায় অমুসলিম ও মুসলিমদের মিডিয়া কীভাবে চিত্রিত করেছে?

প্রথমেই বন্দুক-সহিংসতা নিয়ে কিছু বলা যাক; তা যেন আমেরিকান আপেল পাই। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের প্রতিবেদনে ফুটে উঠেছে যে, মার্কিন ভূমিতেই ৪০৬৪৯৬ জন আমেরিকান আগ্নেয়াস্ত্রে প্রাণ হারিয়েছে আর তাদের সন্ত্রাসবাদের ফলে বিশ্বব্যাপী ৩৩৮০ জন মারা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে জিহাদী নামধারীদের দ্বারা ৯/১১-র পর ৪৫ জন প্রাণ হারিয়েছে। অন্যকথায় বন্দুক-সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদ এর অনুপাত যেন দশ হাজার ও এক।

স্কুলে ও অন্যত্র সহিংসতায় শ্বেতাঙ্গদের অগ্রগণ্য ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। মুসলিমরা আমেরিকার সকল ঐতিহ্যে একীভূত হলেও সানবার্নিডোর ঘটনায় এসে যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ আর জাতীয় সুরক্ষার বুলি আওড়ে মুসলিমদের ওপর চড়াও হতে দেখা গেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো সহিংস ঘটনাকে চাপা দিতে দুটি ফ্রেম ব্যবহার করা হয়, শ্বেতাঙ্গ অপরাধী আর মুসলিম। প্রথম ক্ষেত্রে অপরাধকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা

হিসেবে দেখা হয়। উদাহরণত মানসিক অসুস্থতার অজুহাত। অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে বিচারের আওতায় আনা যার সমাধান মনে করা হয়।

দ্বিতীয়ত. মুসলমানদের ক্ষেত্রে অপরাধকে গণ্য করা হয় 'সভ্যতার সংকট' হিসেবে। যেখানে সমগ্র মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও লড়াই তথা 'ওয়ার অন টেরর'কে সমাধানের একমাত্র উপায় হিসেবে ফলাও করে প্রচার করা হয়। ফরাসী দার্শনিক আলবার্ট মোমি তার mark of the plural আলোচনায় বুঝিয়েছেন যে বর্ণবাদী কর্মকাণ্ড মানুষজনের কাছে স্বাভাবিক বলে উপস্থাপন করা হয় আর শ্বেতাঙ্গ কুকীর্তি সীমাবদ্ধ করে রাখা হয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে।

এই যুক্তি শুধু রক্ষণশীলদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নয় বরং উদারপন্থিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উদারপন্থার প্রবক্তারা দীর্ঘদিন ধরে স্বতন্ত্র অধিকার ও স্বাধীনতা হরণ করে স্বতন্ত্রতার অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে। আর তাই অধিকার আদায়ের নিমিত্তে মানুষজন বর্ণবাদকে আপন করে নিয়েছে।

জাতীয় রাজনীতিতে সানবার্নিডো আর ট্রাম্প-বক্তব্যের প্রভাব

ট্রাম্পের বক্তব্যের প্রভাব পূর্বোল্লিখিত এনোক পাওয়েলের বক্তব্যের প্রভাবের অনুরূপ। ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক বিদ্যমান।

অপরদিকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা ওয়ার অন টেরর, জাতীয় সুরক্ষানীতি গঠন, মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক বৈষম্য ডেমোক্রেটদের এহেন দুষ্কর্ম কেবল রিপাবলিকানদের নিজস্ব প্লট রচনার বৈধতাই দেয় না; বরং আগামী দিনে আরও উগ্রচর্চার স্বাধীনতা তাদেরও দেয়া হয়।

অন্যভাবে, রিপাবলিকানরা নিজেদের ডানপন্থি উপস্থাপনের সাথে সাথে ডেমোক্রেটরা তাদের চরমপন্থার দিকে কেবল আঙ্গুলি নির্দেশই করে না বরং নিজেদের আরও চরমপন্থার রাহাও পাকাপোক্ত করে নেয়, তারা কেবল অসৎ মুসলমানদের পিছু নেয়, তাদের উস্কানিমূলক বক্তব্যে খুব কমই মেলে।

এর সুস্পষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় নিউইয়র্ক টাইমস-এর তৎকালীন সম্পাদকীয় কলাম থেকে যা ট্রাম্পের বর্ণবাদের ভঙ্গিতে ফ্যাসিবাদের ভয়াল রূপ তুলে ধরে। সম্পাদকীয় এর শুরুটায় এমন কিছুই ছিল না– যার বিপক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো যায়। তবে এতে রিপাবলিকানদের ইসলামোফোবিয়ার পট তৈরি ও ফ্যাসিবাদের অপচ্ছায়া হিসেবে দায়ী করা হয়েছে। কেননা তারা অভ্যন্তরীণ

বিতণ্ডায় বেশি আগ্রহী। ডেমোক্রেটদের দোষ এতে উপেক্ষা করা হয়েছে, এসব অপকর্মে যাদের অবদান কোনো অংশেই কম নয়।

এটা অবশ্য ডেমোক্রেটদের বাঁ-হাতের চাল। কারণ সমগ্র জাতি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ যা তাদের সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ডা বাস্তবায়নের পথ করে দিয়েছে পরিষ্কার, পেছনে থেকে কোনো বিরূপ মন্তব্যের ঝঞ্ঝাটও নেই।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নিশ্চিত করে ট্রাম্প রাজনৈতিকভাবে ভয়াল মোড় নেয়ার প্রতিনিধিত্ব করে না। তবে ভীতিহীন রাজনৈতিক যে শক্তি তাকে ক্ষমতায় এনেছে তা উপলব্ধি করার কোশেশ আমাদের করা দরকার। এমন এক গতিশীলতা যা সম্পূর্ণই রাজনৈতিক চাল। পুনরাবৃত্তি করতে হয় তা পদ্ধতিগত রাজনৈতিক মোড় পরিবর্তন, একক কোনো ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলের চাল নয়।

ট্রাম্পের অভিবাসনবিরোধী নীতি কী পরিমাণ চাপের মুখে দীর্ঘসূত্রতায় বলিরপাঁঠার রূপ দিয়েছে তা নিয়ে অবশ্য কোনো ভ্রূক্ষেপ কারো নেই। পালের গোদার মতো ট্রাম্পও বুঝেছিল যে, অভিবাসন সস্তা শ্রমের উৎস যা আমেরিকার অর্থনীতির সাথে জুড়ে বসে আছে, বর্তমানে যেন তা বিশেষভাবে সত্যায়িত, তার মাথায় এটাও খেলেছে যে, ঝুঁকির মধ্যে রাখতে পারলেই তাদের অপদস্থ ও জব্দ করে রাখা যাবে। আর তাদের বলিরপাঁঠা বানানোর দ্বারা সামগ্রিকভাবে আমেরিকান শ্রমজীবীদের প্রভাবিত করে এসব অস্বস্তি থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেয়া যাবে।

এক্ষেত্রে আমেরিকান প্রশাসন বাস্তুচ্যুতি ও অভিবাসন উভয়ক্ষেত্রে সমান তালে মদত দিয়ে যাচ্ছে তাতে আমরা অমনযোগী হয়ে রই। (দৃষ্টান্ত; নাফটা, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধসমূহ, মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার যুদ্ধ) এবং অভিবাসন দণ্ড। (ওবামার গণনির্বাসন নীতি) এর সবই মনে করিয়ে দেয় যে, বর্ণবাদ শ্রেণিবদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের এক অবিচ্ছেদ্য ইতিহাস।

ফরাসি আঞ্চলিক নির্বাচনের প্রথম দফায় ২৮ ভাগ ভোট দখল করেছে ডানপন্থি ন্যাশনাল ফ্রন্ট এবং অন্যান্য ইউরোপীয় বর্ণবাদী পার্টি (যদিও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে)। তবুও ডানপন্থি মার্কিনিরা ইউরোপের থেকে আলাদা। ইউরোপ ও অন্যান্য অঞ্চলের প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের মর্মমূলে প্রোথিত ইসলামোফোবিয়া নিয়ে আমাদের কেমন চিন্তিত হওয়া উচিত!

ইউরোপে ইসলামোফোবিয়ার সাথে ডানপন্থির ভিন্নরূপ সম্পর্ক। ইউরোপের এ পার্থক্যের গোড়ায় আছে মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর অফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার এক দীর্ঘ ঔপনিবেশিক ইতিহাস। অর্থাৎ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের সম্পর্কে বর্ণবাদী আদর্শিক তকমা দেয়ার চর্চা হয়।

ফ্রান্সের ক্ষেত্রে, ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়নের মিসর আক্রমণ এবং পরবর্তীকালে ফ্রান্সের আলজেরিয়া বিজয়ের ফলে প্রাচ্যবাদ ও বর্ণবাদচর্চার পথ সুগম হয়। 'কোড দে লিংকডিগনাত' নামক আইন প্রথমত আলজেরিয়া এবং পরবর্তীতে অন্যান্য উপনিবেশের ঘাড়ে চাপানোর মাধ্যমে ফ্রান্স এক নিয়মতান্ত্রিক বৈষম্যের জন্ম দেয়। যেখানে জনগোষ্ঠীগুলোকে নিম্ন মানের মর্যাদা প্রদান করা হয়। এমনকি উপনিবেশ উৎখাতের পরও এ বৈষম্য চলমান ছিল। জাতীয় ফ্রন্ট যার দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রতিচ্ছবি।

যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামোফোবিয়া আরও সাম্প্রতিক বিষয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পর যখন আমেরিকা ফ্রান্স, ব্রিটেন, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদের লাগাম হাতে নেয় তখন থেকেই এ লড়াই গুরুতর রূপ নেয়। ইসরায়েলের সাথে মার্কিনিদের গলায় গলায় ভাব থাকায় প্রাচ্যবাদ ও ইসলামোফোবিয়ার বিস্তারের পথ কণ্টকমুক্ত হয়েছে। সন্ত্রাসবাদী হুমকি ১৯৭০-এর দিকেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৭৯ সালে ইরানী বিপ্লব তা রূপায়ণে মুখ্য ভূমিকা রাখে। অন্যত্র আমি উল্লেখ করেছি যে, ১৯৮০-র দশকে 'নিউকন লিকুদ জোট' নামক ইসরায়েলি রাজনৈতিক সংস্থা ইসলামের ভিন্ন বিপদের আভাস দিয়েছে।

এভাবেই ইসলামোফোবিয়া ১৯৯০-এর দিকে যুক্তরাষ্ট্রে বিস্তৃত হতে শুরু করে। এমনকি ৯/১১-র পর তাতে জনগণের চিত্তাকষর্নে সমর্থ হয়। এটা একটি আংশিক বিষয়, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম অভিবাসীবিরোধী প্রচারণার সাথে ইউরোপের মিল নেই। এটা প্রাথমিকভাবে ল্যাটিন অভিবাসীদের বঞ্চিতকরণ। এটাও বলা হয় যে, আমেরিকা ইউরোপিয়ান দেশগুলোর কাছ থেকে বৈশ্বিক জিহাদবিরোধী আন্দোলন শিক্ষা লাভ করছে।

ইসলামবিরোধী বক্তৃতাকে উপজীব্য করে ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে অনেক বেশি নির্বাচনি সাফল্য দেখা গেছে। ২০১০-কে টার্নিং পয়েন্ট ধরে ডানপন্থি দলগুলো মুসলিম-বিরোধী ও অভিবাসীবিরোধী বিষবাষ্পে দেশি ও ইউরোপীয় সংসদ নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্যের দেখা পেয়েছে।

ফ্যাসিবাদী দলগুলোর কেন্দ্রবিন্দু ব্রিটিশ ন্যাশনাল পার্টি মিলিয়ন ভোট লাভে সমর্থ হয় এবং প্রথমবারের মতো ইউরোপীয় সংসদে দুটি আসন লাভ করে। হল্যান্ডে এগিয়ে যায় গ্রিট ওয়াইল্ডের ফ্রিডম পার্টি। এমনকি হল্যান্ড ও সুইডেনের মতো উদারপন্থি দেশগুলোতেও ডানপন্থি দলগুলোর তখন জয়জয়কার। সুইডেনে ডেমোক্রেটরা মুসলিম-বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে সংসদীয় ক্ষমতা হাসিল করেছে, যার নেতা জিমি একিসন– অভিবাসন সীমাবদ্ধ করার দাবি জানান, আর সুইডিশদের সামনে ইসলামকে সবচে মারাত্মক জাতিগত হুমকি হিসেবে আখ্যায়িত করে।

পুনরায় বর্ণবাদী আবেদন ও শ্রমজীবী মানুষজনের ম্রিয়মাণ জীবনব্যবস্থায় যোগসূত্র দেখিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক সংকট থেকে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছে। ইউরোপিয়ান সরকারব্যবস্থাগুলো অসহায় মানুষগুলোর প্রতি ধৃষ্ট ও দৌরাত্যপূর্ন ব্যবস্থাই কেবল চাপিয়ে দেয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ঐতিহ্যগত বাম দলগুলো এ সমস্যার বিকল্প কোনো সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়। ভোটারদের মধ্যে উৎকণ্ঠা সঞ্চারে মুসলিম অভিবাসনকে বলিদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক শূন্যস্থান পূরণ হয়।

২০১০ সালে ফ্রান্সের উচ্চকক্ষ সর্বসম্মতিক্রমে বোরকা নিষিদ্ধ করার পক্ষে রায় দিয়েছে। যখন নিম্নকক্ষে ভোট পাস হয়ে গেলে বাম দলগুলো বিরত থাকে (সমাজতান্ত্রিক, গ্রিনস, কমিউনিস্ট) নীতিগতভাবে মুসলমানদের বিপক্ষে যাওয়ার পরিবর্তে তারা চুপচাপ বসে থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এরপর সমাজতান্ত্রিক দল এগিয়ে এসে বিষয়টিকে আপত্তিকর বললেও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিল না। বামদের এই নগণ্য প্রতিক্রিয়া অপরপক্ষকে শক্তিশালী হতে সহায়তা করেছে। ইউরোপ যেন মার্কিন মূলধারার রাজনীতির ভূত-ভবিষ্যতের আয়না। ডানপন্থিরা খুব একটা পিছিয়ে না পড়লে ইউরোপ বামপন্থিদেরও শিক্ষাদান শুরু করে দেবে।

ইসলামোফোবিয়ার ক্রমোত্থানের বিরুদ্ধে বামদের করণীয়

ইউরোপ থেকে লব্ধ প্রথম পাঠ হলো, কোন কেন্দ্র থেকে এর মোকাবিলা করা পণ্ডশ্রম। অতিমাত্রায় মুসলিম বিদ্বেষের মুখে, একটি অদৃঢ় সংকল্প কেবল ডানপন্থিদের জোর বাড়িয়ে তুলবে।

দ্বিতীয়ত. ডানপন্থিরা জন প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়, মাঝেমধ্যে বর্ণবাদবিরোধী বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে বামপন্থিদের বাধারও সম্মুখীন তারা হয়। মূলধারার বাইরের বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি বামপন্থি থেকে ডানপন্থি হওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিদ্যমান।

দৃষ্টান্তে, ব্রিটেনে এন্টি-নাজি লিগ ব্রিটিশ ন্যাশনাল পার্টির পূর্বসরি ফ্যাসিস্ট ন্যাশনাল ফ্রন্টকে দুই ফ্রন্টের নির্বাচনে সফলভাবে পেছনে ফেলেছে। প্রথমত, তারা বর্ণবাদের বিরুদ্ধে একটি মৌলিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। দ্বিতীয়ত, তারা উন্মুক্ত রাজনৈতিকাঙ্গন তৈরি করেছিল যা অগ্রসরমান বিকল্প ও পদ্ধতিগত সমালোচনাকে সামনে রেখে গঠিত, যে বর্ণবাদ বৃহৎ পরিসরে রাজনৈতিক অর্থনীতিতে নিহিত আছে।

ভুলে গেলে চলবে না, ইসলামোফোবিয়া সাম্রাজ্যবাদের তুরুপের তাস। এটা নিজে থেকে বিলীন হওয়ার নয়। আমি ইতোমধ্যে প্রমাণ দিয়েছি যে, আস্থাযোগ্য মতবিনিময় ও ইসলামি শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। আমাদের সামষ্টিক কণ্ঠস্বরকে উচ্চকিত করতে মিছিল বা অন্যান্য বাহ্যিক প্রকাশের আয়োজন করতে হবে।

তবে এর জন্য আমাদের কৌশল প্রয়োজন যা কেবল সমসাময়িক ট্রাম্পদের ডানপন্থি বক্তব্যকেই মোকাবিলা করবে না; বরং অন্যান্য হুমকি সম্ভবপর করে তোলার গোড়ার কথাও মূলোৎপাটিত করেই তবে ক্ষান্ত হবে। অন্যকথায় আমাদের পদচারণার কৌশল রপ্ত করতে হবে এবং কি করে সুবিধা আদায় করে নিতে হয় সে কৌশলও রপ্ত করতে হবে। একইসাথে স্বল্প পরিসরে তবে দীর্ঘমেয়াদি কৌশল যা ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে ক্ষুণ্ন না করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখবে। এভাবেই বৃহৎ-ক্ষুদ্র সকল পরিস্থিতির সামাল দেয়া হবে সম্ভবপর।

বামপন্থিদের দীর্ঘদিনের কেন্দ্রীয় দুর্বলতা ছিল, সহসাই ভয়ের মুহূর্তে দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল নিয়ে সতর্ক না হয়েই এমনসব স্বল্পমেয়াদি কৌশল তারা অবলম্ববন করতো যা আমরা কোথায় আছি বা কোথায় তা পৌঁছে দেবে তার কোনো ইয়ত্তা থাকে না।

তাই ইসলামোফোবিয়া ও বর্ণবাদের আরও সার্বজনীন প্রতিরোধকল্পে প্রতিপক্ষ সংঘবদ্ধ হওয়ার পূর্বে গুরুতর কিছু প্রকাশ হতে চলছে (হয়তো একক ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দল)। এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হলো ইসলামোফোবিয়ার দুই রূপের– 'লিবারেল ও কনজারভেটিব'– যেসব ইন্সটিটিউট দ্বারা সৃজিত ও চর্চিত তাদের ভিত নাড়িয়ে দেয়া। অন্যকথায় এর জন্য প্রয়োজন একটি মৌলিক পদ্ধতি যা সমস্যার মূলে পৌছতে পারবে অর্থাৎ অন্তত সন্ত্রাসী যুদ্ধের অবসান ঘটাবে, জাতীয় সুরক্ষা রাষ্ট্রকে নিঃশেষ করবে (যে সুরক্ষা একপক্ষীয়,

সবাই যার আঁচলে ছায়া পায় না) এবং বর্ণবাদী শক্তিকে বিলুপ্ত করে পূর্ববৎ স্বাভাবিক অবস্থার পুনর্জাগরণ করবে। এ পরিবর্তনের ফলে এমন এক রাজনীতির প্রয়োজন পড়বে যা গণআন্দোলনকে করবে শক্তিশালী। আর চলমান রাজনৈতিক পদ্ধতিকে গণতান্ত্রিকীকরণ করবে।

আপাত দৃষ্টিতে একে এক অতিরঞ্জিত পরিকল্পনা ভাবা যেতে পারে, তবে এর চেয়ে নাতিদীর্ঘ কোনো পরিকল্পনায় নজর দেয়ার অর্থ হবে আমরা প্রকৃত হুমকি যা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করবে এবং তা প্রতিহত করার কৌশল কোনোটা সম্পর্কেই যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নই।

ভাষান্তর: হাবিবুর রহমান রাকিব

ইসলাম ও ফ্রান্স : শার্লি এব্দোর নেপথ্যে

মুজাহিদুল ইসলাম

ইসলাম ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রথম পরিচয়টি অষ্টম শতাব্দীর শুরু থেকে, বিশেষত ৭১৮ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ মুসলমানরা আন্দালুস জয় করার মাত্র কয়েক বছর পরই। বর্তমান ফ্রান্সের মূল ভূমিকে মুসলমানরা তখন 'গ্রেট ল্যান্ড' বা 'মহান ভূমি' নামে অভিহিত করত। সে বছর স্পেনবিজয়ী তারিক বিন যিয়াদ তার সেনাবাহিনী নিয়ে এক অনুসন্ধানী অভিযানে বের হন। একের পর এক জয়ের পর মুসলিমরা আরবোন (নরবোনে) বিজয়ে সক্ষম হয়। কিন্তু ৭১৫ সালে মুসলিম বাহিনীর সেনা-কমান্ডার সামাহ বিন মালিক আল খুলানি শহিদ হওয়ায় প্রথম প্রচেষ্টার সমাপ্তি হয় এবং মুসলমানরা বার্সেলোনায় তাদের শক্ত ঘাঁটিতে ফিরে যায়।

১০ বছর পর মুসলমানরা পুনরায় নতুন বিজয়ের জন্য ফ্রান্সের দরজায় করাঘাত করে। সুহাইম আল কালবির নেতৃত্বে এক বাহিনী ফ্রান্স বিজয়ে সক্ষম হয়। তাদের বিজয়াভিযানের ফলে প্যারিস তখন মাত্র ১০০ মাইল দূরে ছিল। এখানেই থেমে ছিল না। বরং আবদুর রহমান গাফিকির নেতৃত্বাধীন বাহিনী নতুন ভূমি যুক্ত করার মানসে ৭৩২ 'বর্দে' হতে অভিযান শুরু করেন। একপর্যায়ে 'পয়োটার্সে' তাদের অভিযান থেমে যায়। সেখানে বালাতুশ শুহাদা নামক বিখ্যাত লড়াইয়ে মুসলিম বাহিনীর পরাজয় হয়। ফলে উত্তরে মুসলিমদের অগ্রাভিযান থেমে যায়। তবে তা এ অঞ্চলের ক্ষমতার চিত্র বদলে দেয়নি। তারা ৭৩৭ সালে মার্সেই এবং ৮৮৯ সালে সেন্ট-ট্রয়েসকে মুসলিম ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করে। দশম শতাব্দী পর্যন্ত এখানে মুসলিমরা তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

আন্দালুসের পতনের পর ফ্রান্স আর মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্কের মোড় ঘুরে যায়। এবারের সম্পর্কে কোনো শত্রুতা নেই, বরং যৌথ দুশমন স্পেনের ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে এক হয়ে যায় তারা। স্পেনের যে সকল মুসলিম আফ্রিকায় না গিয়ে ইউরোপে থাকতে চায়, তাদের ফ্রান্স স্বাগত জানায়। তারা সেখানে ধর্মকর্মসহ সকল ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যে যুক্ত হয়। বিশেষত ফ্রান্সিসরা যখন ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। ১৬০৫ সালে স্পেনের 'মরিসকোদের' (যারা প্রাণের ভয়ে খ্রিস্টান ধর্ম প্রকাশ করে কিন্তু আদতে

মুসলিম) একটি প্রতিনিধিদল ফ্রান্সের বাদশাহ চতুর্থ হ্যানরির নিকট স্পেনের রাজা তৃতীয় ফিলিপের বিরুদ্ধে সহযোগিতা চায়। তিনিও তাদের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এক পাগল পাদ্রীর হাতে বাদশাহ নিহত হওয়ায় নতুন করে মুসলিমদের সেখানে যাওয়ার স্বপ্ন ফিকে হয়ে যায়।

মুসলিমদের একের পর এর দুর্গের পতনের পর বাকি ছিল উসমানি সালতানাত। যা সাইক এবং পিকেটের ষড়যন্ত্রে যেমন ইচ্ছে ব্যবহৃত হচ্ছিল। মুসলিম ও ফ্রান্সের সম্পর্কে নতুন বাঁক দেখা দেয়। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ফ্রান্স তার নৌবহর পাঠিয়ে সেখানকার জনশক্তি ও বিভিন্ন খনিজদ্রব্য ফ্রান্সে আনতে থাকে। আফ্রিকার সম্পদে গড়ে উঠতে থাকে ফ্রান্সের শক্তিসামর্থ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সৈন্যবল জোগাতে ও যুদ্ধের পর ক্ষত সারিয়ে তুলতে ফ্রান্স মুসলিমদের আনতে থাকে। তারা তাদের ধর্মকর্মের জন্য সেনানিবাসের ভেতরও মসজিদ নির্মাণ করে। ধীরে ধীরে তাদের পরিবারও আসতে থাকে। এমনকি এক সময় ফ্রান্সে খ্রিস্টধর্মের পর ইসলাম সেখানে দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মের স্থান দখল করে। যা একসময় ধর্মনিরপেক্ষ ফ্রান্স নিজের জন্য হুমকি মনে করতে থাকে।

ফরাসি ধর্মনিরপেক্ষতা : সবকিছুর আগে এবং পরে ধর্মের প্রতি শত্রুতা

কেউ যদি অ-ইউরোপীয় কোনো দেশ (মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধপীড়িত অঞ্চল বা দরিদ্র এশীয় কিংবা মঙ্গাকবলিত আফ্রিকা) থেকে ফ্রান্সে যেতে চায়, তাকে প্রথমেই ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের নীতির অন্তর্ভুক্তি এবং পরিচয় বিভাগের কোর্সে অংশ নিতে হবে। এটা তাকে শেখাবে ফ্রান্স একটি ধর্মহীন রাষ্ট্র। কিন্তু এখানে পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তবে বাস্তবে এ কথিত স্বাধীনতার অর্ধাংশও পাওয়া কঠিন। ফ্রান্স ১৯০৫ সালে রাষ্ট্র হতে গির্জাকে আলাদা করার পাশাপাশি ফ্রান্সকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়ে আইন পাস করে। যে আইনের কোনো ধরনের ব্যাখ্যা চলবে না; যেন আসমানি নির্দেশনা। এটা নিশ্চিত করার জন্য দুটি বিশেষ অথরিটি আছে। তারা হালাল-হারাম পর্যন্ত নির্ধারণ করে।

ইসলাম সম্পর্কে ফ্রান্সের রাজনৈতিক স্রোতের মনোভাব

বর্তমান ডানপন্থি রাজনৈতিক পরিভাষা মূলত ফ্রান্সের রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদের আধ্যাত্মিক পিতা ম্যারিন লুবিনের মতাদর্শানের রূপায়ণ। এদের

মূল ফোকাস হলো অ-ফ্রেঞ্চদের বিরোধিতা করা। এরাই মূলত ফ্রান্সে ইহুদিদের উপস্থিতির বিরোধিতা করেছিল। যদিও বর্তমানে তারা তা থেকে নিজেদের দায়মুক্তির দাবি করে। কিন্তু বর্তমানে তারা মুসলিম আইডিওলজির বিরোধিতাকে তাদের প্রচারণার মূল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে।

এদের এই ডানপন্থার আদর্শই মূলত বর্তমানে বিশ্বব্যাপী কাজ করছে। নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চের সন্ত্রাসী মূলত এদের আদর্শেরই অনুসারী। বর্তমান ফ্রান্সের ডানপন্থিরাও ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিরোধিতার কোনো সুযোগকে হাতছাড়া করে না। ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী তার বিবৃতিতে বলেছেন, 'ধর্মের সাথে তাদের কোনো বিরোধ নেই। সমস্যা শুধু ইসলাম বা ইসলামি 'চরমপন্থা' নিয়ে। সাবেক ডানপন্থি প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজি ফ্রান্সের স্কুলগুলো মুসলিম ছাত্রদের জন্য হালাল খাবার ও হিজাবের সোজাসাপ্টা বিরোধিতা করেছেন।

অন্যদিকে বামপন্থিরা মুসলিম কমিউনিটির প্রতি তুলনামূলক ইতিবাচকতা দেখায়। বামপন্থি রাজনৈতিক ব্যক্তিরা বিভিন্ন সময় ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে সন্ত্রাসবাদকে জড়ানোর বিরোধিতা করেছেন। সাবেক বামপন্থি প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সে একাধিকবার বলেছে, 'ইসলাম গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার মূল্যবোধের পরিপন্থি নয়। ফ্রান্সে তাদেরও অন্য নাগরিকদের মতো অধিকার আছে। সন্ত্রাসের বলি হওয়া থেকে তারাও নিরাপদ নয়। বামপন্থিরা ডানপন্থিদের মুনাফিক আখ্যায়িত করে বলেন, 'তারা বাদশাহ সালমানের সাথে আলোচনা করে, সেখানে কী হচ্ছে তা জানা সত্ত্বেও তারা তার নিকট উদ্বেগ প্রকাশ করে না। খ্রিস্টানদের ধর্মীয় পোশাকে আপত্তি না থাকলেও তাদের মুসলিমদের পোশাকে আপত্তি। ইসরায়েলি কোনো মন্ত্রী কোনো নারীর সাথে হ্যান্ডশেক করা থেকে বিরত থাকলে তারা চটে না, তারা বেজার হয় যদি কোনো মুসলিম হাত মেলানো থেকে বিরত থাকে।'

ফ্রেঞ্চ ইসলাম

যে ফ্রান্স এখনো ধর্ম থেকে দূরে থাকা এবং রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে দূরে রাখা নিয়ে গর্ব করে, তারা প্রকৃত ইসলামের প্রচার-প্রসার করবে– এমন চিন্তা করাও কঠিন। ইসলামের বিরোধিতার জন্য তারা মূলত দুভাবে কাজ করে। পরোক্ষভাবে ইসলামিক যেকোনো অনুষ্ঠানে প্রশাসনিক ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের মডারেশন করা। প্রশাসনের সাথে মুসলিম

কমিউনিটির দৃঢ় বন্ধন তৈরির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে ব্যবহারের চেষ্টা করা। প্রত্যক্ষভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সেল মুসলিম কমিউনিটি সংগঠনের বিষয়ে ছাড়পত্র দেয়া।

অনেকে মনে করতে পারেন, সাম্প্রতিক সময়ের অস্থিরতার কারণে ফ্রান্স প্রশাসন এ ব্যবস্থা নিয়েছে। না, তা নয়। এটা বরং বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নেয়া পদক্ষেপ। ১৯৯৭ সালে সে সময়ের ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এমন একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, যা ইসলামকে ফ্রান্সের অনুকূলে নিয়ে আসবে। তিনি এক জনসভায় মুসলিমদের বলেন, 'আমরা প্রতিষ্ঠান করতে চাই। আমরা ফ্রেঞ্চ ইসলামের প্রতিষ্ঠা করতে চাই।' ২০০৩ সালে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আজ ফ্রান্সের মুসলিমরা ফ্রেঞ্চ ইসলাম গ্রহণ করছে। এ ইসলাম তাদের বংশধররাও বহন করবে। আমরা এমন ইমাম চাই, যারা আমাদের সভ্যতা ধারণ করবে, আমাদের যুবকদের সাথে কথা বলতে পারবে, আমাদের সাথে আমাদের ভাষায় কথা বলবে।' ২০১৬ সালে মুসলিম প্রতিষ্ঠানে অমুসলিম প্রেসিডেন্ট নিয়োগ দেয়া হয়, যা মূলত ইসলামি জ্ঞানে পাণ্ডিত্য রাখেন এমন ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত।

বাকস্বাধীনতা বনাম অবমাননা

শার্লি এবদোর ঘটনাকে পশ্চিমা দুনিয়া বাকস্বাধীনতার ওপর আঘাত হিসেবে দেখছে। এ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নতুন বিতর্ক। (পুরনো বিতর্ক নতুন করে) 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা কি সীমাহীন?[৩৭] ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ১৯তম ধারায় বাকস্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হলেও ১২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, 'কাউকে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ি বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়ালখুশি মতো হস্তক্ষেপ অথবা সম্মান ও সুনামের ওপর আক্রমণ করা চলবে না।' ২৯-এ বলা হয়েছে, 'স্বীয় অধিকার ও স্বাধীনতাগুলো প্রয়োগকালে প্রত্যেকেরই শুধু ওই ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকবে, যা কেবল অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতাগুলোর যথার্থ স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা নিশ্চিত করে ... ।'

১৯৬১ সালের নভেম্বরে গৃহীত মানবাধিকার কনভেনশনের ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বাক ও চিন্তার স্বাধীনতাকে সমর্থন দেওয়ার পাশাপাশি বলা

---

[৩৭] কালের কণ্ঠ ১৪-০১-১৫ ইং

হয়েছে, 'স্বাধীনতা নিঃশর্ত বা চূড়ান্ত নয়। বাকস্বাধীনতা ব্যক্তির মর্যাদা, জনগণের মূল্যবোধ ও শৃঙ্খলার প্রতি আক্রমণাত্মক হতে পারবে না।' পোপ ফ্রান্সিস অতি সম্প্রতি বলেছেন, 'বাকস্বাধীনতার সীমা থাকা উচিত।' (কালের কণ্ঠ ১৬-০১-১৫ ইং) চীন, রাশিয়াসহ অসংখ্য দেশে বাকস্বাধীনতাকে শর্তযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। বাকস্বাধীনতা শর্তহীন নয় বলেই প্রতিটি দেশেই আদালত অবমাননা আইন প্রবর্তিত হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, যা ইচ্ছা তা-ই বলে যাওয়া, লিখে যাওয়া, দেখা মাত্র কাউকে গালাগাল দেওয়া বাকস্বাধীনতা হতে পারে না। বাকস্বাধীনতা মানে মিথ্যাচার নয়, বিদ্বেষ ছড়ানো বাকস্বাধীনতা নয়। বাকস্বাধীনতা মানে সত্য বলার অধিকার।

বাকস্বাধীনতা নিয়ে পশ্চিমাদের দ্বিমুখী নীতি : পশ্চিমারা অব্যাহতভাবে ইসলাম অবমাননাকে বাকস্বাধীনতা বলে চালিয়ে দিলেও ব্রিটিশ রাজবধূ কেটের নগ্ন ছবি ছাপানো নিষিদ্ধ করেছে। ওই সব ছবি ছাপানোর দায়ে একটি ফরাসি পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে নিয়ে বহু নাটক বিশ্ববাসী দেখেছে।

গত গ্রীষ্মে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলিরা ১৭ জন সাংবাদিক হত্যা করলেও হয়তো সেটা বাকস্বাধীনতার ওপর হামলা নয়(!) বলেই বিশ্বনেতারা এককাতারে সমবেত হননি। যুক্তরাজ্যে প্রচলিত ব্লাসফেমির আওতায় মুসলমানরা সালমান রুশদির বিচার চাইলেও বুঝতে দেরি হলো না, এ আইন খ্রিস্টধর্মের জন্য! ইসলামের অবমাননার জন্য নয়! দুর্ভাগ্যক্রমে রুশদি ও তাঁর বই নিয়ে ব্যঙ্গ করে তৈরি করা পাকিস্তানি একটি চলচ্চিত্র যুক্তরাজ্যে নিষিদ্ধ কর হয়। এমনকি মুসলমানরা কেন পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে দিন দিন খেপে যাচ্ছে, এ নিয়ে দুক্তরাষ্ট্রে তৈরি কিছু চলচ্চিত্রের সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সন্দেহজনক ফ্রেঞ্চ ইসলাম

ইসলামের সাথে ফ্রান্সের সম্পর্ক বেশ প্রাচীন। কখনো সরাসরি সংঘাত, কখনো লিয়াজোঁকেন্দ্রিক। এটা প্যারিসের বহুল চর্চিত পদ্ধতি। নেপোলিয়ন মিসর দখল করা সত্ত্বেও নিজের নাম মুহাম্মাদ রেখে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তার দুরভিসন্ধি মিসরের আলেমদের নিকট গোপন করতে পারেননি। উপনিবেশিক দেশগুলোতে মুসলিমদের নির্মম নির্যাতনকারী জেনারেল হার্বার কিন্তু প্যারিসের সবচেয়ে বড়ো মসজিদের অর্থায়নকারী।

উপরের তথ্যের আলোকে ফ্রেঞ্চ ইসলাম-প্রচারের মাধ্যম 'ফ্রান্স ইসলামিক ফাউন্ডেশন' নামক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, দিকনির্দেশনা এবং বার্তা ধর্মীয় বা ধর্মনিরপেক্ষ হোক, উপেক্ষা করা উচিত নয়। এই প্রকল্প সফল হতে পারে। আবার মুসলমানরা এতে জড়িত না বলে এটি ব্যর্থ হতে পারে। এখানে সবকিছুই সম্ভব। তবে সবক্ষেত্রেই মুসলমান এবং পশ্চিমাদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সভ্যতার যুদ্ধ একটি নতুন মোড় গ্রহণ করছে বলে মনে হয়।

কানাডায় ইসলামোফোবিয়া : একজন খ্রিস্টান নারীর নির্মোহ পর্যবেক্ষণ

জুলিয়া গ্রিন

আমি একজন খ্রিস্টান শ্বেতাঙ্গ। চতুর্থ প্রজন্মের একজন কানাডিয়ান। এই তিনটি কারণে অন্য অনেক কানাডিয়ানের চেয়ে আমার জীবন অনেক সহজতর হয়েছিল। কখনো বর্ণবাদের নৃশংস আক্রমণের শিকার হইনি। যেখানেই যাই, গলায় ক্রসচিহ্ন পরেই যাই, কেউ কিছু বলে না। প্রকাশ্যে আমি আমার ধর্ম আমার শরীরে ফুটিয়ে তুলে চলাফেরা করি– কিন্তু কখনো চরমপন্থি বলে কেউ গালি দেয় না। এই এখন আমার সুবিধাগুলো নিয়ে খুব ভাবছি, যখন ইসলামোফোবিয়ার শিরশির হাওয়ায় প্রতিটি অমুসলিম ভেতরে ভেতরে কাঁপছে। মুসলিমদের ওপর যে অ্যাটাক এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলছে, এগুলো ঘটাচ্ছে আবার আমারই বর্ণের শ্বেতাঙ্গরা। আমার বর্ণের মানুষগুলো ইসলামোফোবিক আক্রমণ করছে এইজন্য আমি আমাকে নিয়ে ভাবছি না, বরং আমি ভাবছি এরা মুসলিমদের চেনেই না। না চেনা এবং না জানা থেকে তাদের ভেতর এক অদৃশ্য ভয় তাদেরকে সবসময় তাড়িয়ে বেড়োয়। আমি লক্ষ্য করেছি, আমার মতা সুবিধাভোগী কানাডিয়ানরা মুসলিমদের প্রতি দারুণ বিরক্ত এবং প্রকাশ্য বিরোধী। কিন্তু কেন?

আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করিড়মুসলমানদের যথার্থভাবে ফুটিয়ে না তোলার কারণে মিডিয়ায় কিংবা বইয়ে, এই দেশের লোকদের মনে মুসলিমদের প্রতি প্রচুর নেতিবাচক মনোভাবের জন্ম নেয়। কানাডায় খুব অল্প মুসলমান। যেহেতু আমার শৈশব কেটেছে শ্বেতাঙ্গ স্কুলে, চার্চে, কখনো মুসলমানদের সংস্পর্শেও আসিনি, সেহেতু মুসলিমদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব জন্ম নেয়ার অনেক সুযোগ ছিল। কিন্তু আমার সৌভাগ্য– আমার কমিউনিটি আমাকে অন্য ধর্মের বিশ্বাস, আচার-আচরণ বিশেষ করে মুসলিমদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হতে দেয়নি। ৯/১১-র হামলার পর সবাই যখন ভীত সন্ত্রস্ত, তখন আমাদের কমিউনিটি প্রধান মসজিদের ইমামকে ডেকে এনে বললেন, 'ইসলাম এবং সন্ত্রাসবাদ এক নয়। ইসলাম কখনো সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করে না। এগুলো আমার কমিউনিটিকে বুঝিয়ে দিন।' ইমাম সাহেব এত সুন্দর করে বিষয়টি ফুটিয়ে তুললেন, কমিউনিটির লোক এবং আমার

বাবা-মা বিষয়টি খুব স্পষ্ট করে বুঝে গেলেন। ইমামের বয়ানের পর ওদের ভেতর কাজ করতে থাকা ভয় যেন নিমেষেই হাওয়া হয়ে গেলো।

এরপর যখন হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হই, স্কুল বোর্ড নিয়ন্ত্রিত 'স্টুডেন্টস টুগেদার অ্যাগেইনস্ট রেসিজম' (এস.টি.এ.আর) নামে একটি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ পাই। প্রশিক্ষণে আমাদের শেখানো হয় পক্ষপাতদুষ্টতা, গোঁড়ামি এবং বৈষম্যের সংজ্ঞা। আমার সহনশীল বিশ্বাস এবং বিশ্বদর্শন এই প্রোগ্রামটির মাধ্যমেই উন্নত হয়েছিল। আমার হাইস্কুলে ছাত্র-ছাত্রী ছিল দুই হাজার। একদিন একটি মুসলিম মেয়ে রোজা রেখে, হিজাব পরে স্কুলে আসে। তখন তাকে ক্লাসের সবার সামনে রোজা এবং হিজাব নিয়ে কিছু বলতে দেয়া হয়। সে তার মত করে রোজা এবং হিজাবের বিষয়টি ফুটিয়ে তোলে এবং কারো কারো প্রশ্নের উত্তরও দেয়। এতটুকু স্পেস আমাদের কমিউনিটি অন্য ধর্মকে দিত। দেয়ার কারণেই ওইদিন আমরা নতুন কিছু জানতে পেরেছিলাম। হয়তো অনেকের মনে এসব নিয়ে প্রশ্নও ছিল। কিন্তু মুসলিম মেয়ের বর্ণনার কারণে তা দূর হয়ে গেলো।

মুসলিম অন্য কেউ না, আমাদেরই দেশে, কমিনিউটিতে বাস করে। মিডিয়া তাদের কীভাবে দেখালো, তা বিচার না করে ইসলাম আসলে কী বলে তা খতিয়ে দেখা উচিত। মুসলিমরাই কেবল তাদের নিজেদের রক্ষা করবে এমন নয়, বরং আমাদেরও তাদের প্রতিরক্ষায় দাঁড়াতে হবে। ইসলাম সম্পর্কে না জেনে যারা ফোবিয়া ছড়াচ্ছে, সেইসব বর্ণবাদীদের পক্ষে কেন দাঁড়াবেন? কেউ যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে কথা বলে, আমি ভাবি সে মুসলমানদের সম্পর্কে না জানার কারণেই এসব বলছে। কথায় আছে– 'অজ্ঞতা ডেকে আনে ভয়। ভয় ডেকে আনে ঘৃণা।' তাই ছোট থেকেই বাচ্চাদের শেখাতে হবে সহনশীলতা। তাহলে বড়ো হয়ে তারা উগ্র, অসহনশীল হবে না। আমি এর জ্বলন্ত প্রমাণ। বর্ণবাদী হওয়ার যাবতীয় পরিবেশ আমি পেয়েছি। কিন্তু সহনশীলতা শিক্ষা পাওয়ার কারণে নেতিবাচক মনোভাবে আক্রান্ত হইনি। আশা করি আমরা যদি আমাদের সন্তানদের সেই শিক্ষা দিতে পারি, তাহলে তারা আমাদের চেয়েও বেশি অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সুরক্ষা দিতে পারবে!

ভাষান্তর : রাকিবুল হাসান

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ইসলামোফোবিয়া

ইলিয়াস জাভেরি

সমসাময়িক বিশ্বে সবচেয়ে বহুল পরিচিত এক তত্ত্ব হলো 'ইসলামোফোবিয়া'। বিশ্বে নানান জাতি, নানান বর্ণ, বিচিত্র সংস্কৃতি আর বিভক্ত ধর্মে পরিচিত মানুষ। যেখানে সবার একটা অভিন্ন পরিচয় হলো মানুষ। তবে মুসলমান মানুষের বড় পরিচয় এখন সন্ত্রাসী হিসেবে, ইসলামবিদ্বেষী মনোভাবে মানুষের পরিচয় ছাপিয়ে তাকে এক ধর্মান্ধ জাতি হিসেবে বিবেচনার শিল্পের প্রচলন এখন দারুণ অবস্থায় পৌঁছেছে। পশ্চিমা স্বার্থে ইসলামোফোবিয়া শিল্পের বাম্পার ফলন দেখা যায় আফ্রিকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যে, এশিয়া থেকে আমেরিকা এবং সর্বশেষ ভৌগলিক অবস্থায় সর্ব দক্ষিণে থাকা নিউজিল্যান্ডে।

বর্ধিষ্ণু ইসলামোফোবিয়া কেবল পশ্চিম ইউরোপের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং আজ তা বলকানের মুসলিম দেশগুলোতেও ভয়ানকরূপ ধারণ করছে। কিন্তু কেনই বা এমন হচ্ছে? এর পেছনে কলকাঠি নাড়ছে কারা? তা খতিয়ে দেখতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে একটি তুর্কি গবেষণা সংস্থা ইউরোপ ও বলকান[৩৮] অঞ্চলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে জাতিগত বিদ্বেষ ছড়ানোর পেছনের সত্যকে বের করে এনেছে।

চারশ' বছরের অধিক সময় ধরে বলকান মুসলিম অঞ্চলের সাথে ইসলামোফোবিয়া জুড়ে যাওয়ায় তা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে কৌতূহলোদ্দীপক পাঠ্য। বলকান অঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ আলবেনিয়া, কসোবো ও বসনিয়া মুখোমুখি হচ্ছে ইসলাম-বিদ্বেষমূলক (বহু কর্মকাণ্ডের) নানা বাকবিতণ্ডায়। অধিকন্তু ম্যাসেডোনিয়া, সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর আদিবাসী মুসলমানদের বহুলাংশই ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে। ২০১৯ সালে প্রকাশিত "Islamophobia in Muslim Majority Societies" বইটি অবান্তর ও আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী মানসিকতার জবাব দিয়েছে। 'ইসলামোফোবিয়ার কলকব্জা নানাভাবেই চালিত হতে পারে। তবে মূলত তা

[৩৮] দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলকে বোঝায়। এর পূর্বে কৃষ্ণ সাগর, পশ্চিমে অ্যাড্রিয়াটিক সাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর। দানিউব, সাভা ও কুপা নদীগুলো অঞ্চলটির উত্তর সীমানা নির্ধারণ করেছে। বুলগেরিয়া থেকে পূর্ব সার্বিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বলকান পর্বতমালার নামে অঞ্চলটির নাম এসেছে।

বৈশ্বিক রাজনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই রাজনীতি উত্তর-উপনিবেশী একটি পর্যায়; যা মূলত আমেরিকার সম্পৃক্ততায় তৈরি হয়েছে।' এ দাবি বইটির রচয়িতাদের।

ইসলাম-বিদ্বেষী মনোভাব বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় আমেরিকা। Hijacked by Hate : American Philanthropy and the Islamophobia Network নামক প্রতিবেদনে ২০১৯ সালে চিত্রিত হয়েছে মুসলিম-বিদ্বেষী প্রচারণা ছড়িয়ে দিতে ১০৯৬টি সংস্থা দায়বদ্ধ। যারা অকাতরে অর্থ ঢেলে যাচ্ছে। হিসাবটা প্রায় ৩৯ মিলিয়ন ডলারে গিয়ে ঠেকেছে। ফলে ইসলামোফোবিয়া আটলান্টিক ছাড়িয়ে ইউরোপ ও বলকানের দেশগুলোতে চলে গেছে এবং সেখানকার মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে হয়ে গেছে একাকার। তাই মুসলিম-বিরোধী মনোভাব বেড়েছে হু হু করে। আত্ম-পশ্চিমীয় ও মুসলমানদের একাংশ যারা অভিজাত (নিজেদের মনে করে) যেমন– বলকানিরা ইসলামি বিধি-বিধানকে নিছক পরিচয় হিসেবে দেখতো; আর সাথে সাথে তা পশ্চিমী ধর্মনিরপেক্ষ দেশের জন্য আশঙ্কাজনক হিসেবেও বিবেচিত হতো।

২০১৯ সালে প্রকাশিত ইসলামোফোবিয়া রিপোর্টে তুর্কি সাংবাদিক নাদা দোস্তী আলবেনিয়ায় মুসলিম-বিদ্বেষী প্রচারণা চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ ও সমাধান করা আলবেনিয়া ও আলবেনিয়ান ভাষাভাষী দেশগুলোতে জরুরি বলে দাবি করেন। তুর্কি সংবাদ সংস্থা TRT World-কে তিনি আরও জানান, আলবেনিয়ায় প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানাভাবে নেতিবাচক প্রচারণার ফলে কর্মসংস্থান, শিক্ষা, গণমাধ্যম প্রতিনিধিত্ব ও বিচারব্যবস্থাসহ জীবনের নানা পর্যায়ে তীব্র থেকে তীব্রতর ইসলামোফোবিয়ার দেখা মিলছে।

২০১৯ সালে নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে মসজিদে হামলায় ৫১ জন শহিদ হওয়ায় আলবেনিয়ান কাস্তরিয়ত মাইফতরাজ নামক একব্যক্তি আলবেনিয়ান মুসলিমদের বিরুদ্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় বলে মন্তব্য করে।

ইসলাম-বিদ্বেষী প্রচারণার ক্ষেত্রে 'ইসলামোফোবিয়া'র ইন্ধনদাতার ভূমিকায় থাকে রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকরা। ফলত আলবেনিয়ায় ইসলামোফোবিয়া দিন দিন চিরাচরিত স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হচ্ছে বলে দোস্তীর দাবি।

এ প্রতিবেদনের কসোবো অংশের লেখক আদেম ফেরিজাজের মতে, কসোবো; যার ৯৬ ভাগ মুসলিম। তারা ইসলামোফোবিয়ার তীব্র উপস্থিতি আঁচ করতে পারছেন জীবনের পরতে পরতে। রাষ্ট্র হিসেবে যা কসোবোর অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। অধিকন্তু মুসলিম গণহত্যার মদতদাতা (যদিও তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন) অস্ট্রিয়ান ঔপন্যাসিক পিটার হ্যান্ড সাহেবকে (২০১৯ সালে) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করায় দেশটিতে ইসলামোফোবিয়ার আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হয়েছে।

সাহিত্যাঙ্গনের সবচেয়ে মূল্যবান পুরস্কার এমন ব্যক্তিকে দেয়ায় বসনিয়া হার্জেগোভিনা, কসোবোর মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রতি মূল ধারার ইউরো-আটলান্টিকিদের উপেক্ষার কথাই বলছে না; বরং এ অনুষ্ঠান ইউরোপীয় রাজনীতিবিদদের দিয়ে কসোবোর অধিকার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে ইসলামোফোবিয়ার আক্রমণকে সহজ ও সুগম করে তোলারই একটি পদক্ষেপ। কসোবোতে দৃশ্যত (হিজাব, দাড়ি) ইসলামচর্চায় মুসলমানগণ প্রতিনিয়ত নানা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। আর এটাও স্মরণীয় যে, বলকানের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষত বসনিয়া ও কসোবোতে ৯০ শতকের দিকে গণহত্যাগুলোর মূল কারণ ছিল ইসলামচর্চা। এ অঞ্চলের বহু মানুষ তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ফলে জীবন হারায়।

ভাষান্তর: হাবিবুর রহমান রাকিব

জেন্ডার ও ইসলামোফোবিয়া

ড. হাতেম বাজিয়ান

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার একটি রেস্টুরেন্ট। সাতজন হিজাব পরিহিত মহিলা প্রায় ৪৫ মিনিট সেখানে অবস্থান করেন। পুরো সময়জুড়ে তাদের পুলিশি নজরদারিতে রাখা হয়। এরপর, সেই সাতজন নারীকে হিজাব পরিধান করার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়। তাদের আদালতে হাজির করা হয়। এখান থেকে প্রতিয়মান, মুসলিম নারীদের জন্য রেস্টুরেন্টে আহারাদি গ্রহণ চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে, তার ওপর হিজাব পরিহিত হলে তো আর কথাই নেই। এ তীব্র প্রচারণাটি আমেরিকা, ইউরোপ ও বেশকিছু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশেও আগ্রাসী ও সহিংসতার রূপ নিচ্ছে।

ইউরোপীয় ধর্মনিরপেক্ষতার জের ধরে ফ্রান্স ও হল্যান্ডে হিজাব নিয়ে বিতর্ক দিন দিন তুঙ্গে উঠছে। পর্যায়ক্রমে ইউরোপীয় পরিচয়টি সংজ্ঞায়িত হচ্ছে এটি কী তা দিয়ে নয়; বরং ভবিষ্যতে এটি কী হবে তা দিয়ে। ইউরোপিয়ান পরিচয় গড়ে তোলা হয়েছে যা মুসলমানদের দলছুট বলে বিবেচনা করে। অপরদিকে মুসলিম নারীদের সমাজবহির্ভূত জ্ঞান করা হচ্ছে। মুসলিম নারীদের হিজাব পরিধান করা (তাদের আঁতে ঘা দিয়ে) পশ্চিমা ও ইউরোপীয় পরিচয় রক্ষার্থে এবং ইসলাম, মুসলিম নামক হুমকিকে প্রতিহত করতে ডানপন্থি রাজনৈতিক দলকে (টনক নাড়িয়ে) সুসংহত করেছে।

একাধিক পন্থায় ইউরোপীয় ও আমেরিকান সমাজে বর্ণবাদী মনোভাবে ঘি ঢালতে মুসলিম নারীদের ইন্ধন হিসেবে ব্যবহার করে ইসলামোফোবিয়ায় গতি সঞ্চার করা হয়। একইভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ তুরস্কে হিজাবের বিরুদ্ধে বহুদিন ধরে প্রচারণা চলমান ছিল। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে হিজাব, ঐতিহ্যগত মুসলিম নিকাব আধুনিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা বিবর্জিত প্রতীক। তাই আধুনিকতায় প্রবেশের এবং উন্নত হিসেবে দাবি করার পূর্বশর্ত ছিল এ আবরণটি বলপূর্বক অপসারণ করা।

বলাবাহুল্য, যে আধুনিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে উপনিবেশিক যুগে পরিচিতি লাভ করে এবং পশ্চিমারা ইসলামকে জাগতিক অনগ্রগতির জন্য দোষারোপ করে। ইউরোপ আমেরিকার রাষ্ট্রীয় নৈপুণ্যের হাত ধরে মুসলিম জাতিগুলো যখন উন্নয়ন ও

অধুনিকতার (স্বপ্নে বিভোর হয়ে) প্রাথমিক ধাপগুলো পার হচ্ছিল তখন ছিল মুসলিম হিজাব পরিহিতাদের জন্য দুঃসময়।

ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা আর মুসলিম জাতিগোষ্ঠী একই আবর্তে বৈধতাপ্রাপ্তির দিকে তাড়িত হয়। সাথেসাথে মুসলিম নারীদের সমস্যাজনক বিবেচনাটা স্বাভাবিক হতে থাকে। ঔপনিবেশিক ও বিকৃত সেকুলার আধুনিকতার চোখে মুসলিম নারীর হিজাব পরিধান কোনো প্রকার ধার্মিকতার প্রতীক বলে বিবেচিত হয় না বরং তা পশ্চাদপদতা ও অসঙ্গতির প্রতীক। এ চিন্তার ধারক-বাহকদের নিকট হিজাব অপসারণ করাই আধুনিকতা আর প্রাসঙ্গিকতার প্রতীক। অপরদিকে সে সমাজে তখন হিজাব পরিহিতারা নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতেন। মুসলিম প্রেক্ষিতে আধুনিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা উপনিবেশিকতার গর্ভে লালিত হয়েই এসেছে। আর জন্ম দিয়েছে একটি বিকৃত জাতি-রাষ্ট্র প্রকল্প যেখানে গঠনমূলক সামাজিক চুক্তি, নাগরিকত্বের মৌলিক বাস্তবায়ন এবং প্রত্যেকের মৌলিক অধিকারের নিতান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ইসলামোফোবিয়া ইন্ডাস্ট্রি, আধুনিক সেকুলার আর ঔপনিবেশিকদের অব্যাহত আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় হিজাবি মুসলিম নারী। আধুনিকীকরণ ও সেকুলারাইজেশনের নামে মুসলিম নারীকে হিজাব বর্জনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়, যদি না করে তাদের হিজাব ছাড়তে বাধ্য করা হয়; কেননা পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গিতে মুসলিম নারীগণের বুদ্ধির স্বল্পতা রয়েছে। তারা নিজেদের ভালোটা বোঝার জ্ঞান রাখে না।

এই বর্ণবাদী মনোভাবটি ইসলামোফোবিয়ার কুশীলব ও অরিয়েন্টালিস্টদের হিজাব বিষয়ে মৌলিক অবস্থানটি পরিষ্কার করে। হিজাবকে কেন্দ্র করে নারীর প্রতি এহেন অবমননাকর ধারণা পোষণ করা হয়– বিশেষত যেসব নারী জনসমক্ষে হিজাব পরিধান করে তাদের সম্পর্কে। মুসলিম নারীদের সভ্য করার জন্য আধুনিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে তত্ত্ব ও মতাদর্শের খোলসে মুড়িয়ে এই চলমান ও বৈশ্বিক প্রকল্পকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রজেক্ট হাল আমলের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রজেক্ট হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে। হিজাবী নারীদের প্রতি তেড়ে আসা সকল আক্রমণই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় যখন তা সভ্যতা সমুন্নত রাখা, পিছিয়ে পড়া মুসলিম মেয়েদের আলোকিতকরণের নাম করে করা হয়।

মুসলিম নারী হয়রানি ঘটনার যেন কোনো অন্ত নেই। যার আওতায় যেমন আছে তীব্র মৌখিক আক্রমণ তেমন আছে শারীরিক হুমকি; যার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিপর্যায়ে সহিংসতা ও হিজাব ছিনিয়ে নেয়া। উন্মাদনার ধোঁয়াশায় আরও একটু ঘৃতাহুতি দিতে যুক্ত করে, মুসলিম হিজাব পরিহিতা নারী প্যাসিভ সন্ত্রাসবাদের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই এটি একটি চ্যালেঞ্জ যা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। ইসলামি অন্যান্য নিদর্শনের চেয়ে তারা ডানপন্থি বামপন্থি উভয় চরম মাত্রার ইসলামোফোবিয়াকে ত্বরান্বিত করতে মুসলিম নারীদের মাথায় পরিহিত এ পোশাককে কাজে লাগায়। আর তারা সভ্যতা নামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। তাই সভ্যতা রক্ষার নামে ইসলামোফোবিয়ার প্রচারণা কোনো কলঙ্কজনক কিছু নয় বরং তা বর্ণবাদী জনতার লক্ষ্যকে ত্বরান্বিতকারী।

ইসলাম বিদ্বেষের নানা রূপই সমাজে উপস্থিত। তবে সবচে দৃঢ় ও ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী ভূমিকা ললালিত হয় মুসলিম নারীদের কেন্দ্র করে। কেননা হিজাব দৃশ্যমানভাবে চিহ্নিতকরণের কাজ করে। ইসলাম-বিদ্বেষের বিদ্যমান তথ্য ও গবেষণায় দেখা যায় যে, মুসলিম নারীদের প্রতি সহিংসতা ও বৈরিতার ঘটনার আরও বেড়ে চলার দিকে ইঙ্গিত করে। মুসলিম মেয়েরা মুসলিম পুরুষদের তুলনায় মারাত্মক আক্রমণের শিকার হয় প্রতিনিয়ত; অথচ তারা পশ্চিমা সংস্কৃতি ধারণ করে নিমেষেই পশ্চিমা ভিড়ে হারিয়ে যেতে পারত। বেঁচে যেতে পারত এহেন সব বৈরিতার ভয়াল থাবা থেকে। মুসলিম পুরুষরা পশ্চিমা সমাজে যেখানে ক্লার্ক কেন্ট হয়ে থাকে সেখানে মুসলিম রমণীরা সমাজে ইসলামের নিদর্শন উজ্জীবিতকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়।

ভাষান্তর : হাবিবুর রহমান রাকিব

হিজাব নিয়ে পশ্চিমা গপ্পো

রকিব মুহাম্মদ

সোশ্যাল মিডিয়ায় মাঝে মাঝে আধুনিকতাবাদী এজেন্টদের (পশ্চিমা) কাছ থেকে ওয়েস্টার্ন কাপড় পরে হেটে যাওয়া অতীতকালের মুসলিম দেশের নারীদের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রচারণায় ইরান ও আফগানি নারীদের তারা লক্ষ্যবস্তু বানায়। আধুনিকতার মশালবাহীরা ওয়েস্টার্ন পোষাক পরা নারীদের ছবি প্রচার করে বলে বেড়ায়, "এরা আগে কী ছিল, আর এখন কী হয়েছে!" আর কেউ কেউ মাথা নেড়ে বলেন, তাই তো! তাই তো!

এখানে একটা বড় ধোকাবাজি রয়েছে। ১৯২৪ সালের ইরানের শাসক ছিলেন সেক্যুলার রেজা শাহ। তবে তিনি কোনো গণতান্ত্রিক নেতা ছিলেন না। তিনি সেখানে ধর্ম পালনে অত্যধিক কড়াকড়ি জারি করছিলেন। হিজাব, বোরকা, দাঁড়ি রাখা সব বে-আইনি। ধর্মীয় উৎসব পালনে বিধিনিষেধ। কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে কঠোরতর হতে থাকলে ইংল্যান্ড-সোভিয়েত তাকে নির্বাসনে দেয়। এরপর, তিনি ১৯৪৪ সালে গত হন।

১৯৪১ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত ইরানে ডেমোক্রেটিক সেক্যুলারিজম ছিল। ১৯৫১ সালে মোসাদ্দদেগ ছিলেন গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। সেক্যুলার হলেও ছিলেন উপনিবেশবিরোধী মানুষ। নিজের দেশের ভালো-মন্দ বুঝতেন। ঐতিহাসিক এরভান্ড আব্রাহামিয়ান তার The Coup: 1953, the CIA and the Roots of Modern US-Iranian Relations বইতে লিখেছেন, মোসাদ্দেগ এমন উপনিবেশবিরোধীএকজন মানুষ ছিলেন, যিনি গনতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রশ্নে আপোসহীন ছিলেন।

১৯১৩ থেকে ইরানের সব তেল ইন্ড্রাস্ট্রি ছিল এংলো -পারসিয়ান অয়েল কোম্পানির অধীনে। ইউরোপ থেকে আইনে পিইচডি করা মোসাদ্দেকের সরকার তল বানিজ্যের জাতীয়করণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ঘটনায় ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো। সেই ক্ষতি বর্জ্রদন্ডের সাহায্যে স্বহস্তে ফেলেছিলেন অলিম্পাসের দেবতা জিউস। তেল রক্ষার্থে ব্রিটিশ সিক্রেট

ইন্টিলিজেন্স সার্ভিস (ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের দল) আমেরিকান গোয়েন্দাদের দল সিআইএকে বলল, চলো আমরা একসাথে কাজ করি। শুরু হলো

সামরিক অভ্যুত্থান। সিআইএ মোসাদ্দেগকে সেনাবাহিনী দ্বারা উৎখাতের নাম দিল 'অপারেশন এজাক্স'। মোসাদ্দেগকে গ্রেফতার করে তিন বছরের জেল দেয়া হল। তারপর রাখা হল নিজগৃহে নজরবন্দী অবস্থায়। জনগণের একটা সমর্থন ছিল তার প্রতি। তাই তিনি মারা গেলে তার বাড়িতেই নিরবে দাফন করা হয় বিপ্লবের আশংকায়। মোসাদ্দেগকে সরানোর পর ইরানে আমেরিকান পেট্রোলিয়াম কোম্পানিগুলো কাজ শুরু করে। ফ্রান্স এবং ডাচ পেট্রোলিয়াম কোম্পানিও কাজ শুরু করে।

এরপর রেজা শাহের পুত্র রেজা শাহ পহলবী রাজা হিসেবে শাসন করতে লাগলেন। দেশের সম্পদ বিদেশীরা নিয়ে যাবে এমন ইচ্ছা তারও ছিল না। তিনি তেল বানিজ্যের জাতীয়করণের ক্ষেত্রে মোসাদ্দেকের মতকে সমর্থনই করতেন। তবে পশ্চিমের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস পাননি তিনি। হয়ে গেলেন একজন একনায়ক, সেক্যুলার। পোস্ট রেভ্যুলোশনারী ফ্রান্স এবং ক্লাসিক্যাল আমেরিকান রাজনৈতিক চিন্তা থেকে ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে আলাদা করার চিন্তা তার মাথায় ছিল।

দেশে স্বৈরশাসক। এর মাঝে মুসলিম দেশ। যে দেশের শক্ত ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। সেসব ভুলে গিয়ে তিনি ভীনদেশের তরিকামতো আগানো শুরু করলেন। যার ফলাফল হিসেবে মাথা তুলতে শুরু করল সে দেশের ইসলামি দলগুলো। দেশে দূর্নীতি হলে, মানবাধিকার লংঘিত হলে সাধারণ মানুষ কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারে। অসহ্য পর্যায়ে চলে গেলে যেকোন আদর্শের ছায়াতলে গিয়ে তাদের বিদ্রোহ করার সম্ভাবনা থাকে। মানুষ বিদ্রোহী হলো। শাহ এই বিদ্রোহের উত্থানের নেপথ্যনায়ক হিসেবে ব্রিটিশদের দায়ী করতে লাগলেন। ব্রিটিশদের সাথে সম্পর্ক খারাপ করে তিনি আমেরিকা ও ফ্রান্সের সাথে জোট গঠন করলেন। কিন্তু ইসলামি জনশক্তির বিজয় ঠেকানো সম্ভব হলো না।

১৯৭৯ সালে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে হল বিপ্লব। যাকে বলা হয় ইরানি বিপ্লব। শাহের পতন ঘটে। ইরান ইসলামি প্রজাতন্ত্র হয়। ইরানের রাজতন্ত্র বিলোপ করা হয়। শাহকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে আসলে কী জানা গেল? মোসাদ্দেক, শাহ বা

ইরানের কথা। তবে আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো স্কার্ট পরা আধুনিক নারীরা। এই ইতিহাসের সাথে একটু যুক্ত করলেই সেটা বুঝে আসবে। তৎকালীন রেজা শাহ পুলিশদের নির্দেশ দিয়েছিলেন হিজাব পরে বের হলে বা মাথায় কাপড় দিলে পুলিশ যেন জোর করে তা খুলে ফেলে। এটাই হলো ওইসব ছবির মূল ইতিহাস। এইসব অতীতের ছবি দিয়ে এবং তার বিপরীতে বোরকা পরা মেয়েদের ছবি দেখিয়ে ভয়ের পলিটিক্স করা হয়। বুঝানো হয় যে আগে সেখানে মহিলাদের অধিকার ছিল আর এখন কিছুই নাই। এর মাঝে এমন কিছু ইঙ্গিত থাকে যা আধুনিক মানবতাবাদীর মনে ভয়ের উদ্রেক করে। এবং জাগিয়ে তুলে ইসলামোফোবিয়া।

আমাদের দেশেও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মেয়েদের প্রতিবাদের ছবি দেখিয়ে বলা হয়, দেখুন আগে কোন মেয়েদের মাথায় কাপড় ছিল না। কিন্তু এখন ভার্সিটিতে কত হিজাবী মেয়ে দেখা যায়। যারা এসব বলেন তারা বুঝাতে চান যে, দেশে ব্যাপক হারে ইসলামাইজেশন বা মৌলবাদী ইসলামাইজেশন হচ্ছে। সেই একই ভয়ের রাজনীতির চেষ্টা। কিন্তু এই কথার ফাঁকটা হল, ১৯৫২ সালে কতজন রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের মেয়ে বিশ্ববিদ্যলয়ে যেত, এখন কতজন পড়ে সেই সংখ্যার তারতম্য। আগে রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের মেয়েরা কম যেত বিশ্ববিদ্যলয়ে, এখন অনেক বেশী যাচ্ছে। বর্তমানে ১৯৫২ সালের থেকে অনেক অনেক বেশি কনজারভেটিভ ফ্যামিলির মেয়েরা বিশ্ববিদ্যলয়ে পড়ছেন। সেই অনুপাতে দেখা যাচ্ছে হিজাবের সংখ্যাবৃদ্ধি। এইসব ছবি নিয়ে যারা খেলতে আসেন তাদের ঘরের মেয়েরাও এখন বোরকা পরা শুরু করেছে, এমন খবর আমরা সংবাদমাধ্যমেও দেখতে পাই অহরহ।

'ওয়ার অন টেরর': সন্ত্রাস দমনের নামে মুসলিমনিধন প্রকল্প

রকিব মুহাম্মদ

চলতি শতকের শুরুর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (ওয়ার অন টেরর) ঘোষণা করে, কি এক অলৌকিক কারণে এই যুদ্ধটা মুসলিম জাতির বিরুদ্ধেই সমাধিক খ্যাতি পেয়ে যায়। পশ্চিমা মোড়লরা 'ওয়ার অন টেরর'র নামে মুসলিম বিশ্বকে সামরিকভাবে যুদ্ধের বেশে ধ্বংস করতো, তা এখন সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করে দিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়াই অমুসলিমরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে সামরিক ঢঙ্গে মুসলিমকে মারা শুরু করেছে, ইসলাম আর সংখ্যালঘুদের ওপর যেখানে সেখানে আক্রমণ করছে।

বিশ্বে পশ্চিমা শিক্ষিত পণ্ডিতদের প্রচারিত বিচিত্র সমাজের ধারণা যে অকার্যকর হয়ে পড়েছে, তা দাতব্য সংস্থা অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। সেখানে বলা হয়েছে, নিজেদের সঠিক প্রমাণ করতে শেতাঙ্গ ধর্মান্ধরা এখন হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। আমরা কেবল শোক প্রকাশ করে পরবর্তী নারকীয়তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকতে পারি না। সন্ত্রাসী বেন্টন নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চ মসজিদে যে নৃশংসতার সৃষ্টি করেছে তা বিশ্বে ভয়াবহ এক পরিণতির চূড়ান্ত সতর্কতা মাত্র। 'স্পষ্টত, এটা শুধু পশ্চিমা সমাজের ব্যাপার নয়। অনেক মুসলিমই ক্রাইস্টচার্চকে বিশ্বে বিপজ্জনক সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত ক্রমবর্ধমান ইসলামোফোবিয়ার ক্ষুদ্র একটা অংশ হিসেবেই দেখছে।'

এভাবেই আজকের ক্রাইস্টচার্চের বীজ বপন হয়েছিল পেন্টাগনের গোপন কোনো কক্ষে, আধুনিক বিশ্বের মোড়লদের চকচকে হাতে। ইসলামবিদ্বেষ, সদা চামড়াই শ্রেষ্ঠ, এই শিল্পকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছে যার ফলে কিছু মূর্খ বর্বর শিকারির হাতে পাখির মতো প্রাণ হারাতে হয়েছে ক্রাইস্টচার্চের দুই মসজিদে প্রার্থনারত অর্ধশত মুসলিমকে। এভাবেই বুলেটভর্তি রাইফেল নিয়ে পশ্চিমের অনেক ঘরেই তৈরি হচ্ছে নব্যক্রুসেড। মানুষের মধ্যে যে অসভ্য উগ্রতা শায়িত থাকে, বর্ণবাদের যে ধারণা শৈশব থেকে মানুষকে পণ্যের ন্যায় চিহ্নিত করতে শেখায়, সেই উগ্রতাকে উসকে

দিতে ইসলামোফোবিয়া খুবই কার্যকর হাতিয়ার হয়ে ওঠে পশ্চিমা শেতাঙ্গ অভিজাত শ্রেণির কাছে।

এরকম শত ঘটনার মধ্যে আরেকটি ঘটনা হলো, ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ আনুমানিক দুপুর ২টার দিকে ১৯ বছর বয়সি একজন বন্দুকধারী ফ্লোরিডার মারজোরি স্টোনম্যান ডগলাস হাই স্কুলে তার সাবেক শিক্ষক এবং সহপাঠীদের ওপর গুলি বর্ষণ শুরু করে। এতে ১৭ জন নিহত এবং কয়েক ডজন মানুষ গুরুতর আহত হয়। এ পর্যন্ত মার্কিন স্কুল ক্যাম্পাসে এটি ১৮তম হামলার ঘটনা এবং এটিই সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটলেও, ভয়াবহ বন্দুক হামলার মধ্যে এটি নবমতম স্থানে ওঠে এসেছে। পরের দিন সকাল ৬ টায় কর্তৃপক্ষ বন্দুকধারীকে নিকোলাস ক্রুজ নামে চিহ্নিত করে এবং ১৭ জনের খুনের মামলায় তাকে অভিযুক্ত করা হয়। যদিও এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য এখনো জানা যায়নি। তবে, হত্যাকারীর মনস্তাত্ত্বিক প্রোফাইল ইতোমধ্যে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে এবং তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খুবই সাধারণ একটি বিষয়।

কিলার এমন ঘটনা ঘটাতে পারে সে সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অনেক জল্পনা ছিল। সেখানে সতর্কবার্তা ছিল। ফ্লোরিডা টেলিভিশন স্টেশনকে একজন শিক্ষার্থী বলেন, 'অনেক লোক বলছিল যে, সে ক্রুজ এমন একটি ঘটনা ঘটাতে যাচ্ছে। ঘটনাটি অনেকের পূর্বাভাসকে সত্যে পরিণত করেছে। এটা সত্যিই ক্রেজি।' ক্রুজ যে এই ধরনের নিষ্ঠুরতা চালাতে সক্ষম- সে সম্পর্কে তারা কীভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছিল, ছাত্রটি তা বলেনি। তবে তাদের ভবিষ্যদ্বাণীর কারণগুলো সম্ভবত হতে পারে যে, ক্রুজকে ক্রমাগতভাবে স্কুলটি থেকে বরখাস্ত করা হচ্ছিল এবং অবশেষে তাকে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। এটি সম্ভবত বন্দুক ও ছুরির প্রতি তার আগ্রহ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তার পোস্ট এবং মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা পোষণের কারণে স্কুল কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নেয়। ছাত্রটি বলেছিল, 'সামাজিক মাধ্যমে তার পোস্ট করা সব কিছুই ছিল অস্ত্র সর্ম্পকিত। এটা তার অসুস্থতা প্রকাশ করে।' আরেকজন ছাত্র ক্রুজ সম্পর্কে জানায় যে, 'সে প্রায়ই ট্রাম্প ক্যাপ পরতো এবং ইসলাম সম্পর্কে ঘৃণাসূচক লেখা সম্বলিত অতি-দেশপ্রেমিক টি-শার্ট পরতো। এছাড়াও, মুসলিমদের সন্ত্রাসী ও বোমাবাজ হিসেবে উপহাস করার জন্যও ক্রুজ পরিচিত ছিল।'

এই ঘটনার পর ফ্লোরিডার রিপাবলিক প্রতিনিধি ও শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী গ্রুপের নেতা- যার লক্ষ্য হলো ফ্লারিডাকে শুধুই শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত রাজ্য

বানানো। তিনি বলেন, ক্রুজ তাদের আধা-সামরিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিল এবং সে তাদের একজন সদস্যে পরিণত হয়েছিল এবং হামলায় ব্যবহৃত তার কেনা 'এআর -১৫' রাইফেলটি তাদের গ্রুপটি থেকে কেনা হয়েছিল বলে ছাত্রটি স্বীকার করে।

আমেরিকার উচ্চ শক্তিধর অস্ত্রের জন্য বিকৃত লালসা মুসলিম ঘৃণার পিছনে কাজ করছে এবং ক্ষমতাশালী ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন (এনআরএ) দেশটির ৩.৫ মিলিয়ন আমেরিকান মুসলমানদের প্রতি ক্রমবর্ধমানভাবে বিদ্বেষকে উসকে দিচ্ছে। এনআরএ -এর ২০১৫ জাতীয় বার্ষিক সম্মেলনের একটি সেশনে সদস্যদেরকে কিছু নিদের্শনা দেয়া হয়েছিল। এরমধ্যে ছিল-ইসলামিক চরমপন্থিরা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও ইসলামিক আইন প্রণয়ন করে, সেক্ষেত্রে সদস্যরা কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে, সেইসব নির্দেশনা। এটিকে আমেরিকান বন্দুক মালিকদের জন্য প্রকৃত হুমকি বলে অভিহিত করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক শ্রোতাদের জানান যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এমন এলাকায় ছিলেন যেখানে কেবল মুসলিমদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি দাবি করেন, এটি এমন এলাকা যেখানে পুলিশও প্রবেশ করতে অস্বীকার করে। তিনি উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্য বলেছিলেন, 'রাস্তার চিহ্নগুলো রাতারাতি ইংরেজি থেকে আরবিতে রুপান্তরিত হয়ে যায়। কোনো দোকান বা রাস্তার কোনো চিহ্নে একটি ইংরেজি শব্দও ছিল না। এটা আমি আমার নিজের চোখে দেখেছি এবং এটিই বাস্তব।'

পরে ডানপন্থী 'ফক্স নিউজ' সহ মার্কিন গণমাধ্যমের খবরে স্বীকার করা হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দিষ্ট এলাকায় শুধু ধর্মের ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তিরা থাকেন- এমন বিবৃতিকে সমর্থন করার বিশ্বাসযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু আসল সত্য উৎঘাটন হোক বা না হোক, এই মুসলিম-বিরোধী ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলো কেবল সত্য হিসাবেই গ্রহণ করাই হয়নি, বরং এটি মিডিয়ার মাধ্যমেও অতিরঞ্জিত করে তোলা হয়। যারা মুসলমানদের সম্পর্কে ভয়, ঘৃণা ও সন্দেহের গুজব ছড়ায়, এটি ছিল তাদের জন্য এক ধরনের পুরস্কার।

আমেরিকান মানবাধিকার গ্রুপ 'হেইট হার্টস'- এর প্রতিষ্ঠাতা ইমরান সিদ্দিকী বলেন, 'যদিও এই বিষয়ে খুব সামান্যই কভারেজ রয়েছে। এটা খুব কমই বিস্ময়কর যে, বেশির ভাগ মুসলিমবিরোধী রাজ্যগুলোতে ব্যাপক মিলিশিয়া কার্যকলাপ এবং অনিয়ন্ত্রিত বন্দুকের সংস্কৃতি বিরাজ করছে। বন্দুক-সংস্কৃতি

ও ইসলামোফোবিয়ার মধ্যে যে অন্তচ্ছের্দ রয়েছে তার একটি স্পষ্ট উদাহরণ হিসাবে আমরা ফিনিক্স, অ্যারিজোনার সশস্ত্র মসজিদ প্রতিরক্ষাকে ফিরে দেখতে পারি। মিলিশিয়া সদস্যরা মসজিদের বাইরে এরআর-১৫ এবং অন্যান্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।' ইমরান সিদ্দিকী বলেন, 'এই ধরনের পদক্ষেপসমূহ টেক্সাস, সাউথ ডাকোটা, ক্যানসাসের মতো জায়গায় বিদ্যমান রয়েছে। এটা ভুলে যাওয়ার নয় যে, ট্রাম্পের সমর্থক শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যের মিলিশিয়া গ্রুপটি ২০১৬ সালে সোমালি সম্প্রদায়ের ওপর বোমা-হামলার চেষ্টা করেছিল।'

একজন সুপরিচিত আমেরিকান মুসলিম বক্তা ও ইয়াকিন ইনস্টিটিউট ফর ইসলামি রিসার্চের প্রেসিডেন্ট ওমর সুলায়মান এক সাক্ষাতকারে বলেন, 'সশস্ত্র সদস্যরা মুখোশের আড়ালে শুয়োরের রক্তে তাদের বুলেট ডুবিয়ে দিচ্ছে। এটি এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারা একদিন আমাদের সব মুসলমানদের গুলি করতে যাচ্ছে।' যে শেষ পর্যন্ত আমরা ক্রুজের এই নিষ্ঠুর সহিংস আচরণের একটি পরিষ্কার ধারণা পাব বলে আশা করছি। এটি লক্ষ্যণীয় যে, শ্বেতাঙ্গ মিলিশিয়াদের হাতে হত্যার সংখ্যা ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 'এন্টি ডিফ্যামেশন লীগ'-এর একটি প্রতিবেদনে এই তথ্য ওঠে এসেছে। বন্দুকের সহজলভ্যতা ঘৃণা অপরাধকে বৃদ্ধি করেছে। এই সহজলভ্যতা কেবল যুদ্ধক্ষেত্রের ইঙ্গিত দেয়। এদিকে নিজেদের ঘরের লোকের খবর নেই এইসব মোড়লদের। আজোভ ব্যাটালিয়ন ট্রান্সন্যাশনাল রাইট উইং ভায়োলেন্ট এক্সট্রিমিস্ট (আরডব্লিউএইচ) নামটা শুনেছেন নিশ্চয়? এটি শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বেড়ে উঠছে। এই গোষ্ঠীটি নিজস্ব 'ওয়েস্টার্ন আউটরিচ অফিস' পরিচালনা করে, যা বিশ্বব্যাপী এমন সহিংস ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে হিংস্র সংস্থার লোকদের আকর্ষণ করতে সহায়তা করে এবং এদের প্রশিক্ষণের জন্যে বিদেশি যোদ্ধাদের নিয়োগদান করে। আউটরিচ অফিসের অপারেটররা সংগঠনটিকে প্রচার করার জন্য এবং সাদা আধিপত্যবাদী মতাদর্শ ছড়িয়ে দিতে সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করে। ২০১৮ সালের জুলাইতে, জার্মানির থুরিঙ্গা প্রদেশে ডানপন্থি এক রক উৎসবে জার্মান ভাষায় লেখা আজোভ ব্যাটালিয়নে যুক্ত হতে আমন্ত্রণপত্র বিলানো হয়। আমন্ত্রণপত্রে 'বিলুপ্তি থেকে ইউরোপকে রক্ষার জন্য' এবং 'সেরাদের দলে যোগদান করতে' আহ্বান জানানো হয়েছিল।

এমন ঘটনা মানুষ জানেও না তেমন, পশ্চিমা মিডিয়ায় জানানো হয়নি এসব, অথচ মুষ্টিমেয় কতক মুসলিম একই কাজ করলে প্রভাবশালী মিডিয়াগুলো চাউর করে সংবাদ প্রকাশ করতো। তার মানে এই নয় যে, উগ্রবাদ ভালো। উগ্রবাদ ক্ষতিকর তা সব ধর্মের জন্যেই একইভাবে সত্য। তবে, মুসলিমদের যেকোনো ক্ষুদ্র সহিংসতাকেও যতো সহজে জঙ্গিবাদের তত্ত্বে ফেলা যায়, অমুসলিমদের এমন নারকীয় কাণ্ডেও তাদের সন্ত্রাসী বলতে বিশ্বমিডিয়ার অনীহা দেখা যায়। বর্ণ, ধর্ম আর শ্রেণিভেদের পক্ষপাতে মানবতাকে গলা টিপে হত্যা করতেও বাধে না সুশীল-সমাজের এই প্রতিনিধিদের।

ওয়ার অন টেররের মাধ্যমে বিশ্বে ইসলামোফোবিয়ার যে নেতিবাচক জনপ্রিয়তা অর্জিত হয়েছে, তা অচিরেই নির্মূল করতে সমাজ থেকে বৈষম্য মুছে ফেলতে হবে। গুটিকতক মানুষের স্বার্থ হাসিলে, বিশ্বের অমুসলিমরা এমন ইসলামঘৃণার তত্ত্বকে আয়ত্ত্ব করতে থাকলে, তা অচিরেই সবকিছু ধ্বংস করে দিবে। বৈষম্যকে কখনই যেখানে স্থান দেয়া উচিৎ নয়। সন্ত্রাসের কোন ধর্ম থাকে না।

ইসলামোফোবিয়া ও শরণার্থী সঙ্কট

রকিব মুহাম্মদ

দ্বিতীয় যুদ্ধের পর ইউরোপ আজ সবচে বড়ো শরণার্থী সংকটে ভুগছে। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থের জন্য পাশ্চাত্যের ডানপন্থি এমনকি মধ্যপন্থিরাও ইসলামোফোবিয়াকে ব্যবহার করছেন। আজকের এই শরণার্থী সংকট তো ইউরোপ দখল কিংবা ইউরোপের ওপর কর্তৃত্ব করার জন্য নয়। বরং সন্ত্রাস ও গৃহযুদ্ধে বাস্তচ্যুত বিভিন্ন ধর্মমতের মানুষ জীবন বাঁচানোর তাগিদে ইউরোপমুখী হয়েছে। আশ্রয় চেয়েছে থাকার। তারা চায় শান্তিতে ও নিরাপত্তার সাথে জীবন কাটাতে। একই সাথে এটা ইউরোপের ভেতরকার সংকটকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে; তাদের দুয়ারে এসে করাঘাতকারী শরণার্থীদের সাথে কী আচরণ করেছে তারা। অথচ তারা ইউরোপকে বহুজাতিক মহাদেশ বলে বুলি আওড়ায় এবং একে তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে তুলে ধরে।

এদিকে শরণার্থী ইস্যুতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সব দেশ একটি অভিন্ন কৌশলে অগ্রসর হয়েছে। প্রতিটি দেশ স্বতন্ত্রভাবে শরণার্থী সংকট মোকাবিলা করছে। কোন যৌথ কর্মকৌশল ব্যতীত ইউরোপীয় শরণার্থী সংকটের সমাধান করা সম্ভব নয়। শরণার্থী-সঙ্কট মোকাবিলায় অভিন্ন কৌশল না থাকায় ইউরোপীয় নাগরিকদের জন্য সব দেশে ভিসামুক্ত অবাধ চলাচলের 'শানগান' চুক্তিও প্রায় হুমকির মুখে। এভাবে বর্তমান শরণার্থী সঙ্কট ইউরোপের জন্য একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ এনে দিয়েছে; তারা কি তাদের পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে না কি ফিরে যাবে পেছনে? সাধারণত পূর্ব ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ আফগান, ইরান, সিরিয়া ও ইরাক থেকে আসা শরণার্থীদের প্রথম টার্গেটে থাকে। এসব দেশ থেকে তারা জার্মানিতে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ কারণে ইউরোপের সীমান্তবর্তী দেশগুলো শরণার্থী ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে পশ্চিমা দেশগুলো থেকে মুসলিমদের সংখ্যা বেশ কম। যেমন- ফ্রান্সে মোট নাগরিকের দশ ভাগ হলো মুসলিম। অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, জার্মান ও সুইডেনে শতকরা প্রায় ছয় ভাগ মানুষ মুসলিম। যদিও পশ্চিম ইউরোপের বুলগেরিয়া ও গ্রিসের মতো

দেশগুলোতে মুসলিম নাগরিকদের কমিউনিটি আছে। অন্যদিকে ইউরোপের পূর্ব দেশগুলোতে তুলনামূলক মুসলিম কম। অনেক ক্ষেত্রে তো এক শতাংশ। স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো ৩৩১ জন আশ্রয়প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১৪ জনকে তার দেশে আশ্রয় দিয়েছেন। রবার্ট ফিকো বলেন, খ্রিস্টান শরণার্থীদের আগমণে স্লোভাকিয়ার স্থানীয় মানুষদের মধ্যে কোনো ভীতি কাজ করে না। অথচ স্লোভাকিয়ায় মুসলিমদের সংখ্যা দেশের মাত্র .০২ শতাঙ্ক। ফিকোর ওপর ডানপন্থিরা যথেষ্ট চাপ প্রয়োগ করার কারণে ফিকো ইউরোপের ইসলামাইজেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। তাছাড়া চেক প্রজাতন্ত্রের মুসলিমবিরোধী বিভিন্ন দল মুসলিম শরণার্থী প্রবেশের বিরুদ্ধে আনা এক দরখাস্তে ১,৪৫,০০০ ব্যক্তির সই সংগ্রহ করে। কিন্তু চেক প্রধানমন্ত্রী মানবাধিকার রক্ষার পরিবর্তে আগত মুসলিম শরণার্থীদের বিষয়ে বলেন, 'শরণার্থীরা সম্পূর্ণ ভিন্ন সাংস্কৃতিক ব্যাকগ্রাউন্ডের। তারা চেক প্রজাতন্ত্রে কিছুতেই ভালো অবস্থায় থাকতে পারবে না।'

পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিদ ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নেতারা শরণার্থীদের সাথে সন্ত্রাসের আশঙ্কার কথা জুড়ে দেয়া শুরু করেন। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থার কর্মকর্তারা সিরীয় শরণার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের বিষয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। সিরীয় শরণার্থীদের প্রবেশের সুযোগে সন্ত্রাসীরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারে। তাই সিরীয় শরণার্থী প্রবেশের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার নির্বাচনি প্রচারণায় সিরীয় শরণার্থীদের তথ্য পর্যালোচনা-পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন মসজিদ-নজরাদি করার আহ্বান জানান।

ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিক আশান শারু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে ইহুদি শরণার্থীরা যে সংকটের মুখোমুখি হয়েছে, তার সাথে বর্তমান মুসলিমদের প্রতি পাশ্চাত্যের এই দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করেন। ইহুদিদের প্রতি যখন ফ্যাসিস্ট হিটলার বিভিন্ন উত্তেজনাকর বক্তব্য দিচ্ছিল এবং তাদের ওপর নিপীড়িত হচ্ছিল, যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর জনগণ জার্মান ইহুদিদের বিষয়ে খুব একটা গুরুত্ব দেখায়নি। শারু বরং বলেন, 'পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো ইহুদিদের প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল। তারা ঔদ্ধত্যমূলকভাবে অনেক সময় এমন করতো। যেমন, যেসব সেক্টরে শ্রমিকের প্রয়োজন হতো, পশ্চিম ইউরোপ নিজেদের উন্নাসিকতার জন্য অন্যদের প্রবেশের সুযোগ দিতো না।

মোটকথা, আজকের শরণার্থীদের প্রতি ইউরোপের এই ভীতিচর্চাকে গত শতাব্দীর ত্রিশ শতকের এন্টিসেমিটিজমের মধ্যে পাওয়া যায়। বর্তমান কিছু সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইসলামোফোবিয়াকে 'সামি' বিদ্বেষের গোপন পরিকল্পনার অংশ বলে মনে করেন। ইসলামবিরোধী বিভিন্ন ইলেকট্রিক পেইজে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায়, শরণার্থী আলোচনায় মানেই মুসলিমবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করা। পেজগুলোতে বর্ণবাদের বিষাক্ত ঘৃণা দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। 'হাঙ্গেরির বর্ডার পার হওয়ার সময় কিছু মুসলিম আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিচ্ছে' একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। হাঙ্গেরির ডানপন্থি রাজনৈতিক কর্মী পামেলা এই ভিডিওর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'এটা ইউরোপের ওপর যুদ্ধঘোষণা করার শামিল। আল্লাহু আকবর আওয়াজকারীদের আগ্রাসী যোদ্ধাও অভিহিত করে বলেন, এদের তো ইউরোপের আসার প্রকৃত কোনো প্রয়োজন নেই।' তিনি গণমাধ্যমকে অভিবাসীদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমরা প্রকৃত শরণার্থীদের বিষয়ে কথা বলছি না। কিন্তু ইরাক, আফগানিস্তান ও সিরিয়ার উত্তপ্ত জিহাদের পয়েন্ট থেকে আসা মুসলিমদের নিয়ে আমাদের আপত্তি। যারা মূলত ইউরোপে জিহাদের জন্য হিজরত করছে।' পামেলার মতে, ধনী রাষ্ট্রগুলো তো পৃথিবীর অর্ধেক মানুষকে অর্থায়ন করতে পারে না।

ইসলামোফোবিয়ায় আক্রান্ত বিভিন্ন গণমাধ্যম ইউরোপে মুসলিমদের এই আগমণকে 'সন্ত্রাসের হিজরত' বলে অভিহিত করেন। পামেলা গেলার বলেন,'গণমাধ্যম সবসময় আমাদের এটা বিশ্বাস করতে বলে, আপনি যদি আপনার দেশে এদের প্রবেশে অনুমতি না দেন তবে আপনি নির্দয়, গোঁড়া, বর্ণবাদী ও ঘৃণিত।'

ইসলামবিরোধী রাজনৈতিক বক্তব্য ও কার্যক্রমের পাশাপাশি শরণার্থী বিষয়ে ইউরোপীয় আলোচনায় একজন স্বাভাবিক পর্যবেক্ষকের নিকটে স্পষ্ট হবে, ইসলামবিরোধী এসব মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি এখন ইউরোপের পরিমণ্ডলে খুবই স্বাভাবিক বিষয়।

ইসলামবিরোধী অন্য একটি ইলেকট্রিক পেজে বলা হয়, 'অভিবাসী মুসলিমরা সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা থেকে সুবিধা নেয়ার জন্য একাধিক বিবাহ করার পরিকল্পনা করে।' জার্মানিতে সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থার অঋকহিসেবে নারীরা নিজের এবং সন্তানদের জন্য আলাদা বাড়িতে থাকার জন্য অর্থ চাইতে পারে। এক্ষেত্রে নারীদের দেখাতে হয়, তাদের সাথে শুধু সন্তানই আছে, স্বামী নয়।'

তাছাড়া অভিবাসনের ফলে নাগরিকদের ডেমোক্রাফিক পরিবর্তন দেখা দেবে। মুসলিমদের সংখ্যা ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পাবে।

কিছু কিছু পেজ তো এমন কথাও প্রচার করে, 'জার্মানজুড়ে ইসলামি শরিয়াহ বাস্তবায়নের পথ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে কিছু করতে অক্ষম।' এটা উগ্র ডানপন্থিদের প্রচারণা। ধীরে ধীরে এটা অনেক ট্রাডিশনাল রাজনীতিবিদদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করে।

খ্রিস্টানদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত দুর্বলতা

২০১৩ সালে ইউরোপের বর্তমানের শরণার্থী সংকট শুরু হওয়ার আগেই অস্ট্রিয়ার ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইকেল সিন্ডলিগার ঘোষণা করেছিলেন, তিনি সিরিয়া থেকে পাঁচ শতাধিক শরণার্থীকে স্বাগত জানাবেন। তবে নারী, পুরুষ এবং খ্রিস্টানদের অগ্রাধিকার দিতে চান তিনি। অস্ট্রিয়ার রেড ক্রিসেন্টের প্রধান বেশ অবাক হয়েই প্রশ্ন করলেন, বিষাক্ত গ্যাস কি খ্রিস্টানদের অধিক যন্ত্রণা দেয় অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে? জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সর্বোচ্চ পরিষদ এই বক্তব্যেরবিরোধিতা করা সত্ত্বেও পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার বক্তব্য ও কর্মপন্থায় অবিচল ও অটল থাকেন। এমনকি তার দলের সহকর্মী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাওয়ানা মাইকেল বলেন, 'খ্রিস্টানরা যে বিপদের মুখে এটা অনেকে না জানার চেষ্টা করে। একইভাবে কিছু সাংবাদিক মন্ত্রীর বক্তব্যের সমর্থনে বলেন, প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধের সময়ের ক্যাথলিক গির্জার ভূমিকাটি বর্তমান ভ্যাটিক্যান কর্তৃপক্ষ পালন করছে। আজ ভ্যাটিক্যানকে পবিত্র ভূমির খ্রিস্টানদের সাহায্য করা ও রক্ষা করতে হবে।

মাইকেলের বক্তব্য অনুসারে সিরিয়ায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে খ্রিস্টানরা সবচে বেশি নির্যাতিত। অস্ট্রিয়ার একটি গণমাধ্যম শরণার্থীদের গ্রহণের বিষয়ে একটি শিরোনাম দিয়েছিল, 'সিরীয় শরণার্থী জনতা পার্টি চায় খ্রিস্টান; ডেমোক্র্যাটিক পার্টি চায় সবাইকে; ডানপন্থি ফ্রিডম চায় না কাউকে।' সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ ও আইসিসের তাণ্ডব শুরু হওয়ার আগেই পশ্চিমে শরণার্থী গ্রহণ বিষয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি চলছিল। আর গৃহযুদ্ধ ও আইসিসের তাণ্ডবের পর তো ইউরোপে শরণার্থীর ঢল নামে। মাইকেলের এ বক্তব্যের মাধ্যমে ২০১৫ সালে শরণার্থী ঢলের সময় ইউরোপের কিছু দেশের প্রক্রিয়া কী হতে পারে তা অনুমেয়।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর সবচে বড়ো শরণার্থী সংকট

জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশন জানায়, ২০১৫ সালের ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংকটের কারণে ৪ মিলিয়নের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সিরীয় মানুষ শরণার্থী হয়েছে। ইতোপূর্বে ইউরোপ শরণার্থী নিয়ে এতটা সংকটে পড়েনি। তদুপরি পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের কিছু রাজনীতিবিদ এবং সর্বাধিক ধনী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ধর্মকেন্দ্রিক শরণার্থীদের সাথে বৈষম্য করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্ববৃহৎ এই শরণার্থী সঙ্কটে ইউরোপের যৌক্তিক সহযোগিতা করা উচিত ছিল। অথচ সহযোগিতার পরিবর্তে কীভাবে ইউরোপে নিবন্ধিত শরণার্থীদের সংখ্যা হ্রাস করা যায়, এটাই এখন ইউরোপের সবসময়ের চিন্তা। অথচ এই ইউরোপের সবচে বড়ো অর্জন 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন' দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষের ওপর গড়ে উঠেছে। যেখানে শরণার্থীদের ভূমিকা সবচে বড়োই বলা চলে।

শরনার্থী সংকটের নেপথ্যে

পশ্চিমারা এখন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে, একদল মার্কিনপন্থি তো অন্যদল রুশ। আরব বিশ্বেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি, তেল কিংবা এই শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সমর্থনের পক্ষপাত। কোনো না কোনো কারণে একেকটি ইসলামি রাষ্ট্রে হামলে পড়েছে পশ্চিমা শাসকরা। উপনিবেশবাদ অনেক আগেই প্রাচীন তত্ত্বের কোটায় পড়ে গিয়েছে, নব্য-উপনিবেশবাদ, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, উদারতাবাদ, নব্য-উদারতাবাদ নামের নানান শিরোনামে সর্বদাই উচ্চ শ্রেণি নিম্নশ্রেণিকে শোষণ করছে। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার নামে একেকটা দেশ গৃহযুদ্ধের নামে ধ্বংস হতে থাকে, এই প্রক্রিয়ায় যাদের প্রাণ যায় তারা হয়তো বেঁচে যায়। যারা জীবিত থাকে তারা স্বজন হারিয়ে কিংবা পরিবারসহ নিজভূমি ছেঁড়ে পাড়ি জমায় উন্নত, উদার বিশ্বে, আর তারাই পরিচিতি পায় উদ্বাস্তু হিসেবে। পরিসংখ্যান না ঘেঁটেও বলে দেয়া যায় চলমান শতকের সব যুদ্ধক্ষেত্র ছিল একেকটা মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র, স্বভাবতই উদ্বাস্তু ও হয়েছে এসব দেশের নিপীড়িত মুসলিমরা।

মানবতা রক্ষার্থে পশ্চিমারা নিজদেশে এই উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়। জোর করেই হোক কিংবা চক্ষুলজ্জায়, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আহত, ক্ষত-বিক্ষত এই মুসলিম শরণার্থীরা সেই পশ্চিমাদের কাছেই আশ্রিত হচ্ছে যাদের হাতে ইসলামোফোবিয়ার প্রচলন। কাকতালীয়ভাবে না, অনেকটা স্বচ্ছভাবেই এই যুদ্ধে সৃষ্ট মুসলিম শরণার্থীরা সেসব দেশেই আশ্রয় নেয়। যেখানকার

নাগরিকদের মনস্পটে তাদের মতো মোড়লেরা 'ওয়ার অন টেরর' নামের এক আদর্শের বীজ আগে থেকেই রোপন করে যত্ন নিয়ে বড় করে তুলছে।

শেষকথা

বিদ্যমান সমস্যায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর মধ্যে অভিন্ন কর্মকৌশল না থাকায় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর এতবড়ো শরণার্থী সংকটে ইউরোপকে অপ্রস্তুতই মনে হচ্ছে। কারণ, প্রতিটি দেশকে তাদের দেশে আসা শরণার্থীদের নিয়ন্ত্রণ ও দেখভালের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলামবিরোধী কথাবার্তা শুধু এসব দেশের ডানপন্থি, বামপন্থি ও বিরোধীরা বলে ক্ষান্ত হয়নি। বরং রক্ষণশীল খ্রিস্টান ও প্রশাসনিক ব্যক্তিরাও ইসলামের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ গোপন করতে পারেননি। তবে গুরুত্বপূর্ণ হলো রাজনীতিবিদদের ইসলামবিরোধী এ ধরনের শত্রুতা বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর কড়া প্রতিবাদের মুখে পড়তে হয়েছে। শরণার্থী সংকটের প্রেক্ষাপটে পশ্চিমা সমাজের ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডকে ইউরোপের পুরনো উত্তরাধিকার; পশ্চিমাজগত শুধু খ্রিস্টানদের জন্য বরাদ্দ। অন্য সবকিছু থেকে ইউরোপকে মুক্ত করতে হবে। পশ্চিমকে ইসলামায়ন করা যাবে না। মোটকথা, পাশ্চাত্য বিশ্বের বিভিন্ন ব্যক্তির এসব বক্তব্য তাদের নিজস্ব কোনো মতামত নয়। [৩৯]

---

[৩৯] সম্পূর্ণ লেখাটি আল জাজিরা প্রচারিত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'হেড টু হেড' সঞ্চালক মেহেদী হাসানের বক্তব্য অবলম্বেনে রচিত

ইসলামোফোবিয়ার কবলে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়

রকিব মুহাম্মদ

সভ্যতার শুরু থেকেই প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষের স্বার্থে নির্ধারণ করা কিছু তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে। যত সভ্য, উদার কিংবা আধুনিক হোক না কেন, মানুষের মধ্যে সমাজের এই শ্রেণি বিদ্বেষ যে পরম সত্য ও বাস্তব তা আমরা ইতিহাস থেকে বরাবরই শিক্ষা নিয়ে থাকি। শিক্ষার কোনো শেষ নেই, এমনটা এজন্যেই বলা হয়ে থাকে হয়তো। স্বল্প কিছু মানুষের আরওপ করা বিশ্বাসগুলো একেকটা শিল্পের মতো, যার থেকে তারা কেবল মুনাফাই শোষণ করে না, কেড়ে নিতে থাকে মানবজীবন এবং মানবতা। এরই বাস্তব উদাহারণ রোহিঙ্গা গণহত্যা।

ঘটনাপ্রবাহ হলো- একবার মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলর ও নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অং সান সু চি হাঙ্গেরি যান এবং সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবানের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকের পর হাঙ্গেরির সরকারের প্রকাশ করা এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'দুই নেতা বর্তমানে তাঁদের উভয়ের দেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ অভিবাসনের ওপর আলোকপাত করেছেন। তারা উল্লেখ করেছেন, মুসলমান অভিবাসন বৃদ্ধির কারণে তারা এই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন।'

এটা আসলেই বিস্ময়কর যে অং সান সু চি ও অরবান উভয়েই তাদের দেশে 'মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির' বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, যে সমস্যাটি তাদের দেশে আদৌ নেই। হাঙ্গেরিতে মাত্র পাঁচ হাজার মুসলমান রয়েছে, যদিও গত কয়েক বছরে যে কয়েক লাখ শরণার্থী সে দেশ অতিক্রম করে পশ্চিমে গিয়েছে, তাদের বেশির ভাগই মুসলমান। তাদের মাত্র কয়েকজন হাঙ্গেরিতে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং দেশটির সরকার তাদের গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

মিয়ানমারেও 'মুসলিম অভিবাসন বৃদ্ধির' সমস্যা নেই। প্রকৃতপক্ষে, কয়েক দশক ধরে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে হাজার হাজার মুসলমানকে বহিষ্কার করা হয়েছে, যে রাজ্যটি কিনা কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলমান সম্প্রদায়ের আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত। তবে বার্মিজ ও বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদীদের দাবি হচ্ছে, মুসলমানরা সাম্প্রতিক 'অভিবাসী'। তাদের

এই দাবি একেবারেই ভিত্তিহীন। বাস্তব কোনো ভিত্তি না থাকলেও অং সান সু চি ও ভিক্টর অরবান উভয়েই এই বলে জোর দিয়েছেন যে দেশটিতে 'মুসলিম অভিবাসনের' হুমকির সম্মুখীন।

মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকারের সমর্থক হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে প্রশংসিত অং সান সু চি মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সমর্থনে দাঁড়িয়েছেন, যারা কিনা মুসলিম রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন নির্যাতন চালিয়েছে। তারা হাজার হাজার মুসলমান নারী, পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করেছে। তাদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ও প্রাণ বাঁচাতে ২০১৬ সালে প্রায় সাত লাখ রোহিঙ্গা প্রতিবেশী বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। এদিকে মিয়ানমারে এখনো যেসব মুসলমান রয়ে গেছে, তারা সহিংসতার হুমকিতে রয়েছে এবং নানাভাবে তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। ১০ হাজারের বেশি নাগরিককে ক্যাম্পে থাকতে বাধ্য করা হয়, যেখানে আন্তর্জাতিক পরিদর্শক এবং গণমাধ্যমের প্রবেশের অনুমোদন নেই।

অং সান সু চি অবশ্য সামরিক বাহিনীর পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের খুব সামান্যই সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। ২০১৭ সালে যখন রোহিঙ্গাদের প্রতি মিয়ানমারের নৃশংস নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তখন বৌদ্ধদের আধ্যাত্মিক নেতা দালাই লামা বলেছেন, 'মনে রাখতে হবে যে এ পরিস্থিতিতেই বুদ্ধ নিশ্চয়ই সেই দরিদ্র মুসলমানদের সাহায্য করেছেন। তারপরও আমি তাদের জন্য খুব বেদনা অনুভব করছি।' এরপর রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা অব্যাহত থাকলেও দালাই লামা এই বিষয়ে আর কোনো কথা বলেননি।

মুসলিম সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমারের নির্যাতন বন্ধে কারও তেমন কোনো উদ্যোগ নেই। এদিকে সিরিয়ার সমস্যার মূল কারণ চিহ্নিত করার ব্যাপারেও কোনো উদ্যোগ নেই। আট বছর ধরে সেখানে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ চলছে। ২০১৫ সালে ইউরোপে অভিবাসী এবং শরণার্থীদের স্রোত ঠেকানোর জন্য ইউরোপীয় নেতারা তুরস্কের সঙ্গে একটি চুক্তি করে। ইইউর সদস্যপদ পাওয়ার লোভ দেখিয়ে তারা তুরস্কের ঘাড়ে ৩৫ লাখ সিরীয় শরণার্থীর বোঝা চাপিয়ে দেয়। বাইরের বিশ্ব থেকে এই শরণার্থীরা খুব কম সাহায্যই পেয়ে থাকে।

সিরিয়ার যুদ্ধে এ পর্যন্ত লাখ লাখ মানুষ নিহত ও বাস্তুচ্যুত হয়েছে। অনেকে এখনো একটু নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিচ্ছে। তাদের অনেকে গন্তব্যে পৌছানোর আগেই মারা যাচ্ছে। তবু ইউরোপীয়রা সিরিয়ার যুদ্ধ অবসানে খুব সামান্যই আগ্রহ দেখিয়েছে। তাদের উদ্বেগ কেবল মুসলিম অভিবাসন নিয়ে।

অবশ্যই মুসলমান অভিবাসন মিয়ানমার ও হাঙ্গেরির সবচেয়ে বড় সমস্যা নয়। আসল সমস্যা থেকে বিশ্বের দৃষ্টি অন্যদিকে ধাবিত করার জন্য মুসলমান অভিবাসনকে তাদের হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করছে দুটি দেশ। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, অর্থনৈতিক স্থবিরতা, লোকরঞ্জনবাদের উত্থান ও ডানপন্থীদের আন্দোলন, ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের ক্ষয়, মূলধারার রাজনীতির ব্যর্থতা ইত্যাদি তাদের দেশের আসল সমস্যা, মুসলমান বা অন্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে যার কার্যত কোনো সম্পর্ক নেই।

একটা কথা মনে রাখতে হবে, মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করলেই ইউরোপ বা এশিয়ার সমস্যার সমাধান হবে না। প্রায় ১৫০ বছর আগে কার্ল মার্ক্স একেবারে ঠিক বলেছিলেন যে ইউরোপের স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতিশ্রুতি রক্ষার বিষয়টি ইহুদিদের অন্তর্ভুক্তির ওপর নির্ভরশীল। একইভাবে আজ ইউরোপ, এশিয়া বা অন্য কোথাও, এটা মুসলমানদের সমান মানুষ এবং সহ-নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করার ওপর নির্ভর করছে।

একটু পেছনে ফিরে গেলে আমরা দেখতে পাব, এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে ইসলামোফোবিয়ার ভাষা। মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর বিকৃত তাফসির মোতাবেক, শতাধিক রোহিঙ্গা লাঠিসোটা, হাতবোমা ও আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেশ কয়েকটি পুলিশ চৌকি আক্রমণ করে। এই সংঘাতে বারোজন বর্মি নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও ডজনখানেক রোহিঙ্গা নিহত হয়। রোহিঙ্গা সরকার এই ঘটনাকে অজুহাত করে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে আরেক দফা রাষ্ট্র-পরিচালিত রোহিঙ্গা গণহত্যা শুরু করে । কোনো সংবাদ বা বিশ্লেষণী মতামতে রোহিঙ্গা প্রতিরোধ সংগ্রাম ও বর্মি সরকারের জুলুমের মাঝে কোনো প্রকার কার্যকারণ সম্পর্ক দেখালে, তা প্রকারান্তরে বর্মি কর্তৃপক্ষ সমর্থিত জাতিগত নিধনেরই সহায়ক হয়ে ওঠে।

রোহিঙ্গাদের ওপরে এই জাতিগত নিপীড়ন কয়েক দশক ধরেই চলছে। তাদের নাগরিকত্বের অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে; বিচ্ছিন্নকরণ প্রকল্পে দেশব্যাপী কয়েক ডজন গ্রামে তাদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে, ভ্রমণের ক্ষেত্রে গুরুতর বিধিনিষেধ আরওপ করা হয়েছে; ইবাদতের জায়গাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, বিয়ের ক্ষেত্রে বাধানিষেধের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার খর্ব করা হয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ , ও গণউচ্ছেদসহ বিভিন্ন নৃশংস নির্যাতনের শিকার হয়েছে তারা।

বর্মি নেত্রী, নোবেল শান্তিপদকপ্রাপ্তা এবং গণতন্ত্রের নামধারী ঠিকাদার অং সান সু চি কেবল চুপ থেকেছেন তা নয়; তিনি উৎপীড়নের সংবাদগুলোকে "ভুয়া খবর" হিসেবে উড়িয়ে দিয়ে সচেতনভাবে এই উৎপীড়নকে সমর্থন দিয়েছেন। "ভুয়া সংবাদ" পরিভাষাকে মূলত বিখ্যাত করেছিলেন ট্রাম্প। শুধু এই পরিভাষা ব্যবহারই সুচির সাথে ট্রাম্পের সাদৃশ্য বহন করে তা নয়, এখানে আদর্শিক ঘনিষ্ঠতাও বিদ্যমান।

২০১১ সালে আনার্শ ব্রাইভিক ৭০ জন নরওয়েজীয় সমাজতন্ত্রবাদীকে হত্যা করে। সে তার এই গণহত্যাকাণ্ডের ন্যায্যতা এভাবে দেখিয়েছে যে, এটা 'মার্ক্সবাদী, মাল্টিকালচারালিস্ট ও মুসলিমদের' অপবিত্র ত্রিত্বের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের একটা অংশ। ঠিক এভাবেই ব্রাইভিকের শাদা আধিপত্যবাদী চিন্তাধারা শুধু বর্ণবাদ ও সেমিটীয় বিদ্বেষবাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়নি, বরং অন্যান্য অনেক অল্ট-রাইট (অলটার্নেটিভ ডানপন্থি) গোষ্ঠীর আদলে ইসলামোফোবিয়ার মধ্য দিয়েও হয়েছে। তখন থেকেই এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, ইসলামোফোবিয়া আর চরমপন্থি ডান ঘরানায় সীমাবদ্ধ নেই; এটি এখন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে গিয়েছে।

ইসলামোফোবিয়া মুসলিম সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রতি কেবল একগুচ্ছ নেতিবাচক মনোভাবের সমষ্টি না। সুবিধা ও নিষ্ঠুরতার এই বিশ্বব্যবস্থা বিনির্মাণে ইসলামোফোবিয়া যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাতেই এর মূল গুরুত্ব নিহিত। এটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয় যে, অং সান সু চি মনে করেন রোহিঙ্গারা বহিরাগত সন্ত্রাসী। এটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয় যে, ভারতের নরেন্দ্র মোদি তৎকালীন সুচির সাথে রেঙ্গুনে মোলাকাত করেছেন যখন তার আর্মি রাখাইনে জাতিগত নিধন চালাচ্ছিল, যে রাখাইনে রোহিঙ্গারা শতকের পর শতক ধরে বাস করে আসছে। এটা কোন কাকতালীয় ব্যাপার নয় যে, হত্যা,

ধর্ষন ও নির্যাতনের সংবাদগুলোকে সুচি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছেন ভুয়া খবর হিসেবে। এই সুচি, মোদি ও ট্রাম্প - এদের সবাই কথা বলছেন ইসলামোফোবিয়ার ভাষায়।

বিশ্বব্যাপী জাতীয়তাবাদ ও জাতিরাষ্ট্র প্রকল্পের যে সংকট প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তাকে সামাল দিতে জেনোফোবিক জাতীয়তাবাদীরা ইসলামোফোবিয়ার যে ভাষা ব্যবহার করছে এটি সে-ই ভাষা। নিছক মুসলিমদের অস্তিত্বই এই দুনিয়ায় জাতীয়তাবাদী মুক্তি অর্জনের অসম্ভাব্যতার স্মারক হয়ে উঠেছে যারা কোন গোষ্ঠী বা দেশের ছোট মুঠোয় জায়গা করে নিতে পারবে না। জাতীয় মুক্তি ও পুনর্জাগরণের প্রকল্প প্রস্তাবনায় জাতীয়তাবাদী উদ্দীপণার যে ব্যর্থতা তার জন্য নিছক মুসলমানদের অস্তিত্বকেই দায়ী করা হচ্ছে। তো এই ইসলামোফোবিক দুনিয়ায় মুসলিমরা বর্বর বহিরাগত ছাড়া কি-ইবা হতে পারে, যারা সভ্যতাকে নিছক তাদের অস্তিত্ব দিয়েই হুমকি দিয়ে যাচ্ছে?

জেনফোবিক আধিপত্যবাদের শক্তিশালী হওয়াটা ক্রমাগতভাবে মুসিলম বশীভূতকরণ প্রচেষ্টার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। এই মুহূর্তে মুসলিমরা বিশ্বব্যাপী ট্রান্স-ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদ উৎরে যাওয়ার একটি সিগনিফায়ার[৪০] হিসেবে পরিণত হয়েছে। ট্রান্স-ন্যাশনালিজমের এই দাবিটা চিহ্নিত হয় (নৈতিকতার দিক থেকে) দ্বৈত আনুগত্য, পরদেশীতা, সীমানা-উত্তর সম্পর্ক ও সম্বন্ধ শীর্ষক চিহ্ন দিয়ে। সুতরাং জাতিরাষ্ট্রের অসম্ভব পূর্ণতার পথে বাধা হিসেবে, বিশ্বায়নের চিহ্নায়ক হিসেবে এবং হোমোজেনাস সমাজের আকাঙ্ক্ষিত সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে বরাবর মুসলিমরা প্রতিফলিত হচ্ছে। বিশ্বায়ন কর্তৃক সৃষ্ট অস্থিরতা ও নয়া-উদারনৈতিক যুক্তিকাঠামোর শাসনে বিশ্বব্যবস্থার কাঠামোগত যে রূপান্তর তার ওপর থেকে নজর সরিয়ে মুসলিমদের অস্তিত্বের উপর নজর আনা হচ্ছে। এই মুসলিমরা বর্তমানে সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক ডায়াসপোরা (Diaspora) কেননা তাদের কোনো জাতিরাষ্ট্র নির্দিষ্ট কোনো নৃতাত্ত্বিক বা জাতিগত পরিচয়ে ধারণ করতে পারে না। জাতির শরীরে বাসা বাধা বহিরাগত বিষাক্ত উপাদানগুলো সারানোর প্রতিষেধক হিসেবে পরিণত হয়েছে ইসলামোফোবিয়া। মুসলিমরা হচ্ছে

[৪০] ভাষাবিদ ফার্দিনান্দ দ্য স্যুসুরের ভাষ্যমতে, 'সিগনিফায়ার' যেই অর্থদ্যোকতা হাজির করে তার উপর 'সিগনিফাইড' তৈরি হয়।

নির্দিষ্ট নৃতাত্ত্বিক কাঠামোতে (Ethnos) জনগণকে (Demos) ধারণ করার চুড়ান্ত অক্ষমতার রূপক।

রাষ্ট্রনীতি আকারে ইচ্ছাকৃত নির্বিচার হত্যাকাণ্ড হিসেবে গণহত্যা ঘটে থাকে জাতি এবং ঐ সকল গোষ্ঠীর ছেদবিন্দুতে যারা জাতির সীমানা ভেঙ্গে দিয়ে সংকট তৈরি করে। ভূ-রাজনৈতিক বিভাজনের ফলে বিশ্বের সকল প্রধান ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মুসলিম সংখ্যালঘু রয়েছে যারা 'হালের নৃতাত্ত্বিক-জাতীয়তাবাদের ধারা এবং নাগরিকতা ও নৃতাত্ত্বিকতার মাঝে যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে তার সাথে জড়িয়ে পরেছে। বহুল আকাঙ্ক্ষিত নৃতাত্ত্বিকভাবে 'বিশুদ্ধ জাতিরাষ্ট্র' বাস্তবায়নের পথে তাই তাদের প্রধান বাঁধা হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

রোহিঙ্গাদের তাদের আদিবাসস্থান গ্রামগুলো থেকে বিতাড়িত করে দেয়া হচ্ছে এবং হত্যা করা হচ্ছে, কারণ তাদের বিদেশি এবং বহিরাগত হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ইসলামোফোবিক দুনিয়ায় মুসলিমরা কোথাও থাকার যোগ্য নয়। জাতিগত বিভাজনের ওপর ভিত্তি করে যে বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, বৈশ্বিকভাবে মুসলিম আইডেন্টিটির উত্থান এক্ষেত্রে সীমালংঘন হিসেবে পরিণত হয়েছে; সাংস্কৃতিক সমজাতীয়তার আন্দোলনগুলোর চোখে তারা পাপী; এনলাইটেনমেন্ট টেলিওলজির চোখেও তারা পাপী।

ইসলামোফোবিয়া শুধু মুসলিমদের প্রতি বৈরীভাব নয়, বরং এটি হচ্ছে সেই আঠা যা এমন একটি জোটকে একসাথ করে রাখছে যারা বিশ্বকে আরও প্রশস্ত একটি সহাবস্থানের জায়গা হিসেবে গড়ে উঠতে বাঁধা দিচ্ছে। রোহিঙ্গাদের উপর চালানো জাতিগতনিধন তাই নিতান্তই দূরবর্তী কোনো ছোট সংখ্যালঘু একটি গোষ্ঠীর ওপর আক্রমণ নয়। বার্মার জঙ্গলে যা-র ওপরে হামলা করা হচ্ছে, তা আরেক প্রকার নয়া দুনিয়ার সম্ভাবনার ওপরেই হামলা।[৪১]

[৪১] সম্পূর্ণ লেখাটি তুরস্কের প্রধানমন্ত্রীর মুখপাত্র ইবরাহিম কালিনের বক্তব্য অবলম্বনে রচিত

ভারতেও বাড়ছে ইসলামবিদ্বেষ

রকিব মুহাম্মদ

ভারতে ক্রমাগত মুসলিমবিদ্বেষ বাড়ছে। দেশটির মুসলিমবিদ্বেষী নাগরিকত্ব আইন ও কথিত নাগরিকপঞ্জির মতো ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে বহুদিন থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে। ভারতের মুসলিমবিদ্বেষ চর্চার একটি ঘটনা উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে। ২০২০ সালের মার্চে করোনার প্রকোপ শুরু হলে দিল্লিতে তাবলিগ জামাতের এক সমাবেশকে কেন্দ্র করে শুরু হয় তুলকালামা ঘটনা। ওই সমাবেশে যোগ দেয়া অন্তত ৩০০ জনের শরীরে করোনার সংক্রমণ পাওয়া গেছে বলে জানানো হয় সরকারি নোটিশে। আর সরকারি এমন ঘোষণার পরই দেশটিতে উদ্বেগজনক পর্যায়ে মুসলিমবিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর একটা অংশ এবং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে নানা মুসলিমবিদ্বেষী হ্যাশট্যাগ তৈরি হয়। পরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয় নানা ভুয়া খবর। করোনাজিহাদ বা নিজামুদ্দিন ইডিয়টস নামে বিভিন্ন হ্যাশট্যাগও ব্যবহার করা হয়।

দিল্লির নিজামুদ্দিনে তাবলিগ জামাতের মারকাজে যোগ দিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে যাওয়া কয়েকজনের শরীরে করোনা সংক্রমণ প্রমাণিত হওয়ার পর ভারতের গণমাধ্যমে ওই ঘটনা অতি মাত্রায় গুরুত্ব পেতে শুরু করে। ওই ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য জাফরিয়াব জিলানি সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে বলেন, 'ভুল দুই তরফেই হয়েছে। ওই সমাবেশে যারা গিয়েছিলেন, তাদের উচিত ছিল নিজের থেকেই পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া এবং চিকিৎসকদের আর সরকারের পরামর্শ নেয়া। কিন্তু উল্টো দিকে, সরকারই বা ব্যবস্থা নেয়নি কেন! সমাবেশটা তো হয়েছে যখন দেশে কোনো লকডাউন ছিল না, সেই সময়ে। তারপর যারা ফিরতে পারেনি, লকডাউনের ফলে তাদের জন্য তো সরকারের কোনও ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ছিল।' তিনি বলেন, 'এ রকম একটা কঠিন সময়ে বিষয়টাকে যেভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, সেটা একেবারেই কাম্য নয়। মুসলমানদের প্রায় সবাই কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কথা মেনে চলছে। আলেমরা নির্দেশ দিয়েছেন জমায়েত না করতে।'

এই ঘটনার পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএসের বাংলা পত্রিকা স্বস্তিকার সম্পাদক রন্তিদেব সেনগুপ্ত বিবিসি-কে বলেন, 'এটা মুসলমান বিদ্বেষ কখনোই নয়। তবে যেটা হয়েছে, সেটা তো ভয়াবহ। তাবলিগ জামাত যে ঘটনা ঘটিয়েছে, এ রকম একটা পরিস্থিতিতে বড় সমাবেশ করলেন তারা, সেখান থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লেন। এরকম একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ কী করে করলেন তারা? ধর্মান্ধতা আর পশ্চাদপদতা যে মানুষকে কোথায় টেনে নিয়ে যায়, কীভাবে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনলেন তারা, সেটাই প্রমাণ করলো তাবলিগ জামাত।'

মুসলিমবিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে কি-না, তা নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই ওই ঘটনার পর মুসলমানদের লক্ষ্য করে নানা ভুয়া খবর ছড়ানো হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে। ভুয়া খবর যাচাই করে দেখে, এমন একটি ওয়েবসাইট অল্টনিউজের সম্পাদক প্রতীক সিনহা বিবিসিকে বলেন, 'নিজামুদ্দিনের ঘটনার পর থেকে এ রকম অনেক ভিডিও আর পোস্ট ভাইরাল হয়েছে, যেগুলোর টার্গেট মুসলমানরা। আমরা একটা ভুয়া ভিডিও খুঁজে পেয়েছি, যেখানে একদল মুসলমানকে থালা-বাটি চাটতে দেখা যাচ্ছে। বলা হয়েছে, এভাবেই মুসলমানরা করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা যাচাই করে দেখি যে, ওটি আসলে মুসলমানদের একটি রীতি। খাওয়ার পরে যাতে থালায় একটিও খাদ্যকণা অবশিষ্ট না থাকে, সেজন্য তারা চেটে পরিষ্কার করে দেন।'

তিনি বলেন, 'দুই দিন আগে আরেকটি ভিডিও আসে আমাদের কাছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে একটি মসজিদের ভেতরে একদল মুসলমান কোনো একটা আওয়াজ করছেন। ভুয়া পোস্টটিতে বলা হয়, এভাবে হাঁচি দিয়ে মুসলমানরা নাকি করোনা ছড়াচ্ছে। অথচ এটি আসলে একটা সুফি আচার, যেখানে তারা শ্বাস-প্রশ্বাসের একটা অভ্যাস করেন, সেটাই তারা করছিলেন।' তার ভাষায়, 'এসব ভুয়া ভিডিওগুলো ছড়িয়ে দিয়ে ভারতে করোনা ছড়িয়ে পড়ার জন্য মুসলমানরাই দায়ী, এমন একটা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

একটু পেছনে ফিরে তাকালে আমরা দেখব, ভারতের ঐতিহাসিক বহু বিশ্বাসের চরিত্রটি (পুলারিজিম) ২০০২ সালের গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এক আঘাতের শিকার হয়। যে আঘাতে শত শত মুসলমান মারা গিয়েছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদের মোদির ব্র্যান্ড ঐক্যের পরিবর্তে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। ফলে ক্রমবর্ধমান ঘটনা যেমন সম্প্রতি 'গরু সম্পৃক্ত সহিংসতা'

ঘটেছে। প্রত্যহ মুসলিম যুবকদের ইসলামপ্রীতির কারণে জুলুম ও অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে। তেমনিভাবে কেবল মুসলিম পরিচয়ের কারণেই মুসলমানদের বিপুল হেনস্তার মোকাবেলাও করতে হচ্ছে। এখানে ইসলামোফোবিয়ার ভিত্তির ওপরই গোধরা, মিরাঠ এবং মুজাফফরনগরের মতো ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে।

২০১৫ সালের ২৫ আগস্ট ব্যাঙ্গালুরুতে শাকের নামক এক ছেলেকে সংজ্ঞায়িত করতে বজরঙ্গ দলের কর্মীরা পিলারের সাথে বেঁধে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে প্রহার করে। তার কাপড় ছিঁড়ে ন্যাকড়া বানিয়ে ফেলে। তেমনিভাবে ২০১৫ সালের মে মাসেই মুম্বাইয়ে এমবিএ গ্র্যাজুয়েট জিসানকে এক কোম্পানি এটা বলে চাকরি প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় যে, 'আমরা কেবল অমুসলিম প্রার্থীদেরই চাকরি দিয়ে থাকি!'[৪২] (আরএসএস) বজরঙ্গ দল, বিজেপি, জাফরানি আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলনের রূপকার এবং রাজনৈতিক অভিযোগসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষণের কারণে ভারতের সমগ্র মুসলিম অস্থির। জাফরানি আন্দোলন সংখ্যাগুরু হিন্দুদের বারবার শুধু একথার দিকেই তাদের নজর ঘুরিয়ে দিচ্ছে যে, 'ভারতের মুসলিমরা তাদের বংশবৃদ্ধি করে ভারতকে মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ভারত একটি মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হবে।'

এর মাধ্যমে এটাই শুধু বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, ভারতের মাটিতে সংখ্যালঘুদের কোনোরূপ বৈধ বাসনা থাকতে নেই বা তারা কোনো নৈতিক আকাঙ্ক্ষার হকদার নয়! ২০১৫ সালের ২৯ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আরএসএস-এর জাতীয় পর্যায়ের নয়াদিল্লীর বৈঠকে যে বিষয়কে কেন্দ্রীয় রূপদান করা হয়েছে; সেটা ছিল দেশটিতে মুসলিমদের সংখ্যাবৃদ্ধি। বৈঠকের শেষে করা এক শপথনামায় দুটি বিষয়কে প্রকাশ করা হয়। এরমধ্যে একটি এই– 'ভারতে হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্ম, (একটি ভারতীয় ধর্ম) অনুসারীদের বসতিতে চিন্তাধিক হ্রাস ঘটছে।' এবং সবশেষে এই সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, 'ইসলাম, মুসলমান, খ্রিস্টবাদ এইসব বহিরাগত ধর্মাদর্শ। এরা ভাতরকে মান্য করে না!'[৪৩]

---

[৪২] ইসলামোফোবিয়া : মুহাররিকাত, আছারাত আওর তাদারুক, ইরফান ওয়াহিদ, মাহনামা রফিক মানজিল, দিল্লী, অক্টোবর ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৩

[৪৩] নাজিমুদ্দীন ফারুকী, মুসলমানুঁ কি আবাদী মেঁ ইজোফে কি হাকিকত, ছেহ রোজাহ দাওয়াত, নয়াদিল্লী, ১০ অক্টোবর ২০১৫

আরএসএসের হরিয়ানা রাজ্যের প্রধান বিচারপতি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সাথে কথা বলতে গিয়ে বলেন– 'ভারতে মুসলমানরা থাকবে ঠিক; কিন্তু এখানে তাদের গরুর গোস্ত খাওয়া ছাড়তে হবে। কেননা গরু ভারতে গো-মাতা।'44 এই ঘোষণার কিছুদিন পরই মুহাম্মাদ আখলাক নামের এক ছেলেকে হিন্দুরা কেবলই এই সংবাদের ভিত্তিতে মারতে মারতে একদম মেরেই ফেলে যে, সে গরুর গোস্ত খেয়েছিল!

---

[৪৪] আসরারুল হক কাসেমী, মুসলিম দুশমনী কি আঁগ মেঁ বিজেপি, মাহনামা আবলাগ, মুম্বাই, নভেম্বর ২০১৫

ইসলামোফোবিয়া ও আরব-বিদ্বেষ: চমস্কির বয়ানে

মুহায়লিমুল হুদা

সন্দেহাতীতভাবেই ৯/১১-র ঘটনা বিশ্ব রাজনীতি, আদর্শ, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিষয়ের প্রশ্নে ধর্মকে নতুন করে অবতারণা করছে। ৯/১১-র বিপর্যয়ের পর বিশ্বজুড়ে ইসলামকে চরমপন্থা, সন্ত্রাসবাদের কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। ইউরোপিয়ান মনিটরিং সেন্টার অন রেসিজম এন্ড জেনোফোবিয়া (EUMC) একটি প্রতিবেদনে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ১৫টি দেশের সম্ভাব্য ইসলামবিদ্বেষী প্রতিক্রিয়া ফুটিয়ে তুলেছে। প্রতিবেদনে চিত্রিত হয়েছে, ইসলাম ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সাথে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীগুলো দিন দিন চরম আকারের বৈরিতা, বৈষম্য, কুসংস্কার, সহিংসতা ও আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে। ইউএমসির রিপোর্টের মূল প্রতিপাদ্য হলো : জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যলঘুদের প্রতি; বিশেষত মুসলমান ও ঝুকিপূর্ণ গোষ্ঠীর প্রতি সহিংস, আগ্রাসন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের জনগণের আচরণ পরিবর্তনমূলক কর্মকাণ্ড ; ইসলাম-বিদ্বেষী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিরূপণ।[৪৫]

আর অপরদিকে আমেরিকায় ২০০৬ সালে Today-Gallup Poll-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ইসলামী বিশ্বাস সম্পর্কে এত বেশি সন্ত্রাসবাদের কুসংস্কার ছড়ানো হয়েছে যে জরিপে দেখা গেছে, ২২ শতাংশ লোকই মুসলমানদের প্রতিবেশী

[৪৫] Christopher Allen & Jorgen S. Nielsen, 2002: 6

হিসেবে পছন্দ করে না। এবং প্রতি ১০ জনের চারজনই আমেরিকান মুসলিম নাগরিকদের ওপর কঠোর নজরদারি কামনা করে।

২২ জুন, ২০১০। নিউইয়র্ক শহরে নতুন একটি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা প্রদান করা হয়। সে মসজিদ নির্মাণ ভেস্তে দিতে *নিউইয়র্ক টাইমস* সম্পাদকীয়তে মুসলিম-বিদ্বেষী আক্রমণাত্মক কলাম ছাপে। "কারণ যেখানে মসজিদ সেখানেই মুসলমান আর যেখানেই মুসলমান, সেখানেই সমস্যা উৎপত্তির প্রবল সম্ভাবনা" এ বিবরণী সরাসরিভাবে মুসলিম-বিদ্বেষ, ইসলামোফোবিয়ার পালে হাওয়া দেয়। সম্পাদকীয়তে আরও দাবি তোলে– "নিউইয়র্কিস্তান হওয়ার পূর্বে এ মসজিদ নির্মাণ বন্ধ করার দাবি।

তারা আরও দাবি তোলে যে, লন্ডনে মুসলমান থাকতে থাকতে লন্ডনিস্তান হওয়ার উপক্রম তা লক্ষ্যণীয়। ২০১৪ সাল, ব্রিটেনজুড়ে কাউন্টার টেরোরিজম হয়ে ওঠে এক মুখ্য আলোচিত বিষয়। তারই জেরে ২০১৫ সালে নতুন করে "কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড সিকিউরিটি অ্যাক্ট' নামে আইন করা হয়। টনি ব্লেয়ার মার্কিন মুলুকের এক সময়ের প্রধানমন্ত্রী। সে তার বায়োগ্রাফিতে মুসলিম-বিরোধী অবস্থান জানান দিতে 'সন্ত্রাসী যুদ্ধ' বলে বিবরণ দেন। অপরদিকে ২০১৩ সালে Ta¼ Force on Tackling Radicalisation and Extremism-এর ভাষ্যমতে, চরমপন্থি মুসলামনদের বিবরণ এভাবে প্রদান করা হয়– 'তাদের আপসহীন বিশ্বাসের মধ্যে এটিও অন্তর্ভুক্ত যেকোনো ব্যক্তি ব্রিটিশ ও মুসলিম একই সাথে হতে পারে না। আরও জোর দিয়ে বলে যে, যারা তাদের মতের সাথে একমত নয় তারাও প্রকৃত মুসলমান নয়। অথচ যা ইসলামের রূপরেখার একেবারেই বহির্ভূত চিন্তাধারা, তার রেশ টেনে ইসলামকে ধরাশায়ী করার অপচেষ্টা।

সন্ত্রাস ও বিদ্রোহ দমনের বাহানায় ইসলামোফোবিয়ার বিস্তার

ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুসংস্কার, ভিত্তিহীন ভয়, বিদ্বেষ ও বৈরিতা আর বাস্তবিক বৈষম্যই ইসলামোফোবিয়ার মূলরূপ। এর মাধ্যমে মুসলমানদের মূলধারার রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে বিদূরিত করার মাধ্যমে তাদের মনগড়া সব বিষয়াদি বাস্তবায়নের পথ খোলাসা করে নেয়। মুসলমানদের প্রতি ইসলামোফোবিয়ার এসব রূপ নানাভাবে জাহির হতে পারে, যেমন:

১. নেতিবাচক বা পৃষ্ঠপোষকতামূলক দৃশ্যায়নের মিডিয়া প্রচারণায় ও প্রাত্যহিক আলাপচারিতায়
২. রাস্তায় আক্রমণ, অপব্যবহার এবং সহিংসতা
৩. মসজিদ ও কবরস্থানগুলোতে আক্রমণ
৪. কর্মসংস্থান বৈষম্য
৫. অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের প্রতি স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদর্শনের কার্পণ্যতা (ATCSA 2001)

অস্ট্রেলিয়ান লেখক ডেভিড ক্যালকুলেন ২০০৪ সালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলেন, বর্তমানে চলমান সংঘাত মূলত বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিরুদ্ধে এক প্রচারণা। সে আরও বলে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মূলত সন্ত্রাসনিধনের কোনো প্রচেষ্টা নয় বরং তা বিশ্বব্যাপী ইসলামপন্থি বিদ্রোহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। তার মতে, একে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ না বলে বিদ্রোহী-বিরোধী যুদ্ধ বলা বেশি যুক্তিযুক্ত। এখন কারা বিদ্রোহী সে বর্ণনা দিতে গিয়ে রান্নিমেড ট্রাস্ট ইসলামকে দেখার কয়েকটি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে যেমন-

১. ইসলামকে একরোখা ও অনাধুনিক হিসেবে দেখা হয় নাকি বিচিত্র ও গতিশীল হিসেবে দেখা হয়।
২. ইসলামকে পৃথক আর আলাদা হিসেবে দেখা হয় নাকি পরস্পর নির্ভরশীল হিসেবে দেখা হয়।
৩. ইসলামকে নিকৃষ্ট হিসেবে দেখা হয় নাকি আলাদা হলেও সমতার নজরে দেখা হয়।
৪. ইসলামকে আক্রমণাত্মক শত্রু হিসেবে দেখা হয় নাকি সহযোগী সংঙ্গী হিসেবে দেখা হয়।
৫. মুসলমানদের ধোঁকাবাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় নাকি আন্তরিক হিসেবে।
৬. মুসলমানদের পশ্চিমা সমালোচনা গৃহীত হয় নাকি বিতর্কিত হয়।
৭. মুসলমাদের প্রতি বৈষম্যের আচরণ নিন্দিত হয় নাকি নন্দিত হয়।
৮. মুসলিম-বিরোধী আলোচনা-মনোভাব স্বাভাবিক হিসেবে বিবেচিত হয় নাকি সমস্যাজনক।

দৃষ্টিভঙ্গির এই জটিলতার জন্য, বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটির ধর্ম-রাজনীতির অধ্যাপক 'জগতলিন সিজারি বলেন, ইসলামোফোবিয়া জেনোফোবিয়া,

অভিবাসনবিরোধী মনোভাব এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্রায়ণ প্রত্যাখ্যানের মতো বৈষম্যগুলোর সাথে জড়িয়ে গেছে। আর এন্টি সেমেটিজম যা মূলত এন্টি জুইস থেকে উদ্ভূত, এটা থেকে নতুন বাস্তবতার ভীতিকর পরিস্থিতির জন্য এন্টি মুসলিম নামটি তৈরি করা হয়েছে।

ইসলামের বিরুদ্ধে নেতিবাচক মনোভাব উস্কে দেয়া হয় সময়ে সময়ে, ইসলামকে মানবজাতির জন্য হুমকিস্বরূপ ও মুসলমানদের আপদ হিসেবে চিত্রিত করা হয়। এ বিষয়ে সেন্টার অব ওয়ার্ল্ড পলিটিকসের পরিচালক হাংপিং বলেন, সহিংসতাকে শিল্পায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক আকার দেয়া হয়েছে। যা আধুনিকতার দুধারী তলোয়ার (উভয় সংকট) বোঝার একমাত্র চাবিকাঠি।

৯/১১-র ঘটনার পরই ইসলাম-বিদ্বেষ সজোরে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ঐ ঘটনার ব্যাখ্যায় চমস্কি বলেন, আক্রমণটি চারটি রাজনৈতিক স্বার্থ থেকে ইন্ধন লাভ করেছে। তা হলো–

১. সৌদি অঞ্চলে মার্কিন সেনাদের সরব উপস্থিতি
২. ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘর্ষের প্রতি আমেরিকার তিক্ত নীতি
৩. ইরাকের ওপর আরওপিত ধ্বংসাত্মক চলমান নিষেধাজ্ঞা
৪. মুসলিম ও অমুসলিম বিশ্বজুড়ে দমনমূলক স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় আমেরিকার সমর্থন

সন্ত্রাসের গীতিকা : সুরক্ষা ও বিপদাশঙ্কা পরিচালনা ও বোধগম্যতার ধরন

উল্লেখ্য যে, বিট্রিশ নীতিনির্ধারণী আলোচনায় "সন্ত্রাসবাদ" শব্দটি বৈষম্য ও সিলেকটিভ পন্থায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জনসাধারণের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক সহিংসতা ছড়ানো হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'আক্রমণ ও ভীতি প্রদর্শন' ইরাকে মার্কিনিদের বোমাবর্ষণকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয় না। একইভাবে সন্ত্রাসবাদ শব্দ ব্যবহার করা হয় না। ইংলিশ ডিফেন্স লিগের মতো কেউ যখন হয়রানি ও ভয় প্রদর্শনের কাজ করে। অপরদিকে দেখা যাক ইসরাইলি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিমন পেরেজ আমেরিকার ৪০তম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড রিগ্যানের সহায়তায় তিউনেসিয়ায় হামলা চালিয়ে ৭৫ জনকে হত্যা করে অপরদিকে লেবাননের বৈরুতে হামলা করে ৮০ জনকে নিহত আর ২৫৬ জনকে আহত করে। চমস্কি বলেন, বোমাহামলায় "দগ্ধ শিশুরা তাদের বিছানায় কাতরে কাতরে মরেছে, মসজিদ থেকে বাড়ির দিকে আগত নামাজি শিশুগুলোকে হত্যা করেছে, পশ্চিম

বৈরুতের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার প্রধান সড়ক বিধ্বস্ত করে ছেড়েছে। এ সন্ত্রাস আয়োজিত হয়েছে, ব্রিটিশ গোয়েন্দা, সিআইএ এবং সৌদি ক্লায়েন্টদের যোগসাজশে। অথচ এসবকে সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যা দেয়া হয় না। সন্ত্রাসবাদ তকমাজুড়ে দেয়ার হর্তাকর্তারাই যে এর দোষে দুষ্ট। নিজেদের দোষ ঢাকার তাদের সে কী যে কোশেশ! [৮৬]

ড্যানিশ ম্যাককোয়েন, ব্রিটিশ থ্রিলার লেখক, ২০০৭-এর অক্টোবরে একটি বই প্রকাশ করে 'হাইজ্যাকিং অব ব্রিটিশ ইসলাম' নামে। সে ইসলামকে আখ্যা দেয় 'ইসলাম শুধু একটি নিরাপত্তা সমস্যার নামই নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক সমস্যারও নাম।' তারা ব্রিটেনের মুসলমানদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতালব্ধ ইসলামোফোবিয়া ও বৈষম্য শনাক্ত করার চেষ্টা করেছিল এবং পরবর্তীতে তা গুজব বা রূপকথা এবং প্রতিষ্ঠান, রাজনীতিবিদ এবং অন্যান্য সামাজিক দলগুলো প্রদত্ত মানসিক দায় বলে চালিয়ে দেয়ার পরম চেষ্টা করেছিল।

ভবিষ্যৎ ইসলামোফোবিয়া : নিরাময়ের নব প্রত্যাশা!

ডেভিড বারসামিয়ানকে দেয়া সাক্ষাতকারে চমস্কি বলেন, ভবিষ্যৎ আমেরিকা শক্তি বলে বিশ্ব শাসন করবে, তখন সে কোনো বিষয় হুমকি হয়ে ওঠার আগেই তা ধ্বংসের প্রয়াস চালাবে। তাই নতুন কোনো প্রতিকার আনতে কিছু তো করতেই হবে। নিশ্চিত করে নতুন প্রতিকার আনার সক্ষমতা তো আর সব দেশের থাকবে না... এটাই শক্তির তাৎপর্য। তারা প্রতিরোধমূলক বা আক্রমণাত্মক যুদ্ধে অবতরণ করবে। আর প্রতিরোধমূলক বা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ মানে হলো সম্পূর্ণরূপে একটি অরক্ষিত লক্ষ্য বা টার্গেট ঠিক করা, যা অতি সহজেই বৃহদাকার সেনাবাহিনী দেখে ঘাবড়ে যাবে। যাইহোক এটা নিশ্চিতরূপে ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে করতে হলে, জনগণের মনে ভয়ের সঞ্চার করতে হবে। **"ইসলামোফোবিয়াও এমন একটি প্রোপাগান্ডা যার টার্গেট একেবারে দুর্বল অসহায় ও বর্মশূন্য।"**

এটি একটি দর্শনমূলক বা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রোপাগান্ডা যা বাস্তবায়নে কোনো প্রকার সন্দেহের উদ্রেকের অবকাশ দেয়া যাবে না। ওয়াশিংটন

---

[৮৬] Chom¼y, accessed on January 15, 2016

আমেরিকানদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তনে জোর প্রচেষ্টা চালালো যে, সাদ্দাম হোসেন শুধু খারাপই ছিল তা নয় বরং সে ছিল আমেরিকান নাগরিকদের অস্তিত্বের জন্যও হুমকিস্বরূপ। এ অবান্তর প্রোপাগান্ডা শেষে আলোর মুখ বেশ ভালোভাবেই দেখেছে। আমেরিকার প্রায় অর্ধেক নাগরিক মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে ৯/১১-র ঘটনার সাথে সাদ্দাম হোসেন ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিল।[৪৭]

আরবে মুসলিমবিদ্বেষ: নোম চমস্কি

ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে, অর্থাৎ যখন আমরা শিশু অবস্থায় বাড়ন্ত ছিলাম আমরা ছিলাম ইহুদি। সে সময়টাতে ইহুদি-বিরোধিতা ছিল খুবই স্বাভাবিক দৃশ্যমান বিষয়। আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, শহরের আইরিশ ও জার্মান ক্যাথলিকদের মাঝে মধ্যবিত্ত এরিয়ার একমাত্র ইহুদি পরিবার হিসেবে আমরা বেড়ে উঠেছি যার সিংহভাগই খোলাখুলি ভাবে নাৎসিপন্থী ছিল। আমি বড় হয়েছি ক্যাথলিকদের ভয়ে ভিতওে ভিতওে আড়ষ্ট হয়ে। যুবক বয়স পর্যন্ত কোন প্রকারেই আমি ক্যাথলিকদের সাথে যে কোন বিষয়ে ভয়-ভীতি মুক্ত হয়ে করতে পারতাম না। যা ছিল নিতান্ত যন্ত্রনাদায়ক। যখন ক্যাথলিকরা জেস্যুট স্কুল ধারণা নিয়ে আসে (ক্যাথলিক পুরোহিতের আদেশ প্রাপ্ত সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত স্কুল। তাদের আচরণ আরো নিষ্ঠুরতায় ভরে গেল। অধিকন্তু আমার পিতা যখন পুরোনো একটি গাড়ি ক্রয়ে সমর্থ হলো, যাতে আমরা কোন মতে দিন গুজরান করতে পারি (গাঁ বাচিয়ে)। যদি তা নিয়ে আমরা কোন পাহাড়ের পাদদেশেও পৌছতাম সেখানে গাড়ি পার্ক করতে গেলেও বেশ বেগ পেতে হতো কারণ অধিকাংশ মোটেলে (আবাসিক হোটেল যা ব্যাক্তিগত যানবাহন নিয়ে ভ্রমণকারীদের পার্কিং সুবিধার জন্য বিশেষায়িত) ইহুদিদের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ছিল। ১৯৫০ এর দিকে যখন আমি হার্ভাডে ভর্তি হই, সেখানে ইহুদিবিদ্বেষ এতটা প্রকট ছিল যে পান থেকে চুন খসলেই ইহুদী কাউকে নিধন করা যেন নিমেষের ব্যাপার। প্রথম ধাপের বিশ্ববিদ্যলয়ের পরিচয় নিয়েও সেখানে পল সামুয়েলসন ও রবার্ট উইনারের মতন বহু প্রথম গ্রেডের মানুষজন ইহুদি ধর্মালম্বী হওয়ার কারণে চাকরি জুটাতে পারেনি। হার্ভাডকে প্রথম ইহুদি গণিতবিদ নিয়োগ দিতে হয়েছিল তার পান্ডিত্যের প্রমাণ স্বরূপ। ১৯৫৩ সাল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত; বিভাগটি ইহুদি বিদ্বেষে পূর্ণ

---

[৪৭] Noam Chom¼y, 2005:3

ছিল। আমি বুঝাতে চাচ্ছি, পরিস্থিতির সার্বিক পরিবর্তন ৫০ এর দশকেই হয়েছে অথচ তখনো পর্যন্ত ইহুদি বিদ্বেষ ছিল দিনের আলোর মতন জাজ্বোল্যমান আর বাস্তবমুখর। ইহুদি জাতি যদিও যথেষ্ট পদদলিত হয়েছিল, তারা তা লুকিয়েই রাখত দৃশ্যমান করত না কারণ তাদের মাথার উপর ঝুলত খড়ার ঘা/ বিপদ যেন লেগেই থাকত। এ কারণেই হলোকাস্ট (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সরকারের সহায়তায় নাৎসি বাহিনী কর্তৃক ৬০ লাখের বেশি ইহুদি নিধনকে হলোকাস্ট নামে আখ্যা দেয়া হয়।- ব্রিটানিকা সহ্য করলেও ইহুদি শরণার্থীরা কোথাও যেত না। (কারণ তাদের জানা ছিল নতুন জায়গা মানেই নতুন কোন বিপদ।)

ইউরোপের প্রায় সকলে, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর 'ডিসপ্লেস পারসনস ক্যাম্প' বা ডিপি ক্যাম্পে আবদ্ধ মানুষগুলো যুক্তরাষ্ট্রে জায়গা করে নিয়ে স্বস্তির নিশ্বাশ নিতে পারত কিন্তু তারা পারে নাই। ডিপি ক্যাম্পে মরনাপন্ন মানুষগুলো জার্মানরা পরাজিত হওয়ার পরও সেখানে আটকা পড়েছিল। এটা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যকর ছিল না, বরং পরিবর্তনের মধ্যে এটাই ছিল যে সেখানটা সাক্ষাত এক শ্মশানে পরিণত হয়েছিল (মানুষগুলো ক্ষয় হতে হতে)। তাদের হাতে গোনা অল্প কজনই প্রাণ নিয়ে ফিরে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরতে পেরেছে। কিছুটা ইহুদি বিদ্বেষ ও কিছুটা ইহুদিরা তাদের তাদের ফিরিয়ে আনতে না চাওয়ায় তাদেরকে সেখান থেকে উত্তরণের কোন কোশেশ করা হয়নি, কারণ ইহুদিরা ইতিমধ্যেই সমস্যায় জর্জরিত, ডিপি ক্যাম্পের ইহুদি এনে সমস্যা তারা ফুসলিয়ে দেয়ার পক্ষে ছিল না।

ইহুদি বিদ্বেষ জাতিগত/বর্ণবৈষম্যের কোন আইনসম্মত ধরণ নয়, অথচ পক্ষপাতমূলক ভাবে আরব বিদ্বেষকে বর্ণবৈষম্যের বৈধ রূপ বা ধরণ বলে গণ্য করা হয়। অর্থায় বর্ণবাদের অধিকাংশ ধরণেই লুকোচুরির প্রয়োজন পড়ে না, তারা বর্ণবাদ না হওয়ার ভান করে থাকে শুধু (কাকের খাবার লুকানোর মত)। অন্যন্যা বর্ণবৈষম্যের ক্ষেত্রে হয়ত একজনকে ইহুদি বিরোধী বা কৃষ্ণাজ্ঞ বিরোধী না হওয়ার ছদ্মবেশে থাকে, প্রকৃত অবস্থার আত্মপ্রকাশ করে না। অথচ আরব বিদ্বেষের ক্ষেত্রে সে ভানটাও করার প্রয়োজন পড়ে না, বরং তারা তা কথায় কাজে বেশ প্রকট ভাবে ফুটিয়ে তোলে ও প্রকাশ করে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এর আগেও এ আরব বিদ্বেষ মানুষেরা বিভিন্ন মুভি, বই-পত্রপত্রিকা এবং আচার-আচরণে প্রত্যক্ষ করেছে, এসব গোপনেও করা হয় নাই। অর্থাৎ কেউই তো এসে বলবে না যে আমি আমি বর্ণবাদী-আরব বিদ্বেষী; সর্বত্র মুসলিম ও আববের

নিকটই এটা ওপেন সিক্রেট।আর এখন ১১ সেপ্টেম্বরের পর এমন আচরণ প্রদর্শণ তো তুঙ্গে উঠারই কথা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাক বোস্টনের কথা। বোস্টনে বড় মাপের লেবানিজ সম্প্রদায় ছিল, তারা তেমন সম্পদশালী না হলেও ব্যাবসায়ী ও দোকানদারদের মাধ্যমে তারা বেশ স্বচ্ছল ছিল।

সাল ১৯৮২। ইসরায়েলিরা লেবানিজদের উপর ভয়াবহ নৃশংস আগ্রাসন চালায়। লেবাননের হতাহত মানুষগুলো জন্য আমাদের অল্প কিছু লোক দাতব্য ত্রাণ সংগ্রহের আয়োজনে লিপ্ত হয়। সেখানকার লেবানিজ সম্প্রদায় থেকে আমরা কোন প্রকার সাপোর্ট পাইনি। অবশ্য তার কারণও আমি বুঝতে পারি। সেই ছোট্ট কাল থেকে এসব দেখে দেখে আমি মানুষ হয়েছি। তারা বেশি একটা প্রকাশিত হতে চায় না, এবং এর কারণটাও বেশ স্পষ্ট। আমি এটা প্রমাণ করতে না পারলেও যে দৃশ্যটা আমার চেখে ভাসে তা শুধু ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকেই না। তবে ১১ সেপ্টেম্বরের পর তার উত্তাপ কিছুটা বেড়েছে তা ঠিক। শুধু আরবরাই না এর অন্ধকারাচ্ছন্নতা সকলেরই গোচরীভূত হওয়ার কথা।

ভাষান্তর : হাবিবুর রহমান রাকিব

ফেসবুকে ইসলামোফোবিয়া বাড়ছে বিদ্বেষের সংস্কৃতি

রাকিবুল হাসান

বর্তমানে সবচে বেশি ব্যবহৃত সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম ফেসবুক। এপ্রিল, ২০২০-এর হিসাব অনুযায়ী মাসে ২.৬ বিলিয়ন মানুষ লগইন করছে এই প্লাটফর্মে। এভারেজ দৈনিক লগইন করছে ১.৭৩ বিলিয়ন মানুষ। ফেসবুক ব্যবহারকারী বিশাল এই জনগোষ্ঠীর সবাই কিন্তু কল্যাণ এবং ভালোবাসা ছড়াতে প্লাটফর্মটি ব্যবহার করছে না। বরং অনেকেই এটি ব্যবহার করছে বর্ণবাদ, ইসলামোফোবিয়া, ভায়োলেন্স এবং জাতিগত ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াতে। পোস্টে, কমেন্টে, মেসেজে, ছবিতে, মিমসে, ভিডিওতে তারা জাতিগত ঘৃণা উসকে দিচ্ছে। ইসলামোফোবিয়ার বিস্তার ঘটাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ইসলামোফোবিয়া ইন্ডাস্ট্রি। এখানে বিনিয়োগ হচ্ছে বিলিয়ন-মিলিয়ন ডলার। ফেসবুকে কীভাবে ইসলামোফোবিয়া ছড়াচ্ছে তার একটা চিত্র তুলে ধরা হবে এই লেখায়। পাশাপাশি এর কারণ, কার্যকরণ নিয়েও আলোচনা করা হবে।

ডা. ইমরান আওয়ানের রিসার্স

বার্মিংহাম সিটি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এবং ইসলামোফোবিয়া ও সাইবার বিদ্বেষ বিশেষজ্ঞ ডা. ইমরান আওয়ান ফেসবুকে ইসলামোফোবিয়া বিষয়ে একটি রিসার্স করেছিলেন। তিনি ১০০টি ফেসবুক পেজের পোস্ট, কমেন্ট পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এই ১০০টি পেইজে তিনি অন্তত ৪৯৪টি পোস্ট পেয়েছিলেন, যে পোস্টগুলো সরাসরি মুসলিমদের বিরুদ্ধে করা হয়েছে। ইসলামোফোবিয়া ছড়ানো হয়েছে। শুধু বিরুদ্ধ মতামত নয়, বরং অনেক পোস্টে মুসলিমদের শারীরিক আঘাতের হুমকিও দেয়া হয়েছে। এ সমস্ত পোস্টে মোট পাঁচটি বিষয়কে হাইলাইট করা হয়েছে।

১. মুসলিমদের সন্ত্রাসী হিসেবে দেখানো হয়েছে। এখানে ভায়োলেন্ট এবং নন-ভায়োলেন্ট মুসলিমের কোনো পার্থক্য করা হয়নি। বরং ঢালাওভাবে তাদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

২. মুসলিমদের ধর্ষক এবং সিরিয়াল রেপিস্ট হিসেবে দেখানো হয়েছে।

৩. মুসলিম মহিলাদেরকে সুরক্ষার হুমকি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে, বোরকা, হিজাব এবং পর্দা সুরক্ষার জন্য হুমকি।

৪. বুঝানো হয়েছে মুসলিম এবং আমাদের মাঝে যুদ্ধ চলে আসছে। তারা আমাদের শত্রু। আমাদের ভূমি দখলকারী।

৫. এখানে মুসলিমদের নির্বাসিত করার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি হালাল ফুড নিষিদ্ধকরণ, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ নির্বিশেষে মুসলিমদের ওপর বাজে মন্তব্য করা হয়েছে।

ডা. ইমরান আওয়ান তার রিসার্চে মোট পাঁচটি টেবিল তৈরি করেছিলেন। ৩ নং টেবিলে দেখা যায়, সোশ্যাল মিডিয়ায় ইসলামোফোবিয়া ছড়ানোর ক্ষেত্রে নারীদের তুলনায় এগিয়ে পুরুষরা। পুরুষ ৮০ শতাংশ এবং নারী ২০ শতাংশ। ৪ নং টেবিলে দেখা যায়, ফেসবুকে ইসলামোফোবিয়া ছড়ানোয় প্রথমে রয়েছে যুক্তরাজ্য (৪৩ শতাংশ)। তারপর আমেরিকা (৩৭ শতাংশ)। তারপর অস্ট্রেলিয়া (২০ শতাংশ)।

১ নং টেবিলে ডা. আওয়ান ২০টি শব্দ উল্লেখ করেছেন। এই শব্দগুলো মুসলিমদের চিত্রিত করতে ইসলামোফোবিক গোষ্ঠী ব্যবহার করে। তারমধ্যে অন্যতম হলো- মুসলিম, ইসলামিক, পাকি, গ্যাং, রেপিস্ট, এশিয়ান, ডার্টি, মসজিদ, বোমা, চরমপন্থি, হালাল, সন্ত্রাসী, কিলিং ইত্যাদি।

ডা. ইমরান আওয়ান বিভিন্ন পেজের ইসলামোফোবিক মিমস দিয়েও উদাহরণ দিয়েছেন। একটি মিমসের টেক্সট ছিল'বয়কট হালাল ফুড; যদি আপনি হালাল ফুড ক্রয় করেন, ধরা হবে আপনি ইসলামিক জিহাদকে সমর্থন করছেন।' একটা মসলার প্যাকেটে পাগড়ি পরা একজনের ছবি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে আরেকটি মিমস। তার টেক্সট 'মিস্টার পাকি।' 'ব্যান ইসলাম ইন অস্ট্রেলিয়া' ফেসবুক পেইজের একটি মিমসের নিচে কমেন্ট ছিল' ইসলাম ইবোলা ভাইরাসের মতো।' 'ইসলাম ক্যান্সারের মতো।' 'ইংলিশ ব্রাদারহুড' ফেসবুক পেইজে একটি মিমস শেয়ার করা হয়েছে। ছবিতে দুটি কুরআন। একটির নিচে লেখা ইসলামিক কুরআন। আরেকটির নিচে লেখা আইএসআইএস কুরআন।

ফ্যাক্ট চেকিং সার্ভিস স্নোপেস ফেসবুকে ইসলামোফোবিয়া নিয়ে একটি তদন্ত করেছিল। তদন্তে আমেরিকার ২৪টি ফেসবুক পেজের সন্ধান পেয়েছে তারা। খ্রিস্টানদের ছোট একটি দল এই পেইজগুলোর মাধ্যমে মুসলিমবিরোধী ঘৃণা

ছড়ায়। এই পেইজগুলোর পেছনে অর্থায়ন করে 'দ্য আমেরিকা কনজার্ভেন্সি' এর প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট, খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক কেলি মনরো কুলবার্গ। এই পেইজগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো Women for trump, Christians for trump, Evangelical for trump।

ফেসবুক ইন্ডিয়া : ইসলামোফোবিয়া

একটি মানবাধিকার ও প্রযুক্তি গবেষণা সংস্থা ইন্ডিয়ান ইউজারদের বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বিশ্লেষণ করেছিল। তাতে দেখা গেছে ভারতের ফেসবুকে বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের ৩৭ শতাংশই ইসলামোফোবিয়ার সঙ্গে যুক্ত। এরমধ্যে ১৬ শতাংশ ভুয়া খবর, ১৩ শতাংশ হিংসাত্মক বক্তব্য। দীর্ঘ চারমাস ভারতের ছয়টি ভাষার হাজারের অধিক পোস্ট বিশ্লেষণ করে তারা এই তথ্য প্রদান করে।

'ফেসবুক ইন্ডিয়া: টুওয়ার্ডস দ্য টিপিং পয়েন্ট অফ ভায়োলেন্স ক্যাস্ট অ্যান্ড রিলিজিয়াল হেট স্পিচ' শীর্ষক মার্কিন-ভিত্তিক ইক্যুয়ালিটি ল্যাবসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসলামোফোবিয়ার বাইরে অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা ছড়ানোর হার মাত্র ৯ শতাংশ। যেখানে ইসলামোফোবিয়ার হার ৩৭ শতাংশ।

২০২০ সালে দিল্লিতে তাবলিগ জামাতের নিজামুদ্দিন মারকাজে তাবলিগের সমাবেশকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইসলামফোবিক পোস্ট এবং কমেন্টের হার বেড়ে গিয়েছিল। করোনার শুরুতে সমাবেশ আয়োজন করেছিল নিজামুদ্দিন মারকাজ। সমাবেশে অংশ নেয়া অনেকের পরবর্তীতে করোনা পজেটিভ আসে। এরপর থেকেই শুরু হয় মুসলিমবিদ্বেষী প্রচারণা। তৈরি হয় #করোনাজিহাদ এবং #নিজামুদ্দিনইডিয়টস। বিদ্বেষী প্রচারণার স্রোতে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন ভুয়া খবর।

ভুয়া খবর যাচাই করে দেখে এমন একটি ওয়েবসাইট 'অল্ট নিউজ'। অল্ট নিউজের সম্পাদক প্রতীক সিনহা বিবিসি বাংলাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'তারা দুটি ভুয়া খবর যাচাই করে দেখেছে। ১. একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মুসলিমরা প্লেট চেটে খাচ্ছে। ভিডিওটি শেয়ার করে কেউ কেউ লিখেছেন এভাবেই মুসলিমরা করোনা ছড়াচ্ছে। অথচ এটি বোহরা মুসলিমদের একটি খাবার রীতি। খাবার পর প্লেটে যেন অবশিষ্ট কিছু না থাকে, তাই তারা চেটে খায়। ২. একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মুসলিমরা মুখ দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ করছে। ভিডিও শেয়ার করে লেখা হয়, 'হাঁচি দিয়ে

মুসলিমরা করোনা ছড়াচ্ছে।' অথচ তারা হাঁচি নয়, বরং জিকির করছিল। নিজামুদ্দিনে তাবলিগের সমাবেশের পরই মূলত এসব ভুয়া খবর ছড়াতে থাকে।'

ফেসবুক বাংলাদেশ : ইসলামফোবিয়ার চিত্র

বাংলাদেশে ইসলামোফোবিয়া ছড়ানোর সবচে সুলভ মাধ্যম এখন ফেসবুক। পোস্ট, কমেন্ট, মেসেজ, মিমস, ভিডিওর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ছড়ানো হচ্ছে জাতিগত ঘৃণা, বিদ্বেষ, ইসলামোফোবিয়া। প্রযুক্তির কল্যাণে এই ঘৃণা-সংস্কৃতি ছড়ানোর পেছনে অমুসলিমরা যেমন কাজ করছে, তেমনি দুঃখজনক হলেও সত্যি, নামধারী কিছু মুসলমানও শামিল হয়েছে এই মিছিলে। বাংলাদোশের ইসলামোফোবিকরা কমন কিছু বিষয় নিয়ে সবসময় হৈচৈ করে। নিম্নে কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো।

এক. হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ফেসবুকে প্রায়শই আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করা হয়। অনেকক্ষেত্রে পাড়ার ছেলেটাও কটূক্তি করতে কসুর করে না। ২০১৯ সালের অক্টোবরে ভোলায় বিপ্লব চন্দ্র বৈদ্য নামে এক হিন্দু ছেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করে লেখা মেসেজ মেসেঞ্জারে ছড়িয়ে দেয়। প্রতিবাদে জেগে ওঠে তৌহিদি জনতা। ভোলার বুরহানুদ্দিনে প্রতিবাদ সমাবেশে পুলিশ গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হয় ৪ মুসলিম।

প্রথমে একে ফেইক বলা হলেও এখনো পর্যন্ত এটি প্রমাণ করা যায়নি। ধর্ম অবমাননার দায়ে অনেকে গ্রেফতার হয়, অনেকে হয় না। তবে এই গ্রেফতার করা নিয়েও সুশীলদের চুলকানি হয়। একজন তো বলেই ফেলেছে, 'পশ্চিম পাকিস্তানে এমন হতো। এখন পূর্বপাকিস্তানেও ঘন ঘন হচ্ছে।' বাংলাদেশে ফেসবুকে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তি করার ঘটনা ভুরি ভুরি। অনেক উদাহরণ দেয়া যাবে।

দুই. ইসলামি ব্যক্তিত্বদের আক্রমণ

বিভিন্ন মিমসে ইসলামি ব্যক্তিত্বদের নিয়ে মিথ্যাচার করা হয়। কটূক্তি করা হয়। হেয় করা হয়। ২০১৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর 'থাবা বাবা রিলোডেড' পেইজে আল্লামা আহমদ শফিকে রাজাকার বলে ট্যাগ দেয়া হয়।

'চক্রধার চৌধুরী' নামের আইডি থেকে হজরত মাওলানা মিজানুর রহমান আজহারীর মাহফিলের পোস্টার শেয়ার করে হুরদের নিয়ে টিপ্পনি কাটা হয়।

'প্রান্ত দে' আইডি থেকে শেয়ার করা একটি মিমসে হুজুর এবং কুরআন নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়।

'ডাকসু মিমস' পেইজে মুফতি কাজি ইবরাহিমকে উগ্রবাদী ট্যাগ দিয়ে এবং কোটা আন্দোলনের রাশেদ খানকে সীমিত পরিসরে উগ্রবাদী মুফতি ইবরাহীম ট্যাগ দিয়ে একটি মিমস শেয়ার করে।

'ক্বারী সাহেব ৪.০' পেইজে সদ্যপ্রয়াত মাওলানা যুবায়ের আহমাদ আনসারীকে নিয়েও মিমস শেয়ার করা হয়। অপারেশনের কারণে তার মুখে তৈরী বক্রতাকে তুলনা করা হয় মালালা ইউসুফ জাইয়ের মুখ ভেঙচির সাথে। পাশাপাশি এখানেও অশ্লীল ইঙ্গিত দেওয়া হয়।

'বাংলা মিমস' পেইজে ব্যঙ্গ করা হয় মাওলানা যুবায়ের আহমাদ আনসারীর জানাযায় অংশ নেয়া মুসল্লিদেরও। মিমসের টেক্সটে বলা হয়, 'লকডাউনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জানাযায় অংশ নিয়ে মানুষ এগুলো পেতে পারে?'

তিন. মুসলিমদের সন্ত্রাসী ট্যাগ

'ক্বারী সাহেব ৪.০' পেইজে একটি মিমস শেয়ার করা হয়েছে। তাতে প্রবলেম হিসেবে দেখানো হয়েছে পাঁচটি জিনিস। নাস্তিক, মুক্তমানা, বিজ্ঞান, সমকামী, লিঙ্গসমতায় বিশ্বাসী। সমস্যার সমাধান হিসেবে দেখানো হয়েছে একটি ছবি। মেয়েটির মাথায় টুপি, হাতে দেশীয় অস্ত্র, মুখে রক্ত।

'বাংলা মিমস' পেইজে ইদুল ফিতরের দিন (২৫ মে ২০২০) একটি মিমস শেয়ার করা হয়েছে। সেখানেও কৌশলে মুসলিমদের সন্ত্রাসী বলা হয়েছে।

'কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বাংলাদেশ' পেইজে ভারতভাগের জন্য মুসলিমদের দায়ী করেছে। বলেছে, মুসলিমরা দেশভক্ত হলে পাকিস্তান হতো না, বাংলাদেশ হতো না। শুধু মুসলিম নয়, প্রাকারান্তরে এখানে বাংলাদেশের জন্মকেই অপরাধ হিসেবে দেখা হয়েছে।

চার. ইসলামের বিভিন্ন বিধান, জায়গা নিয়ে ঠাট্টা

'ডাকসু মিমস' পেইজ থেকে 'ক্যাম্পাসে মেট্রোর স্টেশন চাই না' আন্দোলন নিয়ে একটা মিম শেয়ার করা হয়েছিল। সেখানে ইসলামের বিখ্যাত 'মুতার

যুদ্ধ' নিয়া ফান করা হয়েছে। মূলত মুতার যুদ্ধের সাথে টিএসসিতে স্টেশনের কোন সম্পর্ক নেই। 'মুতা' নামটাকে ফানি সেন্সে ব্যবহার করতে, সাথে মুসলিমদের চটাতে এই কনটেক্সটা ব্যবহার করা হয়েছে। আরেক কারণ হলো টিএসসিতে মেট্রোর স্টেশন হলে বাইরে থেকে লোকজন এসে পেশাব করে বা মুতে পুরা টিএসসি ভাসিয়ে ফেলবে। তাই এটাকে 'মুতার যুদ্ধ' ট্যাগ দিয়ে ইসলামের যুদ্ধের জায়গার সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে। এটা ইসলামের প্রতি বিরুপ একটা মিম।

'সুষুপ্ত পাঠক ' আইডি থেকে একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, রমজানে উন্মুক্তভাবে খাবার বিক্রি করায় খাবার ভ্যানওয়ালাকে পুলিশ শাসাচ্ছেন। সুসপ্ত পাঠক তাকে 'শরিয়াহ পুলিশ' বলে ঠাট্টা করেছেন।

'ক্বারী সাহেব ৪.০' পেইজে হজ এবং ইজতেমা নিয়েও বিদ্রুপ করা হয়েছে। দুটোকেই দেখা হয়েছে বিজনেস পলিসি হিসেবে।

করোনাকে মুসলমানরা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বান্দার পাপের শাস্তি হিসেবেই দেখছেন। কারোনাকে কেন আল্লাহ তায়ালার শাস্তি হিসেবে দেখা হবে এটা নিয়ে রীতিমতো গালি গালাজ করেছেন নির্বাসিত লেখিকা তাসলিমা নাসরীন।

২০২০ এর বইমেলায় সোহরাওয়ার্দী প্রাঙ্গনে বিশাল জামাত নিয়ে নামাজ আদায় করেছিল মাদরাসা ছাত্র এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা। এই নিয়েও শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।

স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় মুসলিম বিদ্বেষ

ফেসবুকে বিভিন্ন উপলক্ষে শর্ট ফিল্ম প্রতিযোগিতা ঘোষণা করা হয়।। ২০২০ সালেও 'সবাই ভিন্ন একসাথে অনন্য' শিরোনামে এই প্রতিযোগিতার আহ্বান করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতায় মূলত গল্প আহ্বান করা হয়। বাছাইকৃত গল্প দিয়ে তৈরী হয় শর্ট ফিল্ম। সম্প্রীতির নামে এসব প্রতিযেগিতায় ছড়ানো হয় জাতিগত বিদ্বেষ। ইসলামোফোবিয়া।

২০২০ সালের একটি শর্টফিল্ম 'নিঃশব্দ'। এতে দেখানো হয় হিন্দু ছেলের ফেসবুক আইডি থেকে মুসলিম বিদ্বেষী পোস্ট দেয়ার কারণে তাকে মারধর করা হয়। ছেলেটা মারাও যায়। কিন্তু গল্পে এটাও দেখানো হয়, মূলত হিন্দু ছেলের আইডি হ্যাক করেছে মুসলিম ছেলে। মুসলিম ছেলেই মূলত মুসলিম

বিদ্বেষী পোস্ট দিয়েছে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেবার জন্য। গল্পে ক্রিমিনাল বানানো হয় মুসলিমদেরকেই। হিন্দুদেরকে বানানো হয় নিষ্পাপ। যেন সবকিছুর জন্য দায়ী মুসলিমরা।

প্রতিযোগিতার আরেকটি শর্টফিল্ম 'পর্দা'। এতে দেখানো হয় মুসলিম ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসে ঢাকায়। ঢাকায় তার পরিচিত কেউ নেই। গ্রামের ইমামের সূত্র ধরে এক মাদরাসায় রাত কাটাতে চেয়েছিল। কিন্তু মাদরাসা কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার অজুহাতে ছেলেটিকে রাতা কাটানোর জায়গা দেয়নি। গেট থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। পরে হিন্দু ছেলে তাকে জায়গা দেয়। নিরাপত্তার ধার ধারে না সে। গল্পে মূলত মাদরাসার সংকীর্ণ, অসামাজিক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। আর মুসলিমরা কেবল সম্প্রীতির পথে বাধাই সৃষ্টি করে।

২০১৮ সালে আরেকটি ভিডিও ক্যাম্পেইন করা হয়েছিল। ওখানেও মূলত গল্প আহ্বান করা হয়েছিল। গল্পে নির্মিত হয়েছিল শর্টফিল্ম। এরমধ্যে একটি শর্টফিল্মের নাম 'আব্দুল্লাহ'। এখানে মূলত সরাসরি মাদরাসা শিক্ষার প্রতিই অনাস্থা প্রকাশ করা হয়েছে। মাদরাসায় ছাত্রদের ছোট ছোট বিষয়ে বেত্রাঘাত করা হয়। মাদরাসা শিক্ষিতরা মাদরাসার বাইরে কেনো কাজ করতে পারে না, বাইরে কাজ করতে গেলেও তাদের কনফিডেন্স থাকে না, মাথা নুইয়ে মিনমিন করে চলতে হয় এইসব।

আব্দুল্লাহ ছিল মূল চরিত্র। এই চরিত্রে যে অভিনয় করেছে, তাকে ইনবক্সে জিজ্ঞেস করেছিলাম কওমির ছাত্ররা আসলেই তো এত কনফিডেন্সহীন না যে, অফিসের সামান্য কেরানির দায়িত্বও পালন করতে পারবে না। সবজায়গায় উপেক্ষিত। আসলে এই চিত্রায়নটা কেন? অভিনেতার সরল উত্তর ছিল স্ক্রিপ্টের বাইরে কিছু করার সাধ্য আমার ছিল না!

উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

আসলে পুরো ফেসবুক জুড়েই এখন মুসলিমবিরোধী সর্বগ্রাসী প্রচারণা চলছে। আরব নিউজ একবার তাদের প্রতিবেদনের শিরোনাম করেছিল ফেসবুকের এলগরিদম এন্টি মুসলিম এলগরিদম। মুসলিমদের বিরুদ্ধে যতই ঘৃণা ছড়ানো হোক, ফেসবুক পোস্টগুলো রিমুভ করে না। দক্ষিণ এশিয়ার আমেরিকান মানবাধিকার এবং প্রযুক্তি গবেষণা সংস্থা তাদের তদন্তে বলেছিল ভারতের ফেসবুকে যেসব মুসলিম বিদ্বেষমূলক পোস্টে রিপোর্ট করা হয়েছে, তার ৯৩

শতাংশই ফেসবুক কর্তৃপক্ষ রিমুভ করেনি। জাতিসংঘের তদন্তকারী ইয়াঙ্গি লি বলেছেন, 'ফেসবুক এখন সংঘাতকে উদ্বুদ্ধ করার বাহন হিসেবে দাঁড়িয়েছে। মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যার পেছনের চালিকাশক্তি ছিল ফেসবুক এবং এর বিদ্বেষমূলক প্রচারণা।'

বিশেষজ্ঞ এবং গবেষকগণ বলছেন, ফেসবুকের শক্ত নীতি এবং নৈতিকতা দরকার। নয়ত আগামী পৃথিবী আরও অস্থিতিশীল করে তুলবে ফেসবুক। প্রতিদিন নতুন নতুন মানুষ যুক্ত হচ্ছে। প্লাটফর্ম বড় এবং বিস্তৃত হচ্ছে। সবার ক্ষেত্রে সমান দৃষ্টি বজায় না রাখলে, ফেসবুকের পোস্ট এবং মন্তব্য ঘিরেই তৈরী হবে সংঘাত, সংঘর্ষ। এভাবেই বাড়বে বিদ্বেষের সংস্কৃতি।[৪৮]

---

[৪৮] সূত্র :মিডলইস্ট আই, ২৯ জুলাই, ২০১৬, আরব নিউজ, ২১ জুন, ২০১৯, ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস, ১১ জুন, ২০১৯, দ্য গার্ডিয়ান, ৮ ডিসেম্বর ২০১৯, Islamphobia on Social Media: A Qualitative Analysis of the Facebook

ইসলামোফোবিয়া ও মানবাধিকার

রকিব মুহাম্মদ

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার দাউদ দাইন ইসলামোফোবিয়াকে ইউরোপের সবচে ভয়াবহ বর্ণবাদ বলে জানিয়েছেন। ইউরোপের অনেক মানবাধিকার সংগঠন আজও ইসলামোফোবিয়ার ভয়াবহতাকে এতটা ফোকাস করতে পারেনি। সাধারণভাবে গোটা ইউরোপ বিশেষত ফ্রান্সের গোঁড়া ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা কিছু লবির চাপে কথিত বৈশ্বিক মূল্যবোধ পালনে বিভিন্ন সংগঠন ও রাষ্ট্রকে চাপ দেয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন। এমনিতে ইউরোপে ইসলামোফোবিয়ার স্রোত ভয়াবহ। এ ছাড়াও বৈশ্বিক পর্যায়ে কথিত এই মূল্যবোধের অধিক চর্চার দাবি ব্যাপক ভীতি ছড়িয়ে দিয়েছে।

বর্তমান সময়ে ইসলামবিদ্বেষের শেকড় পর্যালোচনায় একজন গবেষক একাধিক কর্মপন্থা অবলম্বন করতে পারেন। ইউরোপের বুদ্ধিজিবীরা কিছু অলজ্ঞনীয় নীতিবাক্য ও ধ্রুবক তৈরি করেছে। এসব ধ্রুবক ইউরোপীয় সভ্যতার অংশ। তাদের জনমানুষের মনমগজ এসব চিন্তা লালন করে। এই স্বীকৃত ধ্রুবক তাদের নিকট ধর্ম থেকেও পবিত্র।

প্রথম বিষয়. ইসলাম ও সহিংসতা একে অপরের সাথে অলজ্ঞনীয় সম্পর্ক রাখে।

দ্বিতীয় বিষয়. ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে রয়েছে মৌলিক বৈপরিত্য।

তৃতীয় বিষয়. ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে রয়েছে ব্যাপক ও শর্তহীন শত্রুতা।

যদিও তাদের নিকট স্বীকৃত এই নীতির কয়েকটি শতাব্দী আগের। কিন্তু ১৯৭৮-১৯৮২ মধ্যে ইউরোপের চিন্তাচেতনায় কথিত এই নীতির শিকড় ব্যাপক গভীরতা লাভ করে। এই সময়ে বৈশ্বিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক বিভিন্ন পরিবর্তন হতে থাকে।

ভূরাজনৈতিক দিক থেকে এই সময়ে বেশ পরিবর্তন দেখা দেয়। ইরান ও সৌদির ভেতর ইসলাম নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য থাকলেও পশ্চিমে এটা বিবেচ্য নয়। তারা এটাকে ইসলামের প্রচার-প্রসার বলেই মনে করে। ১৯৭৮-১৯৮২ সালের মধ্যে ইরানে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, সৌদি আরবে উতাইবি আন্দোলন ও সিরিয়ায় সশস্ত্র আন্দোলনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা এটাকে তাদের জন্য হুমকি মনে করছে।

অন্যদিকে পোপ দ্বিতীয় জনপলের যুগ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের প্রেসিডেন্সির সময়ে নব্য রক্ষণশীলদের হোয়াইটে আগমণ ঘটে। অপরদিকে জেরুসালেম দখলের পর ১৯৮২ সালে লেবাননে পৌঁছে যায় ইসরায়েলি ট্যাঙ্কবহর। আঞ্চলিক অস্থিরতা, আন্তর্জাতিক ধোঁয়াশাচ্ছন্নতা এবং পাশ্চাত্যে ইসরায়েলি লবিয়িং গ্রুপগুলোর তৎপরতায় পাশ্চাত্য বিশ্বের নিকট যেকোনো রাজনৈতিক দলের সাথে শত্রুতা করা থেকে ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষণ করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

ইউরোপীয় অঞ্চলে মুসলিম শরণার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেকারত্বের হার ব্যাপক আকার ধারণ করে। ইউরোপ প্রবেশ করে নতুন যুগে। নতুন প্রযুক্তি-বিপ্লবে ইউরোপ মহাদেশ নতুন আকৃতি পেতে থাকে। ইউরোপের বেকারত্ব ও শরণার্থীদের সংখ্যাবৃদ্ধির এই সারণি ইউরোপের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংগঠনই দিয়েছে। ১৯৪৬ সালে উত্তর আফ্রিকা থেকে ফ্রান্সে আগত মানুষদের সংখ্যা এক লাখও অতিক্রম করেনি। অন্যদিকে ১৯৭৫ সালে চব্বিশ লাখের অধিক শরণার্থী ফ্রান্সে আসে।

জার্মানিতেও তুর্কি ও কুর্দি কমিউনিটির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭৪ সালে মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে জার্মানিতে শরণার্থীর সংখ্যা সাত লাখ পনেরো হাজার থেকে পঁয়ত্রিশ লাখে পৌঁছে যায়। অন্যদিকে ইউরোপের শরণার্থীপ্রধান দেশগুলোতে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮২ সালে বেকারত্ব ১৬০ পার্সেন্ট বেড়ে যায়।

যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ১৮১৫ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৬০ মিলিয়ন মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে। তদুপরি পশ্চিম ইউরোপ নিছক অর্থনৈতিক কারণে হওয়া এই উদ্বাস্তু সমস্যাকে গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে মানুষের এই অবাধ চলাচল তো চলবেই। অর্থনৈতিক,

সাংস্কৃতিক ও গণমাধ্যমকেন্দ্রিক এই মানববিশ্বে মানুষের এ অবাধ চলাচল তো থাকবেই। যেখানে সীমান্তের প্রতিবন্ধকতা খুবই গৌণ।

বৈশ্বিক এই পরিবর্তনের কোলাহলের মধ্যে ইউরোপে শুরু হয় পরিচয় সংকট। প্রচুর মানুষ শরণার্থী হওয়ায় সাদা-কালোসহ বহু মানুষ একত্রিত হয় ইউরোপীয় সমাজে। মানুষের ভার আর বেকারত্বে অর্থনীতি হয়ে পড়ে নাজুক। নতুন মানুষের উপস্থিতিতে আবার নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠার আশঙ্কা তৈরি হয় সমাজের আদি বাসিন্দাদের মধ্যে। এই আশঙ্কার মধ্যে আসে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের টুইন টাওয়ারে হামলার ঘটনা। যে আশঙ্কাকে প্রকাশ্যে সজোরে বলতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল পশ্চিমা, টুইন টাওয়ার হামলা সেই আশঙ্কার প্রকাশকে অবাধ করে দেয়। বহুজাতিভিত্তিক ইউরোপের দাবিদার 'ইউরোপ সন্ত্রাসী' শত্রুর সন্ধান পেয়ে যায়।

ইউরোপের বুদ্ধিজীবীমহল ইসলামোফোবিয়ার বিষয়টি শুধু উপেক্ষাই করেননি। বরং ইসলামোফোবিয়া নিয়ে যারা শঙ্কা প্রকাশ করছেন, নিম্নে উল্লিখিত পয়েন্ট দ্বারা তাদের প্রতি নগ্ন আগ্রাসন চালিয়েছে তারা। যেমন-

১. যারা ইসলামোফোবিয়ার কথা বলে, এরা হলো ইরানি মোল্লা। এই সমালোচনায় যদিও ভুলে যাওয়া হয়, এই শব্দ প্রথম ১৯২৫ সালে ব্যবহৃত হয়। ফ্রান্সে ইসলামোফোবিয়ার ভয়াবহ বর্ণনায় লিখিত একটি প্রবন্ধে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়।

২. ইউরোপের জন্য ইসলাম হুমকি। কারণ, মুসলিমরা সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্ন একটি সমাজ তৈরি করছে।

৩. ইসলামোফোবিয়া নিয়ে এক ধরনের ব্ল্যাকমেইল করা হয়। সাধারণত ইউরোপের ইসলামপন্থিরা বলে থাকেন, ইসলাম একটি ধ্রুবক। এটা কোনো পরিবর্তন গ্রহণ করে না। ইসলামোফোবিয়ার সমর্থকরা এই খণ্ডিত বক্তব্যকে গ্রহণ করে বলে থাকে, ইসলাম যুক্তিকে গ্রহণ করে না। এভাবে ইসলামোফোবিয়ার বিষয়টি সামনে এনে তাদের ঘৃণ্য মানসিকতা লুকিয়ে রাখার অপচেষ্টা চালায়।

এখানে আমরা ইসলামোফোবিয়ার পরিভাষা ও এর সূক্ষ্মতম অলিগলি নিয়ে আলোচনা করছি না। ইসলামোফোবিয়াকে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বৈধতা দেয়ার জন্য গত শতাব্দীর শেষার্ধে যে প্রচেষ্টা দৃশ্যমান হয়েছে, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। ইসলামোফোবিয়াকে বৈধতা দেয়ার এই

প্রক্রিয়া একদল চরমপন্থি বুদ্ধিজীবীর সৃষ্টি করেছে। তারা মানবতার অস্তিত্বের জন্য মুসলিমদের প্রতি ঘৃণাকে শুধু যথেষ্ট মনে করে না বরং ইসলামকে মানবতার জন্য হুমকি মনে করেন।

ইউরোপের ডানপন্থি পত্রিকার পাশাপাশি বিভিন্ন মধ্যপন্থি পত্রিকাগুলোও মুসলিমদের হুমকি হিসেবে তুলে ধরার অদ্ভুত সব যুক্তি উপস্থাপন করে। নিরাপত্তাজনিত কারণে চার্লস দি গল বিমানবন্দরগামী রোডে মুসলিমদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার পক্ষে মত দেয় ফ্রান্সের মধ্যপন্থি ছয়টি জাতীয় পত্রিকা। পত্রিকাগুলো মনে করে এমন ব্যক্তিকে বিমানবন্দরসহ স্পর্শকাতর স্থানে যেতে দেয়া ঠিক নয়, যিনি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন, সুযোগ পেলেই নামাজ আদায়ে মসজিদে যান কিংবা হজ করার ইচ্ছা রাখেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক সর্বোচ্চ কমিশন তাদের এক সিদ্ধান্তে ইউরোপের লেখক, গবেষক ও সাংবাদিক কর্তৃক ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতাকে বৈধতাদানের নিন্দা জানান। হাইকমিশন আরও বলেন, 'ইসলাম ও সহিংসতার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক জুড়ে দেয়া প্রকারান্তরে বর্ণবাদ ও বৈষম্য বলে বিবেচিত। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে ইসলাম ও সন্ত্রাস অভিন্ন হওয়ার প্রবণতাও বর্ণবাদ ও বৈষম্য।'

নিশ্চয়ই বিভিন্ন স্থানে কিছু অবিবেচক মুসলিমের কারণে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তা আমরা অস্বীকার করছি না। বৈষম্য ও বর্ণবাদের নামে কোনো ধর্ম ও গোষ্ঠীর সমালোচনার অনুমোদন এবং একজন বিশ্বাসীর স্বাধীনতার মধ্যে অবশ্যই আমরা পার্থক্য করি।

ইউরোপীয় পরিমণ্ডলে ইসলাম প্রবেশের পূর্বেই ইউরো সমাজে ধর্ম ছিল একটি বহুল চর্চিত পাঠ্য ও সমালোচনার বিষয়। তবে প্রথম দিকে ইউরোপে আসা মুসলিমরা অমুসলিম সমাজে মুসলিমদের করণীয় আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে পারেনি। মুসলিম-অমুসলিম সমাজে মুসলিমদের পৃথক বিধানের অনবগতি মুসলিমদের জন্য নেতিবাচক অবস্থা তৈরি করেছে।

উদাহরণস্বরূপ একজন ইসলামপন্থি লেখক যিনি সারা জীবন ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে লেখালিখি করেছেন, তারপক্ষে ইউরোপে জন্ম নেয়া নিজ সন্তানকে এটা বলা নিশ্চয়ই কঠিন যে, ইউরোপে মুসলিমদের রক্ষায় গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতাই সবচে উত্তম।

১৯৯৭ সালে ইসলামোফোবিয়ার একটি পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করেছে বেসরকারি সংস্থা The RnNymede Trust. সংগঠনটি ইসলামোফোবিয়ার আটটি ক্রাইটেরিয়া বর্ণনা করেছেন।

১. ইসলামকে স্থবির জ্ঞান করা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা প্রভাবিত হয় না বললেই চলে।

২. ইসলাম একক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। অন্যসব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে এর সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো মূল্যবোধ নেই। তারা প্রভাবিত হয় না। এবং প্রভাবকও নয়।

৩. পাশ্চাত্যের বিবেচনায় ইসলামকে বর্বর, অবৈজ্ঞানিক, আদিম ও যৌনপ্রবণ বলে আখ্যায়িত করা।

৪. ইসলামকে সহিংস, আগ্রাসী ও সমস্যার উৎস বিবেচনা করে একে সন্ত্রাসবাদ ও সভ্যতার সংঘাত-সংঘর্ষে বিবর্ণ বলে অভিহিত করা।

৫. রাজনৈতিক ও সামরিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইসলামকে একটি আদর্শ বলে বিবেচনা করা।

৬. পাশ্চাত্যের প্রতি ইসলামপন্থিদের কোনো ধরনের সমালোচনাকে সহ্য না করা।

৭. সমাজের মূল স্ট্রিম থেকে মুসলিমদের সরিয়ে রাখা। এবং মুসলিমদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের যৌক্তিকতা প্রকাশে ইসলামের প্রতি শত্রুতাকে ব্যবহার করা।

৮. মুসলিমদের প্রতি শত্রুতাকে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বলে গণ্য করা।

২০০৫ সালে কাউন্সিল অব ইউরোপ 'ইসলামোফোবিয়া এবং যুবকদের ওপর এর প্রভাব' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়– 'ইসলামোফোবিয়া হলো ইসলাম, মুসলিম এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভয় ও কুসংস্কার। চাই সেটা দৈনন্দিন বৈষম্য ও বর্ণবাদ প্রকাশে হোক কিংবা আরও সহিংস পদ্ধতিতে প্রকাশিত হোক। ইসলামোফোবিয়া মানবাধিকারের লঙ্ঘন এবং সামাজিক সংহতির জন্য ঝুঁকি।'

বর্ণবাদ ও অভিবাসন পর্যবেক্ষণবিষয়ক ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে 'বর্ণগত বৈষম্য ও ইসলামোফোবিয়া' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন

প্রকাশ করে। প্রতিবেদন বলা হয়, ইউরোপে শিক্ষা, বাসস্থান ও কর্মক্ষেত্রে মুসলিমদের প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন করা হয়।'

আমি যখন পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি চেয়ে আবেদন করলাম, কাউন্সিলের প্রধান বিস্তারিত বলতে অস্বীকার করে তার অভিজ্ঞতার কথা জানালেন, 'ইসলামোফোবিয়াটা মৌখিক তাচ্ছিল্য থেকে শুরু হয়ে শারীরিক নির্যাতন, উপাসনালয় ও গোরস্থানে হামলার ঘটনা ঘটে। সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ব্যকগ্রাউন্ড বিবেচনা না করেই ইউরোপের সকল নাগরিকদের মধ্যে সমতা রক্ষায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের কার্যকর পদক্ষেপ খুবই প্রয়োজন। মানবাধিকার ও নাগরিক সমাজের অধিকার রক্ষার বিভিন্ন সভা-সমাবেশে মুসলিমদের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করা।'

অধিকাংশ মানবাধিকার ও বর্ণবাদবিরোধী সংগঠনের নেতারা মনে করেন, ইসলামোফোবিয়ার রাজনৈতিক ব্যবহার ইউরোপের রাজনৈতিক ব্যবসায় বর্তমানে সবচে জনপ্রিয়। পরবর্তীতে দৃষ্টি দিতে হবে, দৈনন্দিন সকল ধরনের বৈষম্য ও আগ্রাসন থেকে মুসলিমদের রক্ষায় একটি আইনি টিম তৈরি করা। এই টিমে রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক সকল ব্যক্তিত্ব যুক্ত করা। কারণ, ইসলামোফোবিয়া ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামোফোবিয়ার এই উগ্রতার মোকাবিলা করতে হবে। এর জন্য ইউরোপীয় বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের দৃঢ় ভূমিকা রাখতে হবে। [৪৯]

[৪৯] সম্পূর্ণ লেখাটি আল জাজিরা অবলম্বনে রচিত

ইসলামোফোবিয়া ও গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতা

রকিব মুহাম্মদ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যানা আরেন্ড। দর্শন শাস্ত্রের পুরোধা। দর্শনের জটিল তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে কখনো কখনো তিনি অভিজ্ঞতার আলোকে বয়ান দিয়েছেন আগামীর বিভিন্ন ঘটিতব্য ঘটনাকে।

'পথ তো চলছে, কিন্তু এ পথের বর্ণবাদ পাশ্চাত্য বিশ্ব ও সম্পূর্ণ বিশ্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দেবে।' হানা আরেন্ট এই ভবিষ্যৎবাণী দিয়েছিলেন। পূর্বাপর দৃশ্যমান কোনো যোগসূত্র না থাকায় এটা কারো দৃষ্টি ততটা আকর্ষণ করতে পারেনি। বর্ণবাদ ও ফ্যাসিবাদের জঘন্য খাঁদ থেকে মুক্তি পাওয়া ইউরোপ কখনো যে চরমপন্থা ও বর্ণবাদের শিকার হবে এটা কখনো কেউ কল্পনা করতে পারেনি। বর্ণবাদটা যেমনই হোক, বর্ণবাদের টার্গেট যেই হোক না কেন?

উদার চিন্তার কথিত গ্যারিসন যুক্তরাষ্ট্র, বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত প্রদানের অন্যতম সদস্য রাশিয়া, বিশাল জনশক্তির বলে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ার স্বপ্নে বিভোর চীন এবং একই সাথে জীবনবাহী ব্যাকটেরিয়া ও মৃত্যুবাহী ভাইরাসে আক্রান্ত ইসলামিবিশ্ব আজ বিদ্যমান অস্থিতিশীল বিশ্বকে পরিচালিত করছে।

বিভিন্ন শক্তির বিশ্ব পরিচালনার ব্যর্থতায় তিক্ত মানুষ বিকল্প শক্তি ও সভ্যতার খোঁজে এদিক-সেদিক ফিরছে। এ অস্থিতিশীল অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে মানব জাতিকে রক্ষায় এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার অংশ হিসেবে ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা ও ভারসাম্য নীতির প্রয়োজনীয়তা বোধ করে মানুষ। খোদ ইউরোপ ও ইউরোপের বসবাসরত আরব ও মুসলিমদের দায়িত্ব অর্পিত হলো ইউরোপের ওপর। ব্যক্তিক ও সামষ্টিক অধিকার রক্ষায় এবং মৌলিক স্বাধীনতার মূলনীতি তৈরির গুরু দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ইউরোপ। ব্যক্তি ও সমাজের অধিকার রক্ষাকে ইউরোপের স্থিতিশীলতা ও অস্তিত্বের মূল ভিত্তি বিবেচনা করা হয়। সর্বোপরি এই ইউরোপই পুঁজিবাদ ও ঔপনিবেশিক ভয়াবহতা থেকে রক্ষাকারী আলোকায়ন-মূল্যবোধের ধারক।

ইসলাম অর্ধ শতাব্দীর কম সময়ে সাধারণ একটি ধর্মের অবস্থান থেকে সমাজের মৌলিক ও বিশ্বাসী গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। তবে এটা কোনো পরিকল্পিত নয়। সস্তা শ্রমের জন্য তৃতীয় বিশ্ব থেকে শ্রমিক আমদানীকারক

কোনো ব্যবসায়ীর চিন্তায় তা ছিল না। বরং ইউরোপে সক্রিয় বিভিন্ন ইসলামি সংগঠনগুলো তাদের রাজনৈতিক ও ধর্মপ্রচার কার্যের লক্ষ্য হিসেবে এটাকে নির্ধারণ করেনি।

যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক পরিবেশে সংলাপ ও দৃষ্টিভঙ্গি যতটা দ্রুত সম্প্রসারিত হয়, স্বৈরতন্ত্র-বেষ্টিত কোনো পরিমণ্ডলে সংলাপ ও দর্শন ঠিক ততটা সংকুচিত হয়। গণতান্ত্রিক পরিবেশে দ্রুতই একটি দল একটি শক্তিতে পরিণত হতে পারে। নিঃসন্দেহে শক্তি তৈরির এই মুহূর্ত ইসলামভীতি তৈরির জন্য সবচে উর্বর সময়।

একটি গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের শক্তি তৈরির এ মুহূর্ত নিঃসন্দেহে তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। স্বভাবতই রাজনৈতিক ইসলামি সংগঠনগুলোর জন্য এটা খুবই কাঙ্ক্ষিত। অন্যদিকে মুসলিম কমিউনিটি আছে এমন দেশগুলোর জন্য এটা একটি বড় চাপ। তাছাড়া এসব দেশের কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তির জন্য এটা শঙ্কাও বটে। সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল স্তম্ভ যেই নাগরিক- তাদের মধ্যে যদি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বোধে ভিন্নতা তৈরি হয়, তবে তা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অশনি সংকেত। যদিও আমাদের বিদ্যমান সমাজব্যবস্থায় ভিন্ন বোধে বেড়ে ওঠা নতুন জনগোষ্ঠীকে ইনসাফের সাথে গ্রহণ করা হয় না। তাদের বোধ ও রুচিবোধের বিবেচনা না করে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়।

ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার আগে সমাজের মূল ধারার আসতে ইউরোপের ইহুদিদের যুগের পর যুগ লেগেছে। বর্তমানে ইউরোপে বসবাসরত এশিয়ান বিভিন্ন কমিউনিটিকে অর্থনৈতিক কমিউনিটি বলাই শ্রেয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য তারা ইউরোপে আগমণ করেছে। ইসলামের সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি ইউরোপের সুধী সমাজের জন্য রীতিমতো আশঙ্কার জায়গা। এমনকি শরণার্থীদের অধিকার সচেতন মানবাধিকার কর্মীদের আশঙ্কাও গোপন থাকেনি। তাদের এই আস্থার সংকটকে তীব্র করে ইউরোপে আগমণকারী প্রথম দিকের ইসলামপন্থিরা। যারা তাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাকে পাশ্চাত্য প্রোডাক্ট বিবেচনা করে সারা জীবন এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।

এমনকি ইউরোপের সংখ্যালঘুদের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতাকে সবচে উপযোগী মনে করলেও তারা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে একটি ইসলামি রাষ্ট্র তৈরির চেষ্ট করে। এবং অনবরত অন্যায়ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে চরমভাবে আক্রমণ

করে। এখানে মনে করিয়ে দেয়া জরুরি মনে করছি, গণতন্ত্রই ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। গণতন্ত্র ছিল চার্চের প্রধান শত্রু। এই গণতন্ত্রই অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার জন্মের প্রথম দিন থেকেই বেশকিছু মূলনীতি বুকে ধারণ করেছিল। স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা, নিরাপত্তা, জনগণের সার্বভৌমত্ব ও প্রশাসনের পৃথকীকরণের মূলনীতি। পরবর্তীতে ১৯০৫ সালে ফ্রান্সে প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ আইন জারি হয়। আইন অনুসারে রাষ্ট্র থেকে চার্চকে পরিপূর্ণভাবে পৃথক করা হয়।

১৯০৫ সালের ঐ আলোচনায় মূল প্রাণসত্তাই ছিল কোনো ধর্ম কিংবা বিশ্বাস-প্রসূত আইন সমাজের ওপর আরোপ না করা। অন্যদিকে সামাজিক ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে গণতন্ত্রের মূলনীতি পরিপক্ব হয়। এই গণতন্ত্র জন-জরিপ এবং পরবর্তীতে জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় আরও পুষ্ট হয়। এবং বিংশ শতাব্দীর ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো মূল্যবোধ কিংবা আক্বিদা নয়। বরং এটা একটি মূলনীতি ও প্রস্তাব। সম্ভাব্য পরিণতির বিবেচনা করে একটি প্রস্তাব প্রদানের নামই ধর্মনিরপেক্ষতা। গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বহির্ভূত যেকোনো তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি তারা স্টালিনবাদের বিরোধিতা করেন। কারণ, স্টালিনবাদীরা খোদাদ্রোহিতাকে ধর্ম বানিয়ে একটি স্বতন্ত্র ধর্মের অবস্থান দিয়েছে।

দাতব্য কর্মে 'মৌলিক অর্থনৈতিক অধিকার'-এর মূলনীতির পরিবর্তে কোনো ধর্মজাত প্রেরণাকে প্রত্যাখ্যান এই মতবাদ। মোটকথা ধর্মতাড়িত কোনো ভালো কাজও তাদের কাছে নিন্দনীয়। বরং এই ভালো কাজটির মূল প্রেরণা থাকবে ধর্মভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি। ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা মূলত তিনটি পয়েন্টে খুবই স্পর্শকাতর-

-চিন্তা ও মতের শর্তহীন স্বাধীনতা
-বৈশ্বিক মানবাধিকার
-রাষ্ট্র ও চার্চের পৃথকীকরণ

তবে রাষ্ট্র সমাজের সবকিছু সমান তালে চলে না। সবকিছুকে এক পাল্লায় মাপাও যায় না। সমাজ-রাষ্ট্রে সকল স্থানেই কি ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ নাকি কোথাও কোনো স্পেস আছে? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা ফ্রান্সিস ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের একটি বহুল চর্চিত 'ফোরস্পেস' থিওরি তুলে ধরছি।

ফ্রান্সের ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা চারটি ক্ষেত্রের কথা খুব বলেন, বিশেষ স্পেস, সাধারণ স্পেস, প্রশাসন ও স্বাধীনতা তৈরির স্পেস।

বিশেষ স্পেস বলতে ব্যক্তি স্বাধীনতা। আর সাধারণ স্পেসের আওতা বেশ বড়। সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিশাল পরিধিকে বুঝায় এটা। এ জন্যই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সাধারণত এ বিশেষ স্পেসেই ইবাদত, ধর্মপ্রচার ও ধর্মীয় প্রতীকের স্বাধীনতার দাবি করে। এ কারণেই সামাজিক পরিধিতে ধর্মীয় কোনো প্রতীককে অপ্রতিঘাত করার বিশেষ এক ধরনের ঐকমত্য আছে।

রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ বলতে রাষ্ট্রের আইনবিভাগ, নির্বাহী ও প্রশাসনিক বিভাগকেই উদ্দেশ্য করে থাকে। এক্ষেত্রেও ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মীয় আচার-আচরণের বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করে। অন্যদিকে স্কুল, কলেজ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে নাগরিক-তৈরির প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

প্রচলিত আছে, জার্মান সমর্থক মিলিশিয়ারা একটি স্কুলে প্রবেশ করে ইহুদি সন্তানদের সামনে আনতে বলেন, স্কুল ইন্সপেক্টর উত্তর দেন, 'আমাদের এখানে কোনো ইহুদি সন্তান নেই, আমাদের রয়েছে শুধু শিক্ষার্থী' এবং ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা হিজাব ও নেকাবের পক্ষে মানবাধিকারকর্মীদের সাথে থেকেছেন। তাদের মতে, নেকাব নিষিদ্ধ করার সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্মনিরপেক্ষতা হিজাব-নেকাবেরবিরোধী না।

কোনো কোনো ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে বর্তমানে কিছু সংযুক্ত করার কথা বলেন। উন্মুক্ত, উদার, বহুত্ববাদী, ইতিবাচক গণতন্ত্র ইত্যাদি নামে বলার চেষ্টা করেন। তবে অধিকাংশ গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজিবী এ ধরনের সংযুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেন।

ফ্রান্সের ধর্মনিরপেক্ষ ধারা সবসময় মানবাধিকার ইস্যুতে সামনে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা তাদের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গ্রুপের মুসলিমবিরোধী তৎপরতার লাগাম টেনে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। হোক তারা জায়নিস্ট কিংবা নিউ লিবারেল সমর্থক। সেজন্য আমরা গোয়েন্তানামো, গোপন কারাগার, কালো তালিকা ইস্যুতে আমাদের সাথে সমাজতান্ত্রিক ও বিশ্বায়নবিরোধী কাউকে দেখলে অবাক হবো না। কিন্তু অল্পই আমাদের সাথে কোনো ডান গণতন্ত্রীকে পাবো। অনুরূপভাবে গাজা ভূখণ্ডের ওপর ইসরায়েলের অন্যায় অবরোধ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবং সীমান্ত প্রাচীর নির্মাণ ও সীমান্ত বন্ধের বিরুদ্ধেও বামপন্থি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের দেখা যাবে।

বর্তমানে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর অনুকূলে কর্মরত রয়েছে গণমাধ্যম ও রাজনীতিবিদ। এসবের কারণে সৃষ্ট মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামোফোবিয়ার পাঠ যথেষ্ট নয়। বরং ইসলামোফোবিয়া মোকাবিলায় জনমত প্রভাবক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে মনোযোগী হতে হবে ।

তাছাড়া বিভিন্ন ইসলামি সংগঠনের কর্মপন্থা, পদ্ধতি ও দাওয়াতি কর্মকৌশলের দিকে দৃষ্টি দেয়ার জন্য সাহসও দরকার। কিছু কিছু ইসলামি রাজনৈতিক পক্ষ তাদের ইসলামি প্রতিপক্ষকে ইসলামোফোবিয়ার পদ্ধতিতে মোকাবিলা করে। তারা ইসলামোফোবিয়াবিরোধী মানবাধিকার ও সুশীলদের আন্দোলন থেকে দূরে থাকে। নন-ইউরোপীয় রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে তাদের পরিচয় প্রকাশিত হওয়ার আশঙ্কায় তারা হয়তো এমন করেন।

বিভিন্ন ব্যক্তি ও আন্দোলনের কর্তা ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রতীয়মান হয়, ইউরোপের মুসলিমদের মূল সম্পর্ক মুসলিম কমিউনিটির সাথে। এক্ষেত্রে ইউরোপের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নাই। এভাবে ইউরোপে মানবাধিকার রক্ষায় অভিন্ন লড়াইয়ের মাধ্যমে অস্তিত্বে আসা গঠনমূলক ও ইতিবাচক সকল সেতু বন্ধনকে নষ্ট করে এরা।

একাধিক আলোচনায় একাধিক রাজনীতিবিদ বলেন, ‘প্রতিটি লড়াইয়ে হারজিত হয়। কিন্তু সকল অবস্থায় মুসলমানই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং আমরা কেন সময় নষ্ট করবো?’ এক্ষেত্রে বলতে হবে, আমরা কিছু ইসলামপন্থি দ্বিচারিতাদের জন্য বারবার মূল্য চুকাচ্ছি। যারা নিচু আওয়াজে বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা ইউরোপের সংখ্যালঘু মুসলিমদের জন্য সবচে নিরাপদ ব্যবস্থা। অন্যদিকে জোর আওয়াজে বলেন, ইসলামই সমাধান। তারা পোশাকের স্বাধীনতার নামে নেকাবের পক্ষাবলম্বন করেন। আবার মুসলিম দেশগুলোতে পোশাকের স্বাধীনতা নিয়ে একটি শব্দ পর্যন্ত বলেন না। তাছাড়া গণতন্ত্রের ওপর কিছু সালাফিদের সদা আক্রমণ তো আছেই। তাদের নিকট সকল নোংরামি, জেনা-ব্যভিচার ও সমকামিতার জন্য একমাত্র দায়ী গণতন্ত্র।

সর্বশেষ ফ্রান্সে নেকাব নিষিদ্ধের সময় গণভোটের আয়োজন নিয়ে একটি বিষয় দেখা যায়। বড়ো বড়ো আরব স্যাটালাইট চ্যানেলগুলো এই ফাঁদ থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। তারা একজন লিবারেল ইসলামিস্টের বিপরীতে একজন চরম ডানপন্থি মানুষকে আলোচনায় এনেছে।

একজন মুসলিম কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রতিপক্ষ মুসলিমকে ঘায়েল করছেন। অন্যদিকে একজন ইউরোপীয় উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের ব্যবস্থা

করছেন। যেন সমন্বয়ক একজন ফকীহ। অথচ আলোচনা চলছে বর্তমান পরিস্থিতিতে গণভোটের অকার্যকারিতা সম্পর্কে।

তাছাড়া ইসলামি সংস্থা ও রাষ্ট্রগুলোকেও এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত দেখা যায়। অথচ মানবাধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও রাজনীতি সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চার্টারের অধীনে কথা বলার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কিন্তু ফরাসি ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের সবচে বড়ো সংগঠনের সেক্রেটারি স্পষ্ট বলেন, রাস্তায় নেকাব পরা থেকে বিরত রাখা কিংবা বাধা দেয়া ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। তাছাড়া পাবলিক প্লেসে নেকাব ও ধর্মীয় প্রতীকে বাধা দেয়া বৈধ নয়।

২১/১/২০১০ সালে ফ্রান্সের মানবাধিকারবিষয়ক জাতীয় পরামর্শ পরিষদ ৩৪/২ ভোটে নেকাব বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাস করে। এই প্রস্তাবে মৌলিকভাবে নেকাববিরোধী যেকোনো আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করা হয়। পাশাপাশি পরিষদ সকল ধরনের বৈষম্য দূর করার আহ্বান জানায়। অথচ কোনো আরব পত্রিকা ও গণমাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনো তথ্য আসেনি। বরং কিছু চ্যানেল তো বরং ইসলাম ও মুসলিমদের বিষয়ে বর্ণবাদী কিছু ফরাসি ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের দাবি অনুসারে সম্ভাব্য যে সিদ্ধান্ত হবে সেই কথা প্রচার করছে।

এ ধরনের আচরণ সঠিক নয়। এবং এটা ইউরোপের মুসলিম কমিউনিটির জন্য কোনো সুফল বয়ে আনে না। তাছাড়া ইসলামোফোবিয়ার মোকাবিলায় আমাদের আরও বুদ্ধিবৃত্তিক হওয়া দরকার। মৌলিকভাবে স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদান করার প্রতি মনোযোগী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে সমাজপ্রভাবক গণমাধ্যম ও সামাজিক কৌশল গ্রহণ করতে হবে। নতুবা শুধু ইসলামোফোবিয়া মোকাবিলায় সংগঠনের কোনো উপযোগিতা থাকবে না।[৫০]

---

[৫০] সম্পূর্ণ লেখাটি আল জাজিরা অবলম্বনে রচিত

ইসলামোফোবিয়া থেকে মসজিদফোবিয়া

আলী আব্দুর রউফ

বিশ্ব চলছে বিনিয়োগ পদ্ধতিতে। বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থবিত্ত অর্জন করে মানুষ। কখনো রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থে অর্থ ছাড়াও অনেক বিনিয়োগ-পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তবে দৃশ্যমান বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে আজ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে সর্বাধিক ফলপ্রসূ বিনিয়োগ পদ্ধতি হলো ঘৃণা ও বিদ্বেষের চাষ। ঘৃণা ও বিদ্বেষ চাষ থেকে লাভজনক কোনো বিনিয়োগ পদ্ধতি বিশ্বে দ্বিতীয় আরেকটি নেই। রুটিরুজির স্বপ্ন যেসব দেশ ও অঞ্চলের লোকদের নিকট সেরা স্বপ্ন, সেই অঞ্চল ও দেশে মূলত এই বিনিয়োগ পদ্ধতির ব্যাপক চাষ করে কথিত উন্নতবিশ্ব। বিদ্বেষ ও ঘৃণাচাষের অন্যতম হাতিয়ার ইসলামোফোবিয়া; ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা এবং তা সমাজে বাস্তবায়ন করা। আমেরিকার রাজধানী নিউইয়র্কের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে বিমান-হামলার পর থেকে মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষে যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা। ইসলামকে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রগতির বিরুদ্ধ-শক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়ে মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানো হয়। যেকোনো সুবিবেচক ব্যক্তি পশ্চিমা এই ইসলামোফোবিয়ার কথিত ডামাডোলের মধ্যে স্বভাবত দুটি বিষয় লক্ষ্য করতে পারবেন।

প্রথমত, ইউরো-মার্কিন পরিমণ্ডলে ইসলামোফোবিয়া তৈরি করা এবং রাজনৈতিক স্বার্থচরিতার্থ করার হীন মানসিকতা নিয়ে নির্বাচনি প্রচারণায় তার প্রয়োগ ঘটানো। সর্বত্র ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি এর নীরব ও কৌশলী প্রচারণা। ইসলামকে পরিশুদ্ধকরণের কথিত দাবি তুলে উম্মাহকে পদাবনত করার হীন প্রচেষ্টা। আর হ্যাঁ, মধ্যপ্রাচ্যের বিদ্যমান অবস্থা অস্থিতিশীল ও অনিশ্চিত অবস্থা আমাদের এ ব্যাখ্যার গভীরতাকে আরও স্পষ্ট করে।

দ্বিতীয়ত, মুসলিম সমাজের রক্ষণশীল অংশকে পাশ্চাত্যে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করার প্রবণতা। ইসলামোফোবিয়া বললে অবচেতন মনে পাশ্চাত্য ও অমুসলিম সমাজের চিত্র ধরা দেয়। কিন্তু মুসলিম সমাজে ইসলাম-বিদ্বেষ ও ঘৃণা আজ শিকড় গেড়েছে। বরং আমরা মুসলিমরা পাশ্চাত্যে ইসলামোফোবিয়া-চুল্লিতে আরও কিছুটা জ্বালানি ছিটিয়ে দেয়ার কাজটি বেশ

পারঙ্গমতার সাথে করে থাকি। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মুসলিমদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রায়িত করা এবং মুসলিমদের সন্ত্রাসী ট্যাগ দেয়ার আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় আরও একহাত এগিয়ে দেই, এই আমরা মুসলিমরা।

তিউনিশিয়ার বিন আলী থেকে সিরিয়ার বাশার আল আসাদের মতো আরব জালিম শাসকদের কথা চিন্তা করুন; অধিকার আদায়ের জন্য মজলুম জনগণ যখন রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছে, লড়াই করছে তখন জালিম শাসকবর্গ এদের সন্ত্রাসীর তকমা লাগিয়ে পশ্চিমা প্রভুদের নিকট উপস্থাপন করছে। মুসলিম শাসকদের এই কর্মকাণ্ড পশ্চিমের মুসলিমদের হুমকির মুখে ফেলে দেয়। পশ্চিমা থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলো মুসলিম শাসকদের এ কর্মকাণ্ডকে পশ্চিমে বসবাসকারী মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ হাজির করে। এবং পশ্চিমা দেশের মুসলিম কমিউনিটির বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। অন্যদিকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় মানুষদের আহ্বানে পুরাতন রীতিনীতির পরিবর্তে সময়ের সাথে চলমান কর্মপন্থা-অবলম্বনের দাবিও উঠছে বেশ উচ্চকণ্ঠে। এই দাবির প্রবক্তারা মনে করেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র অর্জনের ক্ষেত্রে একমাত্র বাধা হলো ধর্মীয় বয়ানে নতুনত্বের অভাব। কিন্তু পশ্চিমাবিশ্ব আজ ইসলামভীতির পথ মাড়িয়ে নতুন ভীতি ও নতুন ঘৃণার রসদ খুঁজে পেয়েছে। এখন ইসলাম থেকে ইসলামের বিভিন্ন প্রতীকের প্রতি এই -বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রলম্বিত হয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকার পথেঘাটে ইসলামের বিভিন্ন প্রতীকের বিরুদ্ধে সভাসমাবেশ বের হচ্ছে। দাড়ি-টুপি-হিজাবের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছে। সবচে বেশি ঘৃণার শিকার হচ্ছে মসজিদ। হাতে হাতে প্ল্যাকার্ড শোভা পাচ্ছে। এগুলোতে লেখা– 'আমরা আর মসজিদ চাই না' অথবা 'মসজিদকে না বলুন। ভীতিচর্চার বিবর্তন-ইতিহাসে নতুন ফোবিয়া তৈরি হয়েছে; মসজিদফোবিয়া। আজ ইসলামের বিশ্বাসের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতীকের প্রতিও একধরনের ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রকাশ পাচ্ছে।

ভাষান্তর: রকিব মুহাম্মদ

সভ্যতার সংঘাত ও ইসলামোফোবিয়ার শোরগোল

রকিব মহাম্মদ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে হামলার পর থেকে পাশ্চাত্য মিডিয়ায় ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা বেশ বেড়ে যায়। পলিটিক্যাল ইসলাম আজ পশ্চিমা গণমাধ্যমের বিশেষ মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে। সমসাময়িক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ঐতিহ্যবাহী ইসলামিক রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনা বেশ জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু শঙ্কার দিকটি অনেকটা আঙ্গুল তুলে বলে দিয়েছেন প্রসিদ্ধ ফ্রান্সিস রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অলিভিয়ার রায়। তিনি বলেন, 'সামাজিক ও রাজনৈতিক ফেনোমনো হিসেবে ইসলামের পাঠ সবসময়ই একটি কঠিন বিষয়।' তিনি আরও বলেন, 'ইসলামকে নতুন দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয়বস্তু হিসেবে বিচার-বিশ্লেষণে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মারাত্মক বেশকিছু পদ্ধতিগত জটিলতা আছে।'

সমাজে ইসলামের দৃশ্যমান যেকোনো কাজ কিংবা কোন ইস্যুতে ইসলামের জোরদার উপস্থিতিতি পশ্চিমাদের চোখকে বড়ো করে তোলে। তারা ঘটনার পেছনের দিকটি তুলে আনতে শুরু করে বিভিন্ন বিশ্লেষণ। বিশ্লেষণে সর্বদা উদ্ভূত ঘটনার পেছনে ইসলামের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, দূরদর্শিতা কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থের দিকটিকে পরিকল্পিতভাবে সামনে আনে পশ্চিমা এই জনগণ। ইসলামের দৃশ্যমান যেকোনো কার্যক্রম বিশ্লেষণের আওতায় আসতেই পারে; এটা আওতাভুক্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বরং প্রতিটি ঘটনার বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজনীয়। ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া যে আধ্যাত্মিক কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তা পাশ্চাত্য মিডিয়া কিংবা একাডেমিতে অনুপস্থিত। ইসলামের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির ওপর পাশ্চাত্য মিডিয়ার এই অতি আগ্রহ পশ্চিমা একডেমিয়াতেও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামকে একটি সর্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম বিবেচনা না করে বরং রাজনৈতিক ধর্ম হিসেবে তারা বিবেচনা করছে। ফলে রাষ্ট্র থেকে এখানে ধর্মকে পৃথক করা বড়ো কঠিন। ইসলামের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের স্বার্থে যে ইসলামের অন্যান্য বিশ্বাস ও আচার-আচরণ প্রয়োগ হতে পারে, তা এ জগতে অনেকটা অপরিচিত। পশ্চিমা মিডিয়ার চেতন কিংবা অবচেতন এই

চর্চার কারণে রাজনৈতিক ইসলাম মিডিয়া ও একাডেমিতে একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয় হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

পাশ্চাত্যের বিচার-বিশ্লেষণিক পরিমণ্ডলে ইসলামপন্থিদের সামান্য উপস্থিতিকেও ধর্মীয় জাগরণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সত্তরের দশকে ইসলামপন্থিদের এই জাগরণ দেখা দেয়। এবং ১৯৭৯ সালে ইরানের ইসলামি বিপ্লবের সাথে সাথে এই জাগরণ সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যায় বলে মনে করে পাশ্চাত্যবিশ্ব।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মানদাফিল বলেন, পাশ্চাত্য সাহিত্যকলায় রাজনৈতিক ইসলাম নিয়ে সর্বদা তিনটি প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসা হয়। প্রথমত, একই সাথে ধর্ম আর রাজনীতি এটা একমাত্র ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়ত, ইসলাম বলতেই রাজনৈতিক ইসলাম। অর্থাৎ তারা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপকে উপেক্ষা করে একমাত্র রাজনৈতিক অংশকে পূর্ণ ইসলাম বিবেচনা করছে। তৃতীয়ত, প্রকৃতিগতভাবে রাজনৈতিক ইসলাম সহিংস। 'মুসলিম বিশ্বের অনেকে পাশ্চাত্যের কথিত এনলাইটেন্টমেন্টের নীতিকে লিবারেল গণতন্ত্র আখ্যা দিয়ে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ক্ষমতার স্বার্থে তারা এটাকে স্বৈরতন্ত্রের রূপ দিয়েছেন। এটা ইসলামের ব্যর্থতা নয়, বরং নন প্র্যাক্টিসিং মুসলিমের ব্যক্তিক স্বার্থ এখানে জড়িত।' এমন বক্তব্যও মানতে রাজি নয় পাশ্চাত্যের ইসলামোফোবিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা।

ইসলাম নিয়ে পশ্চিমের জ্ঞানবহরের এই দীনতার পেছনে মূলত প্রাচ্যবাদ প্রবলভাবে জড়িত। তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পশ্চিমা একাডেমিয়া ও মিডিয়া ইসলামের সমকালীন এ অবস্থার জন্য কল্পিত একটি পাঠ তৈরি করেছেন; গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিম ও ইসলামের মধ্যে রয়েছে ঢের বৈপরিত্য। অন্যদিকে পশ্চিমা বিশ্ব যখন এ ধরনের দাবি করছে, তখন আবার ইসলামি বিশ্ব গতিহীন, স্থবির ও স্বৈরতান্ত্রিক এক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে।

প্রাচ্যবাদ পূর্ব থেকেই পরিচয় দিয়েছে, প্রাচ্যের ইসলাম ও পশ্চিমা খ্রিস্টধর্মের বিভাজনটা শুধু বাহ্যিক নয়। এবং পাশ্চাত্য দর্শন তো শুরু থেকে তাদের পরিমণ্ডল ও একাডেমিয়াতে বারবার বলে চলছে, ইসলামি সভ্যতা শুধু অগণতান্ত্রিক শক্তিকে অনুপ্রাণিত করে। প্রাচ্যবাদীদের এসব আলোচনা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় মুসলিম সম্প্রদায় ইসলামোফোবিয়াকে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সাথে সংশ্লিষ্ট করেন। এবং তা তীব্রতর হওয়ার দাবি

তোলেন। অথচ এই ইসলামোফোবিয়া বহু শতাব্দী-পুরনো পশ্চিমা ঘৃণ্য বুদ্ধিবৃত্তিক বিদ্বেষের মাত্র খণ্ডিত অংশ।

ইসলামের প্রতি খ্রিস্টধর্মের বিদ্বেষ অনুধাবন করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ৬৩৪ সালে। যখন মুসলিমদের হাতে জেরুসালেমের পতন হলো, খ্রিস্টানরা খ্রিস্ট ধর্মকে বৈশ্বিক সাম্রাজ্যের বৈশ্বিক ধর্ম বলে দাবি তোলে। জেরুসালেমের পতন অর্থ বৈশ্বিক সাম্রাজ্যের পতন। এভাবে বিশ্বকে মুসলিম বিশ্বের মুখোমুখি করার হীন প্রচেষ্টা চালায় খ্রিস্টবিশ্ব। এডওয়ার্ড সাঈদ বলেন, প্রাচ্যের সাথে যখন ইউরোপের পরিচয় হয়, ইউরোপীয় জনমানসে ইসলামকে বহিরাগত ও অনাকাঙ্ক্ষিত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

কিন্তু ইফান কালমার মনে করেন, ‘ইউরোপে ইসলামের প্রকাশ হয়। কিন্তু জনমনে নতুন কোনো ধর্ম ও আইডিওলজির উপস্থিতি বা পরিবর্তনকে ইউরোপ ও বহিরাগতদের মধ্যকার বিভেদ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। বরং এই উপস্থিতি ছিল একেকজন খ্রিস্টনের ভেতর প্রকাশিত ফাঁলের মতো। অর্থাৎ প্রত্যেকের ভেতরে পরিবর্তন হচ্ছিল; কারো ভেতর ইতিবাচক কারো ভেতর নেতিবাচক। কিন্তু তা ব্যক্তিকপর্যায়ে। জাতীয়ভাবে এটাকে ফেনোমনো তৈরি করেনি।’

এই অবস্থা স্থায়ী হয়নি। যখন উসমানি সাম্রাজ্য কসোবো যুদ্ধে জয়লাভ করে। এবং ১৩৮৮ সালে ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করে। তারপর ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপলের পতন হয়। কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর খ্রিস্টান আর মুসলিমদের মধ্যকার সম্পর্ক খুবই নাজুক হয়ে পড়ে। অনতিক্রম্য সংকটে পড়ে যায় মুসলিম ও খ্রিস্টবিশ্ব।

পরবর্তীতে কনস্টান্টিনোপল বিজয় নতুন ইউরোপ তৈরির সূচনা করে। এই ইউরোপ হলো ধর্মীয় রীতিনীতি ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক মহাদেশ। এটা হবে খ্রিস্টানদের মহাদেশ। এরই ধারিবাহিকতায় ক্যাথলিক রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রানি ইসাবেলা স্পেন ও পর্তুগাল থেকে ইহুদি ও মুসলিমদের তাড়াতে শুরু করেন। খ্রিস্টানরা পশ্চিমে তাদের অবস্থান দৃঢ় করে। এবং মুসলিমরা প্রাচ্যে তাদের উপস্থিতি যথারীতি বজায় রাখে।

এই সংবেদনশীল ও সংস্কারের সময়ে সহিংস আন্দোলন হিসেবে ১৫৪৪ সালে মার্টিন লুথার ইসলামকে সহিংস আন্দোলন হিসেবে বিবেচনা করেন। তার মতে, ইসলাম খ্রিস্টবিরোধী কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কসুর করেনি।

এই সহিংস আন্দোলনকে একমাত্র অনুরূপ সহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিহত করা সম্ভব বলেই মনে করে মার্টিন লুথার।

ক্রোয়েশিয়ার তৎকালীন লেখক বার্থলোমিউ তার কালজয়ী Mesriz and Triplations of the Christians বই রচনা করেন। এবং এটা তৎকালীন সর্বাধিক বিক্রিত বই ছিল। এটাকে বর্তমান-মানদণ্ডে সচিত্র উপন্যাস বলা যেতে পারে। এই বইয়ের চিত্রে দেখানো হয়, মুসলিমরা ইউরোপে বন্দিদের নির্যাতন করছে। নারী ও শিশুদের হত্যা করছে। অন্যদিকে ইউরোপে তখন নিরক্ষরতার বিপদ চরম শিখরে। এই বই ব্যাপক আকারে প্রচারিত হয়। মুসলিমবিরোধী প্রচারণায় বইটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় খ্রিস্টবিশ্বে।

পরবর্তী শতাব্দীগুলোতেও ইসলামকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরার প্রয়াস দেখা যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রমগুলো ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে উত্তেজনাকর বিভিন্ন সচিত্র সাহিত্য ও রম্যসাহিত্যের ট্রাডিশন গড়ে তোলে। অনেক সময় এ ধরনের কার্যক্রমে মুসলিমদের তুর্কি, মোরো ও সারাসিন নামে উল্লেখ করা হয়। ভলতেয়ার ইসলামকে থিওক্রেসি ও স্বেচ্ছাচারী, শেক্সপিয়র মোরোদের হিংস্র, হেগেল ইসলামি সভ্যতাকে প্রাণহীন হিসেবে চিহ্নিত করে। ফ্রান্সিস দার্শনিক মনটেস্কু তো বলেন, স্বৈরতন্ত্রই ইসলামি ভূখণ্ডে শাসন প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম। হেগেল আরও একধাপ এগিয়ে বলেন, ইসলাম বিজ্ঞানসম্মত নয়। মুসলিমরা নতুন নতুন চিন্তার সাথে চলতে অক্ষম।

পশ্চিমা একাডেমিয়ার বিজ্ঞানীরা আজও এ ধরনের অবৈজ্ঞানিক ও পশ্চাদপদ ট্রাডিশনে ডুবে আছে। স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন, এলি কেদুরি, ডেনিয়েল ও বার্নাড লিউসের মতো ইউরোপের খ্যাতিমান দার্শনিকরা তাদের পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া এই গন্ধময় উত্তরাধিকার রক্ষায় সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। 'ইসলাম পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য হুমকি'– এই তত্ত্ব প্রচারে পাশ্চাত্যের মৌলিক ভূমিকাকে যদিও ভুলে থাকার অপপ্রয়াস করেছে, তাদের এসব কর্মকাণ্ডের ফলে মুসলিম সমাজ ইসলামোফোবিয়ার মূল শেকড় সন্ধানে ব্যর্থ হয়।

প্রসিদ্ধ মার্কিন দার্শনিক ও লেখক হ্যাম হারিস বলেন, 'আমাদের সমস্যার মূল জায়গাটি যদি আমাকে কেহ নির্ধারণ করতে বলে, তবে আমি বলবো, ইসলামি বিশ্বই আমাদের মূল সমস্যা। আমরা এখন সভ্যতার সংঘাতের মধ্যে আছি।

বিভিন্ন মানদণ্ড নির্ধারণ করে আমরা মূলত আমাদেরই প্রবঞ্চিত করছি। কখন কোনটি ইসলাম ও মুসলিম-বিদ্বেষ হচ্ছে, তা নির্ধারণ করে দূর করার প্রয়াস একান্তই অবান্তর। বরং পাশ্চাত্য সভ্যতায় এর সন্ধান মিলবে বহু শতাব্দী পূর্বে।'

আমরা যদি ইসলামোফোবিয়ার মূল কাঠামো ও প্রকৃতির মূলে পৌঁছতে না পারি। আমরা কিছুতেই কার্যকর কোনো প্রতিবিধান করতে পারব না। ইসলামোফোবিয়া শুধু বর্ণবাদী কিছু কর্মকাণ্ড নয়। বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী হাত বদল হয়ে এটা আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার অবিভাজ্য নীতি বনে গেছে।[৫১]

---

[৫১] সম্পূর্ণ লেখাটি মুসলিম হান্ট অবলম্বনে রচিত

আইন ও ইসলামোফোবিয়া

হাবিবুর রহমান রাকিব

চেতনার মশাল জ্বেলে অচেতন হয়ে পড়া যেন হাল আমলের ব্যাধি। সবটা দোষই কি অবচেতন মনটার? সভ্যতা, মানবতা, গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা কোনো বিষয়ে অপরের ক্ষেত্রে যখন তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে কদাকার হায়েনার আকৃতি নেয় তারাই তো নিজেদের বেলায় ভেজা বেড়োলের রূপ ধরে অনায়াসেই মিউ মিউ করতে কিঞ্চিত কুণ্ঠাও বোধ করে না। করবেই বা কি করে, মজ্জাজুড়ে যে লজ্জার ছিটেফোঁটোও তাদের নেই। না থাকারই কথা। লজ্জা তো ইমানের ভূষণ। বেইমানের চোখের বালি। তাই লজ্জার ভূষণে সজ্জিত ইমানদার মানুষগুলোকে নিয়ে তাদের মাথাব্যথার বিরাম নেই। শুধু এক জীবন নয়, সুযোগ থাকলে এমন বহু জীবন তারা "এ মানুষগুলোর ক্ষতিসাধনে বিলিয়ে দিত। মানবতা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, গণতন্ত্র ও জাতীয় সুরক্ষার নামে তারা কী না করেছে! সবকিছুর গোঁড়ায় সেই ইসলাম-বিদ্বেষ। তাই সে -বিদ্বেষ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে নানা তৎপরতার আঞ্জাম দেয় তারা। এসব বিষয়াদি সেই প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। একেবারে নববি যুগ থেকে। তবে পার্থক্য হলো এখন এ -বিদ্বেষ একটি আন্দোলনে রূপ নিয়েছে, হয়েছে ইনস্টিটিউশনালাইজড, পেয়েছে অর্থায়ন এবং বিভিন্ন মহল থেকে জুটেছে মদতদাতা। সব মিলিয়ে পেয়েছে বিশাল এক পরিচয়, বিশাল এক নেটওয়ার্ক। যাকে এককথায় বলা হয়- ইসলামোফোবিয়া।

মদদ, ফুরসত সব যখন ষোলকলায় পূর্ণ তখনই তারা অলীক সব আইনের ছত্রচ্ছায়ায় মেতে উঠলো ঘৃণ্য খেলায়। বর্ধিত সেই কদাকার নখরগুলো বসাতে থাকলো মুসলমানদের শিরা-উপশিরা ভেদ করে। যাতে তারা জর্জরিত হয়, হয়ে যায় লীন। রাজ্যের সব শয়তানির আখড়া, আঁতুড়ঘর, বীজতলা সে ইউরোপ থেকে বরাবরের মতো উৎসারিত ষড়যন্ত্রের এ বিষফোঁড়া পৃথিবীজুড়ে জেঁকে বসলো।

আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরাও যেন তাদের সে তুরুপের তাস। মুসলিম দেশগুলোতেই হচ্ছে অনায়াসে ইসলাম-বিদ্বেষচর্চা। ইসলামের যাবতীয় মৌলিক সৌন্দর্যগুলো আজ বিদ্রূপ ও কটাক্ষের শিকার। ইসলামের

সৌন্দর্যগুলো থেকে মানুষকে বিমুখ করার কিংবা ইসলাম সম্পর্কে মানুষকে বিদ্বিষ্ট করে তোলার এর চেয়ে ভালো কৌশল কী হতে পারে ?

কোনো বিষয়ে মানুষকে বিদ্বিষ্ট করতে কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করা হয়। প্রথমত. অপপ্রচার ও তথাকথিত সচেতনতা। এতে যখন কাজ না হয় তখন আশ্রয় নেয়া হয় আইনের। আইনের মাধ্যমে অর্গানাইজড-বিদ্বেষর্চচা করা হয়। আর আইন প্রয়োগ করে ঘৃণা ও বিদ্বেষর্চচার মতো পৃথিবীতে বোধহয় আর কানো জঘন্য কাজ খুব কমই আছে।

দাড়ি : নীল ছকে নাম লেখাল জাপান। উত্তর-পূর্ব জাপানের ইয়েসাসি শহরে সকল কর্মকর্তাকে দাড়ি রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।[৫২] ৯৮ শতাংশ মুসলিম সংখ্যগরিষ্ঠ দেশ তাজিকিস্তানে দাড়ি রাখায় নিষেধাজ্ঞা বহু আগ থেকে। বিশ্ববিদ্যলয়ে শ্মশ্রুমণ্ডিত ছাত্র অনেক বঞ্চনার শিকার হয়। দুশানবের তাজিক স্টেট পিডাগোগিকাল ইউনিভার্সিটির জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন মির্জাবেক শারিপভ বলেন, দাড়ি তাদের ঐতিহ্য পরিপন্থি; শ্মশ্রুমণ্ডিত ছাত্রের বক্তৃতা দেয়ার অনুমতি নেই, সে আরও বলে ভার্সিটি কোনো মসজিদ না। পুলিশের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যলয়গুলোতে দাড়ি-হিজাব নিষিদ্ধ নিশ্চিত করা হয়। কেউ দাড়ি রাখলে জোর করে তা মুণ্ডণ করা হয়। এমনকি বিগত তিন বছরে (১৫-১৮) তে স্কুলে দাড়ি-হিজাবের নিয়ম ভঙ্গের কারণে ৬ হাজার শিক্ষককে আদালত শাস্তি দিয়েছে এবং বেশ কয়েকজন প্রধান শিক্ষক তাদের চাকরি হারিয়েছেন।[৫৩]

হিজাব: এ যাত্রায় বেলজিয়াম নাম লেখায় সর্বাগ্রে। ২০১১ সালে ইসলামোফোবিয়ার সূতিকাগার ইউরোপ থেকে বেলজিয়াম আওয়াজ তোলে। বোরকা ও নিকাব নিষিদ্ধ। ২০১৭ সালে ইরোপিয়া কোর্ট অব হিউম্যান রাইটস রায় দেয় এ আইন কোনো ধর্মবিরোধী আইন নয়। বুলগেরিয়া ও লাটভিয়া পালে হাওয়া জোগায়। তারাও নিকাব নিষিদ্ধ করে। বুলগেরিয়ায় নিকাব পরিহিতাকে জরিমানা গুণতে হয়। আর লাটভিয়ায় প্রকাশ্যে মাত্র তিনটি নিকাব পড়ার ঘটনা ঘটে। এত অল্প পরিসরে নেকাবের বিস্তৃতি থাকা সত্ত্বেও তারা এ নিয়ে শঙ্কা বোধ করে।

---

[৫২] https://bit.ly/3siVGhp
[৫৩] *www.refworld.org*

অস্ট্রিয়া আর কতদিন পিছিয়ে থাকবে! ২০১৭ সালে প্রকাশ্যে হিজাব পরা নিষিদ্ধ করে আইন পাস করে। পরিহিতাকে মাশুল দিতে হবে ১৫০ ইউরো। যোগ দিল ডেনমার্ক ২০১৮ সালে। তারা ধাপ কয়েক এগিয়ে গেল। ১১৫ ডলার ধার্য হলো প্রথম বারে হিজাব পরিধানের মাশুল হিসেবে। আর মাশুল না দিয়ে অসম্মতি প্রকাশ করলে গুণতে হবে তার দশগুণ।

এবার হালে তাল দিতে চলে এলো নেদারল্যান্ড। স্কুল, হাসপাতাল, গণপরিবহন এবং সরকারি ভবনের মতো পাবলিক প্লেসে হিজাব নিষিদ্ধ করে ২০১৮ সালে। এসব দেশ যদিও রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় হিজাব নিষেধের কোশেশ করেছে। ফ্রান্স সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ ও জাতীয় সুরক্ষার বুলি আওড়ে সর্ব প্রথম ২০০৪ সালে ধর্মীয় পোশাক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাতিল করে। এরপর ২০১০ সালে নিষিদ্ধ করে নিকাব পরিধান। দেশটির বড় বড় মার্কেট থেকে হিজাব-নিকাব ধরনের পোশাক সরিয়ে ফেলা হয় রাজনৈতিক রোষানলের ভয়ে। ফ্রান্সট ফেনন তার Algeria Unveiled নমক রচনায় ফ্রান্সের আলজেরিয়ান উপনিবেশ থেকে নিকাব মূলোৎপাটনের মাধ্যমে তাদের কালচার থেকে দূরে সরানোর বিবরণ মেলে। লেবানিজ বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ান মুসলিম ফ্যাশন ডিজাইনার ২০০৪ সালে মুসলিম নারী সাঁতারুদের আব্রু রক্ষার্থে এক ধরনের বোরকা তৈরি করেন, বাজারে যা বুরকিনি নামে খ্যাত। এতে পর্দার কাজ শতাংশে না হলেও যা হয় তাও বা কম কীসে। এটা মন্দের ভালো। ২০১৬ সালে ফ্রান্সের নগরীগুলো থেকে এ বুরকিনিও নিষিদ্ধ করা হয়। যা ইসলামোফোবিয়া উস্কে দেয়ার মতো বিষয় বলে গবেষকগণ মনে করেন।[৫৪]

কানাডা কাঁধে কাঁধ মেলালো তার কিউবিক রাজ্য দিয়ে। বিল ২১ নামক আইনের মাধ্যমে প্রকাশ্যে হিজাব পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরওপ করে।

এসব কুপ্রভাব মুসলিম বিশ্বকেও ছাড় দেয়নি। নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বা পরিচয় থাক বা না থাক, ওয়েস্ট্রানাইজেশনই যেন আসল পরিচয়। মন তেতো করে দেয়ার মতো, মুখে পুরে দেওয়া সমস্যাটা উগরে ফেলার সাহস, শক্তি আর সদিচ্ছা অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলোর নেই। ৯৮ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যার দেশ তাজিকিস্তানে হিজাব নিষিদ্ধের হিড়িক চলছে[৫৫]। হিজাব পরিহিতাদের বিবাহ

---

[৫৪] The surprising Australian origin story of the burkini", Sydney Morning Herald, 19 August, 2016. Retrieved 21 August 2016

[৫৫] "Tajikistan". U.S. Department of State. Retrieved 14 February 2015

বিচ্ছেদে বাধ্য করা হচ্ছে। হিজাব পরিহিতাগণ চিকিৎসা, কর্মসংস্থান, বিশ্ববিদ্যালয়সহ নানা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যদিও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি অনুযায়ী সেখানে এ জাতীয় কোনো আইন নেই, তাও এসব সরকারের পক্ষ থেকেই বাস্তবায়ন হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ কেন এসব নিষেধাজ্ঞা আরওপ করছে তা দায়িত্বশীল সকলেই সন্তর্পণে এড়িয়ে গেছে। [৫৬]

আজান : ভারতের এলাহাবাদ হাইকোর্টে রায় হয়েছে– মসজিদে মাইকে বা লাউড স্পিকারের মাধ্যমে আজান প্রচার বন্ধে। আজান হতে পারবে মুখে মুখে। মাইকে আজান দিতে হলে আইন অনুযায়ী জেলা প্রশাসনের পূর্ব অনুমতি লাগবে।[৫৭] বিনোদনের নামে যাবতীয় উল্লাস ও শব্দদূষণের অনুমতি থাকলেও ধর্মের স্বার্থে উঁচু আওয়াজ ব্যবহার করার অনুমোদন নেই। তবে সব ধর্মের বেলায় এ নিষেধাজ্ঞা সমানভাবে প্রয়োগ হয় না। কেবল ইসলামই এজাতীয় আচরণের প্রধান শিকার ।

মিনার : ইসলামি ঐতিহ্যের অন্যতম হচ্ছে মসজিদ। নবিজি সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন মসজিদকে কেন্দ্র করে। মসজিদে নববি। মুমিনের প্রাণের গহীনের আরাধ্য। প্রিয়নবি নিজ হাতে মসজিদ নির্মাণের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। গম্বুজ, মিনারা মসজিদের পরিপূরক। পথিক অপরিচিত স্থানে গম্বুজ-মিনারা দেখে মসজিদ চিনতে পারে সহজে। রবের পানে ছুটে যাওয়ার নিবিড় আশ্রয় খুঁজে পায়। ইথারে ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহু আকবার ডাক। চমৎকার এক ইবাদতগাহ সম্পর্কে জানতে পারে সমাজ।

ইউরোপজুড়ে ইসলামি নিদর্শনসমূহে তালা দেয়ার কত টালবাহানা। আধুনিক বিশ্বের চমক, সৌন্দর্য্যের উপমা সুইজারল্যান্ড দিয়েই এ খেলা শুরু। সুইজারল্যান্ডজুড়ে ১৫০ টা মসজিদের মাত্র চারটিতে মিনার রয়েছে, আরও দুটির পরিকল্পনা চলাকালে তারা এ আইন করে। সুইস সংবিধানে ধর্মের স্বাধীনতার গ্যারান্টি রয়েছে।[৫৮] তাহলে ইসলামের স্বাধীনতার বেলায় এরূপ বৈরিতা কেনো?

নাগরিকত্ব : আল্লাহ তায়ালার জমিন প্রশস্ত। পুরো বিশ্বকেই একজন মুসলিম তার স্বদেশ মনে করে। জলবৎ তরলং– এ বিষয়টা আজ তিতকুটে হয়ে

---

[৫৬] *www.refworld.org*

[৫৭] *www.hindustantimes.com*

[৫৮] *www.nytimes.com*

গেছে। চলছে খোদার ওপর খোদকারি। স্রষ্ঠানুভূতিহীন উজবুকের দল আল্লাহ তায়ালার জমিনে তাঁরই বান্দার ওপর জুড়ে দিচ্ছে নানা শর্তের বোঝা। কোণঠাসা করার নানা অপচেষ্টা, ভূমিহীন করার পাঁয়তারা। হাজার বছর মুসলিম শাসিত দেশ ভারত; ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ীও যেখানে দ্বিতীয় বৃহত্তর জনসংখ্যা মুসলমান। ১৭.২২ কোটি যা মোট জনসংখ্যার ১৪.২ শতাংশ[৫৯]। গত ১৯ সালে সেখানে মোদি সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল Citizenship Amendment Bill (CAB) পাস করে। রাজনৈতিক সমালোচকগণের মতে, বিলটি মুসলমান জনগোষ্ঠীকে কোণঠাসা করতে বিজেপির এক ধূর্ত এজেন্ডা। নাগরিত্বের আবেদন করতে হলে মুসলিমকে দেখাতে হবে সেখানে ১১ বছর ধরে বসবাসরত আর হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি এবং খ্রিস্টান নাগরিকত্বের আবেদন করতে তা দেখাতে হবে ৬ বছরের নিবাসকাল। অথচ ধর্মনিরপেক্ষ দেশটিতে ধর্মীয় বৈষম্যকে টেনে-হিঁচড়ে আনার চেষ্টা বিজেপি বারবারই করেছে। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে প্রথম এ বিলটি বিধান কক্ষে উত্থাপিত হয়। নিম্ন কক্ষ পার করতে পারলেও উচ্চ কক্ষ থেকে এটি বাতিল হয়ে যায়। পরবর্তীতে ২০১৯ সালে বিলটি পাস হওয়ার পর দেশ থেকে মুসলমানদের কোণঠাসা করতে এনআরসি (National Register of Citizens-NRC) তারা প্রকাশ করে, যদিও কিছু দিন না যেতেই তারা এটাকে ত্রুটিযুক্ত বলে দাবি করে, যখন বুঝলো থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে সত্যকে আর কতদিন ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায়, সত্য আপন শক্তিতে উদীয়মান হয়। দেখা গেল সে এনআরসির তালিকা থেকে বিজেপির অনেক হিন্দু ভোটার বাদ পড়েছিল, যারা ভারতের বৈধ নাগরিক নয়। ফলে তারা বাধ্য হয়ে সমস্যাটি বেশিক্ষণ চাপিয়ে জিইয়ে রাখার সুযোগ পেল না। গিলে ফেলতে বাধ্য হলো।

কুরবানি : ক্ষমতার চেয়ার পোক্ত করতে মোদি 'পিঙ্ক রেভুলেশনে'র চাল চালে। গরু জবাই বিষয়ে কংগ্রেসকে দায়ী করে হাতিয়ে নেয় জনগণের মনতুষ্টি তা নাকি পশু ধ্বংস করছে। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে জনসমর্থন লাভ করতে 'যাদব' সম্প্রদায়কে গোলাপি বিপ্লব দ্বারা প্ররোচিত করে। যারা পশু পালনের জন্য বিখ্যাত এবং মুসলমানদের সাথে তাদের সম্পর্ক বেশ উষ্ণ। ফলে এ সম্পর্কে চির ধরে। মোদি দাবি তুলে বলে 'আমরা সবুজ বিপ্লব সম্পর্কে জানি, শ্বেত বিপ্লব সম্পর্কে জানি; কংগ্রেস তাতে আগ্রহী

না হয়ে আগ্রহী হলো গোলাপি বিপ্লবে' তথা গরু জবাই ও তার মাংস বাণিজ্যে। 'কৃষক-পশু পালক কংগ্রেস কোনো ভর্তুকি পায় না পায় গরু জবাইকারী।' একথা বলে মদি আরও ঘি ঢেলে দিলো আগুনে, বাগিয়ে নিলো কৃষক-পশুপালক জনগণ, তাদের চির ধরালো মুসলিমদের থেকে।[৬০]

এছাড়াও ইন্ডিয়ার ৬৮তম 'রিপাবলিক ডে'র প্যারেডে দিল্লিতে মোদি পিঙ্ক কালারের ওড়না মাথায় গুঁজে হাজির হয় এবং পরবর্তীতে তা টুইট করায় বিশাল সংখ্যক নারী সমর্থক তার তৈরি হয়।[৬১]

অথচ আরজেডি সভাপতি লালু প্রসাদ মোদির সমালোচনা করে বলেন "নরেন্দ্র মোদি বকওয়াস করে চলছেন, প্রত্যেকে তো দেখতেই পাচ্ছে সে (পিঙ্ক রেভ্যুলেশনের নামে পশু দরদ দেখালেও) চামড়ার তৈরি স্যান্ডেল ও জুতো পরেন (তাহলে এ মায়াকান্নার কোন মানে আছে।)"[৬২]

গো-রক্ষার নামে ইসলাম-বিদ্বেষে ঘি ঢেলে দিল। ভারতীয় সংবিধানের ৪৮ নং আরটিকেল অনুযায়ী রাজ্য সরকারকে গরু-পশু কুরবানি নিষিদ্ধ করতে
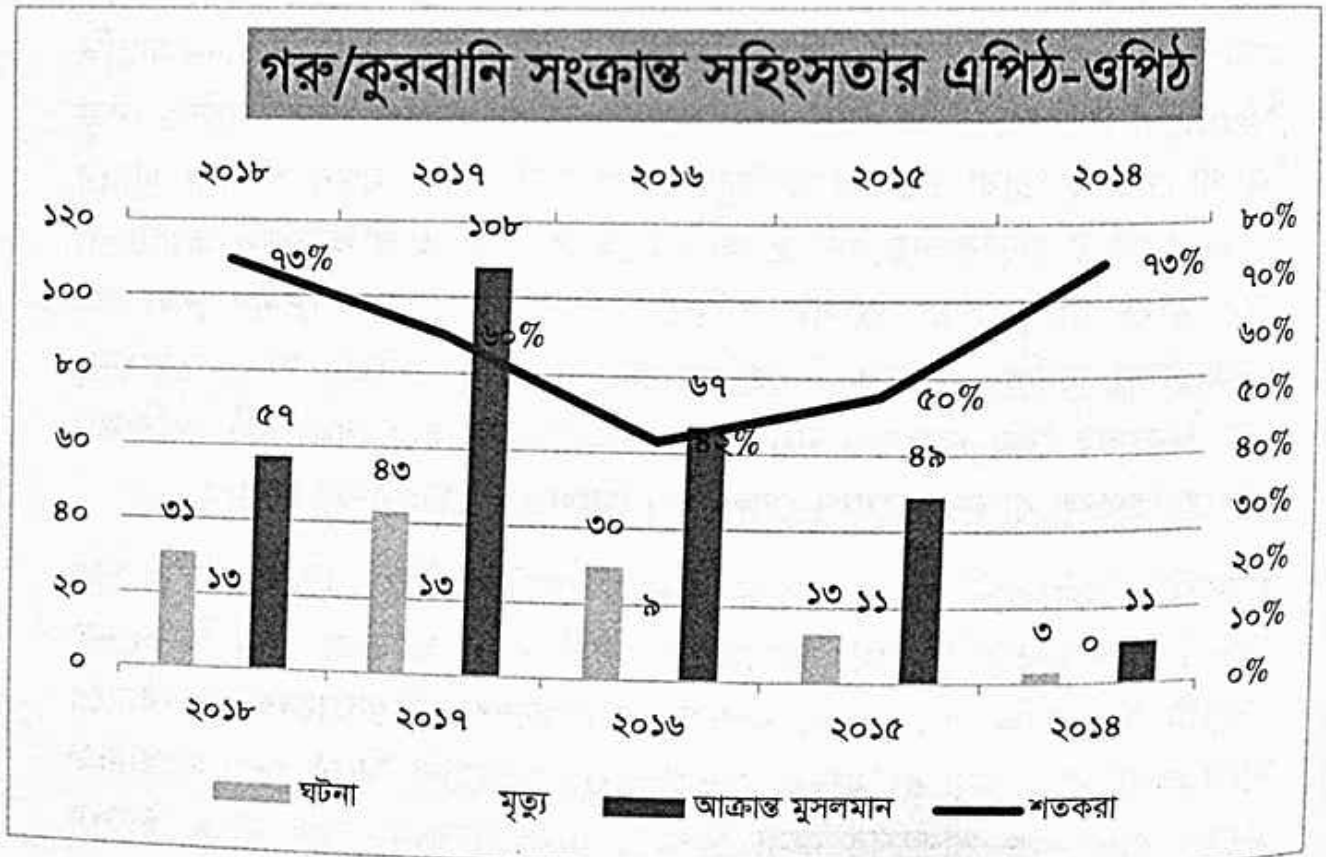
[৬০] www.thehindu.com

[৬১] www.hindustantimes.com

[৬২] *economictimes.indiatimes.com*

ক্ষমতায়ন করা হয়। সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ানের বিবৃতিতে ফুটে উঠেছে বিজিপি পরিচালিত অনেক রাজ্যে গরু কুরবানির ওপর নিষেধাজ্ঞা কঠোর ও এর মেয়াদ দীর্ঘতর করা হয়েছে মোদি সরকার ১৪ সালে ক্ষমতারোহণের পর থেকে। ভারতের ৮৪ শতাংশ এলাকায় ২০১৭ সালে এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল, যা মোট জনসংখ্যার ৯৯.৩৮ শতাংশ-এর উপর আরোপিত হয়।[৬৩] ভারতজুড়ে এ শয়তানি খেলার মদতদাতা বিজেপি ও আরএসএসএর মতো সাঙ্গপাঙ্গরা। গুজরাটে বিজেপি সদস্য বিজয় রুপানি "গরু কুরবানি ও তার গোশত বহন করা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডীয় অপরাধ" বলে মনে করিয়ে দেয়। 'গো রক্ষক' পরিচয়ে 'গো রক্ষা'র নামে তারা আইন হাতে তুলে নেয়। হামলে পড়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর। এসব আক্রমণের প্রায় ৯৭ ভাগই মোদি সরকার ক্ষমতারোহণের পর ঘটে। অপরদিকে ঘটনাগুলোর প্রায় অর্ধেক বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলোকে কেন্দ্র করে। ২০১৮ তে ঘটনার ৭০ শতাংশ, ২০১৭ তে ৭০ শতাংশ, ৫৩.৫ শতাংশ, ২০১৬ তে ৩১ শতাংশ, ২০১৫ তে ৩৩.৩ শতাংশ ঘটেছে বিজেপি ক্ষমতায় থাকা অবস্থায়।

শরিয়াহবিরোধী আইন ও সংস্থা : শরিয়াহ আইন। কুরআন-হাদিস বর্ণিত জীবনব্যবস্থা। ২০১০ থেকে শরিয়াহবিরোধী আইনের ঝড় শুরু হয়। যার হর্তাকর্তা ও গডফাদার হিসেবে আছে আমেরিকান ফ্রিডম ল সেন্টার-এর কো-

ফাউন্ডার ও সেন্টার ফর সিকিউরিটি পলিসির উপদেষ্টা ডেভিড ইয়রোশালমি। বিস্তারিত দেখতে গেলে এটি আমেরিকার মুসলিম-বিরোধী আইনি সংস্থা অ্যাক্ট ফর আমেরিকার দীর্ঘমেয়াদি ষড়যন্ত্রের সফলতম রূপ। ২০১০ থেকে ১৭ পর্যন্ত ২০১টির মতো শরিয়াহবিরোধী আইন প্রণীত হয় যার ১৪টি কার্যকর হয়েছে আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে। শরিয়াহবিরোধী এ আইনগুলো
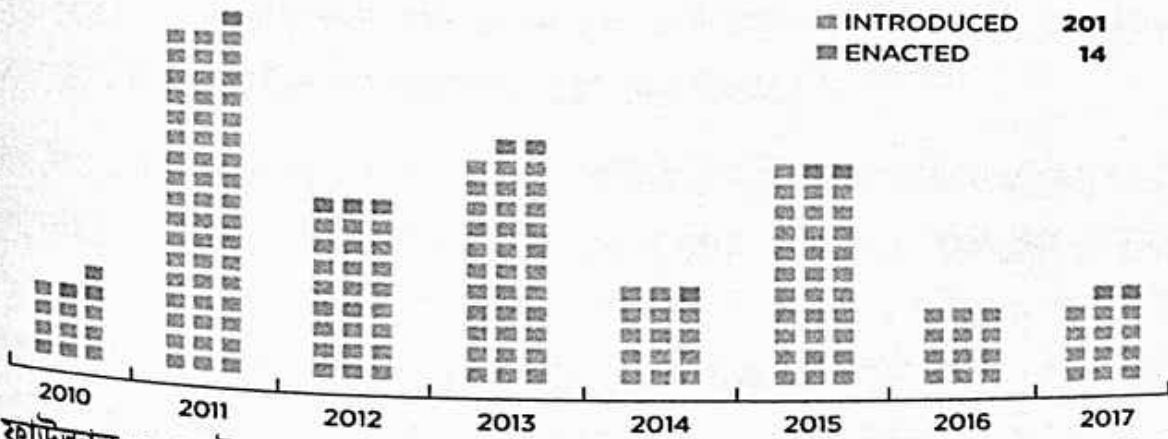
[৬৩] CSSS, "A Narrowing Space," 12.

এন্ডি'স ল নামে খ্যাত। মার্কিন সেনা পিএসির সদস্য এন্ডির পুরো নাম William Andy Long যে আল-কায়দা দ্বারা উদ্বুদ্ধ আরব উপদ্বীপের এক ব্যক্তির হাতে ২০০৯ সালে নিহত হয়।

এছাড়াও আরও যেসব সংস্থা ইসলাম-বিরোধী নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর তারা হলো আমেরিকান পাবলিক পলিসি এলায়েন্স, সোসাইটি অব আমেরিকানস এন্ড ন্যাশনাল এক্সিসটেন্স, স্টপ ইসলামাইজেশন অব আমেরিকা, আমেরিকান ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ, ডেভিড হারোইডয ফ্রিডম সেন্টার। ২০১৯ সালে এমন ৮৪টি সংস্থা সাউদার্ন পোভার্টি ল সেন্টার শনাক্ত করেছে, এসব সংস্থার তৎপরতা ও শয়তানি বিস্তারিত জানতে, তাদের প্রণীত আইন ও তাৎপরতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে টীকা সংযুক্ত লিংক থেকে ঘুরে আসুন।[৬৪]

---

[৬৪] www.splcenter.org

শিক্ষাঙ্গনে ইসলামোফোবিয়ার ভয়াল চিত্র

হাবিবুর রহমান রাকিব

পাথরে ফুল ফোটানো যেমন অসম্ভব তেমন পাথরের অঙ্কন মুছে ফেলাও যেনতেন কথা নয়। তাই যত্ন সহকারে অতি সন্তর্পণে পাথরে খোদাই করে খাদ মেশানোর কাজে অনেকেই নিয়োজিত। সেই খাদ কি আর বাদ দেয়া যায় পরবর্তীকালে!

বলছিলাম ছোট্ট ছোট্ট শিশুদের মনে বিদ্যঙ্কনের নামে যে মিথ্যাঙ্কন চলছে বিশ্বজুড়ে তা ভয়াল রূপ ধারণ করছে প্রতিনিয়ত। আরবি প্রবাদ বলে– ছোট্ট হৃদয়ে বিদ্যঙ্কন তো পাথরে অঙ্কনের ন্যায়, বিশ্বনবির ভাষ্যমতে, প্রতিটি কচি শিশুই সহজাত ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীতে সে তার পিতা-মাতার মাধ্যমে দেখে দেখে অন্য ধর্মে দীক্ষিত হয়। আর এখন তো চলছে অতি সূক্ষ্মভাবে বিভিন্ন পয়জন মস্তিষ্কে পুশ করার নানান কায়দা। বিদ্যলয় এখন সেই সহজাত ফিতরাতকে লয় করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনে এগিয়ে থাকছে সবার চেয়ে বেশি।

বলছিলাম চলমান শিক্ষাঙ্গনের কথা। যেখানে পিতামাতা সন্তান সপে দিয়ে ভারমুক্ত হয় তাদের মস্তিষ্কের সুষ্ঠু বিকাশের আশায়। অথচ সে মস্তিষ্কের হয় দুষ্টু বিকাশ। শিক্ষার ফল যদি এমন তেতোই হয় তাহলে তা থেকে দূরের সভ্যতার নাম-গন্ধহীন মানুষগুলোই তো ঢের উত্তম।

বর্ণবৈষম্যমুক্ত শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। শিক্ষাঙ্গনে জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের বিচরণ অতি উত্তম। কারণ আল্লাহ তায়ালাই বলেছেন : যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান? তবে সে জানা যদি হয় অজানার থেকে ভয়াবহ, যদি শিক্ষার নামে মস্তিষ্কে অশিক্ষা-কুশিক্ষা বাসা বেধে নেয় তবে তাতে কোনো রকমের বড়াই থাকে না। সচেতন মুসলিম হিসেবে এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকা জরুরি যে শিক্ষার্থী শিক্ষাঙ্গনে তার ফিতরাত হারিয়ে ফেলছে কি না? নবিজির সেই হাদিস স্মরণ করুন। (ফিতরাতের হাদিস)

এবারে বিদ্যার্থীদের মনে বা সর্বের ভেতরে কতটা ভূত ঢোকানো হলো তা খতিয়ে দেখা যাক। বাচ্চা-কাচ্চাদের মননে মিথ্যের দাবদাহ জ্বালানোর জন্য আছে নানা রকমফের।

ডেনিশ সরকারের নতুন আইন, পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর শিশুদের প্রতি সপ্তাহে ২৫ ঘণ্টা সময় সরকারি তত্ত্বাবধানে রাখা হবে, পিতা-মাতা থেকে আলাদা করে। তাদের সে সময় ডেনিশ মূল্যবোধ, পশ্চিমা কালচার এবং ডেনিশ ভাষা শিক্ষা দেয়া হবে বলে দাবি করা হয়। মূলত তাদের ডেনমার্কের সেকুলার ভাবধারা ও পশ্চিমীকরণেই তাদের খেয়াল। পিতা-মাতা এ শিক্ষায় না পাঠালে দেয়া হয় কঠোর সাজা। মূলত মুসলিম এলাকাগুলো ডেনিশ সরকারের মাথাব্যথার কারণ। তাদের মাধ্যমে যাতে কোনো আদর্শ আবার না ছড়িয়ে যায়। [৬৫]

বিশ্ব-মোড়ল, শিক্ষায় স্ট্যান্ডার্ড দাবিদার খোদ আমেরিকায় রয়েছে শিক্ষা বৈষম্য। সুষম শিক্ষার পরিবেশ তারা এত বছর ধরেও প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নানা সংগ্রাম পরিলক্ষিত হলেও তা সর্বাংশে আলোর মুখ দেখতে পায়নি। ১৯৫১ সালের ঘটনা। ক্যানসাস অঙ্গরাজ্যের রাজধানী তোপেকা। সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ স্কুল শিক্ষার্থী অলিভার ব্রাউনসহ আরও এগারোটি কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারের শিশুর নিকটবর্তী স্কুলে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়নি। ফলে তারা সেখানকার তোপেকা শিক্ষা বোর্ডের ওপর রাজ্য আদালতে মামলা করে। যেটি কার্যকর হয় ১৯৫৪ সালে। এ মামলাটি Brown v. Board of Education of Topeka নামে পরিচিত। বোর্ড যদিও ঘোষণা দেয়, রাজ্য স্কুলে কোনো রকম বৈষম্য 'পৃথক তবে সমান' ধারণাটি শিক্ষাগণ সুবিধার জন্য অসাংবিধানিক, তবে ১৪ পৃষ্ঠার এ রায় স্কুলগুলোতে জাতিগত নানা বৈষম্য বন্ধের কোনোরকম রূপরেখা বাতলে দেয়নি। উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়ায় ১৯৫৫ সালে কোর্ট পুনরায় সিদ্ধান্ত জানায় যা '*Brown II*' নামে পরিচিত। এখানেও কোর্ট শুধু 'অনতি বিলম্বে বৈষম্য দূর করার আদেশ দেয়।'[৬৬]

১৯৬৪ সালে সিভিল রাইটস অ্যাক্ট করা হয় আমেরিকান শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বিক বৈষম্য দূর করার জন্য। সে যাত্রায় অনেক শিক্ষা গ্যাপ ফুটে ওঠে। এবং তা সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা করা হয়। যদিও তা এখনো খুব প্রাথমিক

---

[৬৫] www.politico.eu

[৬৬] Brown v. Board of Education, 98 F. Supp. 797, 798 (D. Kan. 1951), rev'd, 347 U.S. 483 (1954

অবস্থায় বিরাজ করছে। মুসলিম শিক্ষার্থীরা স্কুলে নানা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির শিকার হয়। এফবিআইর রিপোর্ট অনুযায়ী– ২০০০ সালে -বিদ্বেষমূলক আক্রমণ ছিল ২৮টি। ৯/১১-র পর ২০০১ সালে এ -বিদ্বেষমূলক ঘটনার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৮১টি। তাও শুধু রিপোর্টকৃত ঘটনা। দৃষ্টির অগোচরে এমন কত ঘটনা ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। [৬৭]

অসংখ্য গবেষণায় ফুটে এসেছে, মুসলিম শিক্ষার্থী স্কুল-কলেজে বিভিন্ন ছাত্র, শিক্ষক, প্রশাসন এবং অন্যান্য দায়িত্বশীলদের মাধ্যমে যে পরিমাণ বৈষম্যের শিকার হয় তাতে শিক্ষাঙ্গন এখন বিরাটাকার ঝুঁকির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইনস্টিটিউট ফর সোস্যাল পলিসি এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং- আইএসপিউর রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষাঙ্গনে মুসলিম শিক্ষার্থীরা অন্যান্য শিক্ষার্থীদের তুলনায় চারগুণ বেশি নিন্দার শিকার হয়।

অক্টোবর ৩০, ২০১৬ সাল। ক্যালিফোর্নিয়ায় ১১-১৮ বছরবয়সি ১০৪১ জন সরকারি-বেসরকারি স্কুলের মুসলিম শিক্ষার্থীকে নিয়ে একটি জরিপ করা হয়। CAIR পরিচালিত এ সার্ভেতে ফুটে উঠে ইসলামোফোবিয়ার ভয়াল রূপ। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ২৬ শতাংশ শিক্ষার্থী সাইবার বুলিংয়ের স্বীকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ৫৭ শতাংশ শিক্ষার্থী সমবয়সিদের থেকে ইসলাম-বিদ্বেষী আক্রমণাত্মক মন্তব্যের শিকার। ৩৬ শতাংশ মেয়ে তাদের হিজাব নিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার। শুধু ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী তাদের সমস্যা থেকে পরিত্রাণের পথ পেয়েছে। অনেকে অভিযোগ করেছে, মুসলিম পরিচয়ের ফলে তাদের একঘরে করে ফেলা হয়েছে।[৬৮]

এহেন বৈষম্যের ফলে, প্রতি তিনজন শিশুর একজন অন্যদের নিকট নিজের মুসলিম পরিচয় প্রকাশ করতে চায় না। প্রতি ছয়জনের একজন বিপদাশঙ্কায়

---

[৬৭] Saylor, C. (2014). The U.S. Islamophobia Network: Its funding and impact. Islamaphobia Studies Journal, 2(1), 99-117

[৬৮] Britto, P. R., (2011, September). Global battleground or school playground: The bullying of America's Muslim children. Retrieved from

নিজেকে অমুসলিম হিসেবে জাহির করে।[৬৯] শিক্ষাঙ্গন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রতিফলন ক্ষেত্র। সেখানে ইসলাম বিদ্বেষচর্চার ফলে জাতি-বিদ্বেষ এবং অসমতাই কেবল উস্কে দেয়া হয় না বরং মেধা-মনন গঠনে পরোক্ষভাবে জাতীয় উন্নয়নকে করা হয় বাধাগ্রস্ত।

দৃশ্যায়ন : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫। ইরভিং টেক্সাসের ম্যাকঅর্থার উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঘটে যায় এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। স্কুলের সুপরিচিত 'ইনভেন্টর কিড' লকব প্রাপ্ত ১৪ বছরের মুহাম্মাদকে কেন্দ্র করেই সে ঘটনা। ঘটনার পূর্বে বলে নেই, অসাধারণ মেধাবী একজন ছাত্র মুহাম্মাদ। সুদানী বংশোদ্ভুত মুহাম্মাদের ঝোঁক ছিল ইলেকট্রনিক্সে। বাড়িতে তৈরি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি প্রায়ই সে স্কুলে নিয়ে আসত শিক্ষক ও বন্ধুবান্ধবদের দেখাতে আর স্কুলের ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি ঠিক করার জন্যও আনত। তাই বন্ধুরা তার লকবজুড়ে দেয় ইনভেন্টর কিড বা উদ্ভাবনী শিশু। দিন দিন মুহাম্মাদ হয়ে ওঠে বিশ্বনন্দিত। তার দক্ষতা ও নিপুণতার প্রমাণস্বরূপ নাসা (NASA), গুগল (GOOGLE), ফেসবুক (FACEBOOK) এমনকি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের তরফে তার জন্য আসে নিমন্ত্রণপত্র।

একদিনের ঘটনা। বরাবরের মতই মুহাম্মাদ বাড়িতে তৈরি একটা ঘড়ি নিয়ে এসে স্কুলে হাজির। তার স্বভাবসুলভ কৌতূহল। এত যত্নের-কষ্টের যন্ত্রটি ঠিকঠাক হলো কি না! কিন্তু এবার তা কাল হয়ে দাঁড়াল। ইংরেজি ক্লাসে যখন যন্ত্রটি বিপ বিপ শব্দ জুড়ে দিল শিক্ষক ঘাবড়ে গেল। যন্ত্রটি বাজেয়াপ্ত করে প্রিন্সিপ্যালের নিকট নালিশ করল। বড়ো অদ্ভুত সে নালিশ! তার তৈরি এ ঘড়িটি নাকি বোমার মত; এক ধরনের বোমা। এ ষড়যন্ত্রে শিক্ষককে ভড়কে দেয়ার চেয়ে বেশি ইন্ধন জুগিয়েছে 'মুসলিম শিশুর মেধার প্রখরতা ও উত্থান' নিয়ে কিছু লোকের হিংসা। পুলিশ এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছোট্ট এ বাচ্চাকে জেরা করে। পুলিশ যদিও বুঝতে পারে মুহাম্মাদের কোনো দোষ নেই, নেই কোনো কুমতলব; তবুও তাকে আটক করে রাখে। তার পরিবারের পোহাতে

---

[৬৯] yaqeeninstitute.org

হয় নানা ভোগান্তি, মুহাম্মাদের প্রিয় বন্ধুদের রেখে সে স্কুলটি ছেড়ে দিতে হয়। [৭০]

আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্য টিনেসাসের রাজধানী নাশভিল। নাশভিলের অন্যতম জাতীয় দাতব্য স্কুল নিউ ভিশন একাডেমি। নভেম্বর ২০১৭। কোনো একদিন ক্লাসে এক কিশোরী দুঃখজনক এক ঘটনার শিকার হয়। ক্লাস চলাকালে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তার হিজাবে আবৃত চুল নিয়ে নানা প্রকার কু মন্তব্য করে। কটূক্তির মুখে একপর্যায়ে তাকে হিজাব খুলতে বাধ্য করা হয়। ক্লাস চলাকালীন এ ঘটনার কোনো সুষ্ঠু সমাধান করতে কেউ সচেষ্ট হয়নি। যেন এ নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই, যেন খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা। এ নিয়ে প্রতিবাদ বা হস্তক্ষেপের কী-ই বা আছে! ক্লাসে উপস্থিত শিক্ষক পর্যন্ত কোনো প্রকার বাধা প্রদান করেনি এ অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় রোধ করতে। বরং হয়তো পুরো ঘটনাকে খুব উৎসাহভরে উপভোগ করেছে। এতটুকুতেই ঘটনার ইতি ঘটলেও অন্তরদহন কিছুটা লাঘব হতো হয়তো। এরপর যা ঘটে তা আরও পীড়াদায়ক। এক শিক্ষিকা ভিডিও ধারণ করে তার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে। সম্পূর্ণ অনৈতিক এ কাজটা যেন সে খুব মজা নিয়ে করেছে, উপরন্তু সে ভিডিওর শিরোনামে লেখেছে– 'lol all that hair cover up (sic)' উক্তিটি করার মাধ্যমে সে হিজাব পরিধানকে হেয়জ্ঞান করে। সে শিক্ষিকা আরও দাবি করে যে, মেয়েদের চুল খুলে ফেলা অর্থাৎ হিজাব পরিধানে বাধা প্রদান করা তাদের প্রতি কোনো ধরনের অবমূল্যায়ন বা অসম্মান নয়। [৭১]

---

[৭০] Bakali, Naved. (2016). Islamophobia: Understanding anti-Muslim racism through the lived experiences of Muslim youth.

[৭১] Cowen, T. W. (2017, November 13). Complex: Life. Retrieved from Complex

জায়ানিজমের যোগসাজশে ইসলামোফোবিয়া

হাবিবুর রহমান রাকিব

শয়তান প্রতিজ্ঞামত নিজ কারিশমা দেখাতে থাকে নানা বিশৃঙ্খলার জটলা পাকিয়ে। প্রতিটি কাজই যেন নিপুণতায় ঠাসা। সেই আদম আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরবর্তীকালে শয়তান প্রথম মূর্তি তৈরি ও একপর্যায়ে তা উপাস্যে পরিণত করার নীল নকশা কষে। অতি সূক্ষ্ম তার সে চাল কেউ ঠাহর করতে না পারায় সে সফল হয়। মানুষগুলো শয়তানি তালে নাচতে থাকে, হারিয়ে ফেলে নিজ স্বকীয়তা। যুগে যুগে শয়তান খুঁজে নিয়েছে তার দোসর। এখন তার দোসররাই সে কাজগুলোর আঞ্জাম দেয়। তার আর ষড়যন্ত্রের ময়দানে থাকতে হয় না, পেছন থেকে শুধু ছক কষলেই চলে। লিড দেয়াই এখন তার মুখ্য কাজ। প্রতিমা তৈরি ও উপাসনা শুরু থেকে মানুষ বিভিন্ন ধর্মবর্ণে ভাগ হতে থাকে। এর মধ্যে ইহুদিবাদিরাই সবচে আলোচিত-সমালোচিত। দুনিয়াজুড়ে তারা নিজেদের কর্মের স্বাক্ষর রেখেই চলেছে। শয়তানের প্রধানতম দোসর তারা হওয়ার উপযুক্ত। নীল নকশা কষায় তাদের জুড়ি নেই। সেই মুসা আলাইহিস সালামের সময়কার তাদের সে লীলা তো আমরা সবাই জানি। যাক সে কথা। অধুনাকালে এসে ইহুদিদের আন্দোলন এসে অন্য মোড় নিয়েছে। যা জায়ানিজম নামে পরিচিত। থিওডোর হার্জেল প্রতিষ্ঠিত জায়ানিজম অধুনাকালে ইসলামোফোবিয়ার নিরেট ইন্ধন সরবরাহ করছে। মুসলিম-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিতে তাদের বহুমুখী প্রচেষ্টা ও কর্মকাণ্ড চোখে পড়ার মতো।

ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অনেকেরই জানা। যার সাথে জড়িয়ে আছে মুসলিমদের হৃদখণ্ড বায়তুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তিনের জানা-অজানা কতশত করুণ উপাখ্যান। ইসরায়েলের ত্রাণকর্তাগণ ইসরায়েলের প্রতি জনসমর্থন জোগাতে ও ফিলিস্তিনের প্রতি নজরদারি-আইনি বাধানিষেধ বাড়াতে খরচ করেছে ৩০০ মিলিয়ন ডলার! আমেরিকাজুড়ে জঘন্য সব প্রপাগান্ডা, নীতিপ্রণয়ন ও জায়ানিজমের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া শিক্ষাঙ্গন ও কমিউনিটিতে ছড়িয়ে দিতে ব্যয় হয় এসব ডলার।

অর্থায়ন : অতি প্রাচীনকাল থেকেই জায়ানিজমের ত্রাণকর্তাগণ অর্থকে এক প্রকার অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে। ইতমিনানের জন্য একটি উপমা টানা যাক; ফিলিস্তিন নিয়ে মুসলিম বিশ্বের স্বপ্নের সীমা বরাবরই আকাশছোঁয়া। পবিত্র এ ভূমি নিয়ে তাদের নানা চেষ্টার ছাপ আমরা ইতিহাসের পটে পটে অঙ্কিত পাই। ১৯১৭ সালের বেলফোর চুক্তির মাধ্যমে অবৈধভাবে অভিবাসন ফিলিস্তিনের বুকে ইহুদিদের। ১৪ মে ১৯৪৮ এ স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে যেই বিষফোঁড়ার জন্ম হয় তার বিষ বিষাক্ত করে তুলেছে সমগ্র ফিলিস্তিন; বরং আরও সত্য করে বলতে গেলে সমগ্র বিশ্বকে। ফিলিস্তিনের নারী-শিশুদের রক্তঝরা কান্না সারা বিশ্বের মানুষকে আহত করে।

সেই ৪৮ সালেই প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ হয়। আরব সে যাত্রায় হেরে গেলেও ইসরাইলের ব্যাপক বদনাম রটে। এই ইস্যুতে যে দ্বন্দ্ব-কুৎসার সূত্রপাত হয় তা মোচনের জন্য বিখ্যাত ইহুদি লেখক ও আইনবিদ জ্যাকব ইসরায়েল দে হান টাকা ঢালার বুদ্ধি দেয়। সে বলে 'জায়োনিস্টদের ধ্বংস করতে আরব দেশগুলো আজ উত্তেজিত। তবে তাদের পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক উপঢৌকনের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। এই দুর্বলতা তাদের পরাজয় ও দীর্ঘ ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। [৭২]

ইহুদি অর্থ উন্নয়নের স্বপ্নপুরুষ রথসচাইল্ডের দর্শন হলো, এক পাত্রে সব ডিম রাখতে নেই। সে কথার বাস্তবায়ন দেখা যায় দেশে দেশে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সংগ্রামরত দলকে তারা অর্থ দিয়ে সহায়তা করে। ফলে যেই দলই ক্ষমতারোহণ করুক না কেন, ক্ষমতা কুক্ষিগত থেকে যায় সেই জায়ানিজমের হাতেই। ১৯৬০ এর দশক থেকে আমেরিকাভিত্তিক জায়নবাদী সংস্থাগুলো মুসলিম-বিদ্বেষের হালে পানি জুগিয়ে নিজেদের ভিত পাকা করায় লিপ্ত। বর্তমানে সেখানে তাদের ভিত কতটা মজবুত তা বোঝার জন্য ওয়ার্ড স্ট্রিট-এর দৃষ্টান্ত আঁকা যেতে পারে। ওয়ার্ড স্ট্রিট নিউইয়র্কে অবস্থিত স্টক এক্সচেঞ্জ। যেখানে শেয়ার কেনাবেচা হয়। এর মূল সদস্য সংখ্যা ১১০০ জন। ১৯১৫ সালের পূর্বে এ সদস্যদের মধ্যে কোনো ইহুদি জায়গা করে নিতে পারেনি। অথচ বর্তমানে পুরো শেয়ার বাজারই জায়ানিজমের দখলে। এদের

---

[৭২] সিক্রেটস অব জায়ানিজম

অর্থায়নের পেছনে আছে মূলত ১১ জন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তারা নিজেরাও এ টাকাগুলো কামায় ফিলিস্তিন অধিগ্রহণকারী ইসরাইলি বিজনেজ থেকে। একত্রে বলতে গেলে বর্তমানে তাদের এ জোট যা ১০০০০০০০০০০ ডলারের প্রতিনিধিত্ব করে। অথচ এ বিশাল অঙ্ক তাদের ব্যক্তিগত সম্পদের হিসেবের বাইরের। অর্থায়নের মূল হোতাদের এক নজর দেখে নেয়া যাক–

নাম	সম্পদ	সোর্স/ উৎস
কোচ ব্রাদার	১১৫ বিলিয়ন	প্রেট্রোলিয়াম, ক্যামিকাল, এনার্জি, অর্থায়নের নানা ইন্ড্রাস্ট্রি
শেলডন এডেলসন	৩৭.৬ বিলিয়ন	লাস ভেগাসের স্যান্ড ক্যাসিনো গ্রুপ
স্কাসটারম্যান ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন	২ বিলিয়ন	এনার্জি, তেল
ল্যান্ডি এন্ড হ্যারি ব্রাডলেই ফাউন্ডেশন	৬৩০ মিলিয়ন	তেল, অস্ত্র, এনার্জি ও অর্থায়ন
বেক্কার ফাউন্ডেশন	৫৪৮ মিলিয়ন	ইসরাইলি জৈব প্রকৌশল, আকাশযান ও বিভিন্ন শস্য উন্নয়ন
সেথ ক্লারম্যান ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন	৩০০ মিলিয়ন	তেল, তামাক ও এনার্জি
সারাহ স্কেইফি ফাউন্ডেশন	২৭০ মিলিয়ন	তেল, অস্ত্র, গৃহ সমস্যা তৈরি, সরকারকেন্দ্রিক বিতর্ক ও অর্থায়ন
রুসেল বিরাই ফাউন্ডেশন	২০০ মিলিয়ন	গোল্ডম্যান স্যাচেচ এন্ড বিয়ার স্টার্ন ফাইন্যান্সিং

কুরেট ফাউন্ডেশন	১৬৮ মিলিয়ন	ইমার্জিং মার্কেট
মেসকুইটজ ফাউন্ডেশন	৪৭ মিলিয়ন	হাসপাতাল ও ক্যাসিনো ক্রয়-বিক্রয়
ফেইরব্রোক ফাউন্ডেশন	৪০ মিলিয়ন	সফটওয়্যার NC4

ইসলাম-বিদ্বেষ কেন অবধারিত!

জায়ানিজমের রক্ষীরা নিজেদের আখের গোছাতে ও ইসরায়েলের ভিত পাকা-পোক্ত করতে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ায়। এই ঘৃণ্যকাজে তারা অর্থ খরচে কোনো রকম কার্পণ্য করে না। ইসলামোফোবিয়াকে আইনসিদ্ধ করা ছাড়াও তারা বিদ্বেষমূলক ঘটনাগুলো খুব স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে সমাজে চিত্রিত করার কোনো কমতি রাখে না। সর্বোপরি মিডিয়ার দখল তাদের হাতের মুঠোয়। ফলে জনসাধারণের মানসপটে তারা এঁকে দিচ্ছে ইসলাম-বিদ্বেষ একটি চিরাচরিত বিষয়, এটা এমনিতেই অবধারিত; বিদ্বেষ না দেখানোই যেন অস্বাভাবিক। এমনকি তাদের উদ্দেশ্য হাসিলে তারা নিজেদের নাম পাল্টে অন্য ধর্মের পরিচয় বহন করে। অন্য ধর্মের পরিচয়ে জায়ানিজমের পক্ষে কাজ করে। এ ছলচাতুরিতে তারা উভয় দিকের ফায়দা লোটে। স্বার্থও সিদ্ধি হয়, জায়ানিজমও বদনামের কবল থেকে রেহাই পায়। এ পদ্ধতিটা তাদের নিকট 'কাহাল' নামে খ্যাত। কাহালের ভিত্তি হলো ব্যক্তি জায়ানিজমের হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সমাজব্যবস্থার প্রতি আস্থা-আনুগত্য বজায় রাখবে, এ আনুগত্য বজায় রেখে সে যদি ধর্মান্তরিতও হয় তবুও সে ইহুদি বলে গণ্য হবে। জায়ানিজমের মহৎ মিশনের সে সঙ্গী হবে। তাই অন্য ধর্মের হয়েও আমেরিকার মাটিতে কাহাল অনুযায়ী জায়ানিজমের পক্ষে কাজের লোকে লোকারণ্য।

আমেরিকান ফ্রিডম ল' সেন্টারকে অর্থ বরাদ্দ করে জুইস ফেডারেশন, ল' সেন্টারের কাজ হলো দেশজুড়ে মুসলিম কমিউনিটিগুলিতে 'ইসলাম ধর্মীয় পরিচয় কমিউনিটির জন্য এক প্রকার ঝুঁকির বিষয়' এ বার্তা পৌঁছে দেয়া। একদিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসলামোফোবিয়াকে উস্কে দেয়া আর অন্যদিকে ইন্টারফেইথ তথা বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাসযোগ্যতার মেকি বুলি আওড়ে বেড়োনো নিছক উপহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামোফোবিয়া প্রোপাগান্ডায় প্রাথমিকভাবে তারা নিজেদের বিপদের বন্ধু হিসেবে উপস্থাপন করে। নানা

দাতব্য সংস্থা, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ নির্মাণ, রাজনীতিতে নিরপেক্ষতা প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে আস্থা অর্জিত হলেই শুরু হয় আসল খেল। ইসরায়েলকে বৈষম্যের হাত থেকে বাঁচাতে ইসলামোফোবিয়াকে তারা উজ্জীবিত করে। অব্যার্থ মারণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার হয় ইসলামোফোবিয়া।

ইসলামোফোবিয়া! বিশাল একটি মিশনের নাম। যা ইদানীং শুধু ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং বড়ো মাপের এক বিজনেস প্লাটফর্ম। অঢেল অর্থায়ন হয় এর পেছনে। ক্যালিফোর্নিয়ার ইসলামোফোবিয়া স্টাডিজ সেন্টারের এক জরিপ অনুযায়ী বিশাল অঙ্কের এই অর্থায়নের প্রায় ৭০শতাংশ অর্থই আসে ইহুদি ফান্ড থেকে। যা উপরোক্ত চার্চ দেখলেই সহজেই অনুমান করা যায়। আর ইহুদি অর্থ উন্নয়নের দিকপাল ম্যায়ের আমসেল রথসচাইল্ডের কথা তো বাদই দিলাম। যে গোটা ইউরোপকে বারবার রক্তাক্ত করে অর্থ কামিয়েছে। তাই তার অর্থকে বলা হয় 'ব্লাডমানি'। রথসচাইল্ড পরিবার গঠন করে ইতিহাসের সবচেয়ে ধনী আর্থিক সংগঠন 'রেড শেইল্ড'। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে ইসলামোফোবিয়ার পেছনে ৭০ শতাংশ আর্থিক ইন্ধনের মতো বড়ো অর্থায়নও ইহুদিদের নিকট অতি নগণ্য ব্যাপার।

ইন্ধনদাতা সংস্থা

ইসলামোফোবিয়ার চাকা সচল রাখতে তৎপর কিছু জায়ানিজম সংস্থা বেশ পাকা-পোক্ত অবস্থান নিয়ে শিকড় গেড়েছে আমেরিকার মাটিতে। তাদের কর্মতৎপরতা বেশ চোখে পড়ার মতই। প্রস্তুতকৃত নীল ছক ইউএসের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ছে তাদের হাত ধরে। কর্মতৎপরতার কিয়দাংশ-

এডেলসন ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন

২০১১ থেকে ১৩ এ অল্প সময়ে জায়ানিজম সংস্থা এডেলসন ইসলামোফোবিয়ার গতি ত্বরান্বিত করতে ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্কের গ্রুপগুলোকে ১২২৫০০০ ডলার অর্থায়ন করে। ইসলাম ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব তৈরিতে তারা বিভিন্ন কূট কৌশলের দ্বারস্থ হয়। মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে কাজ হাসিল করে। বিভিন্ন ভিডিও নির্মাণ ও তার প্রচার-প্রচারণা তাদের রাহাকে করে দেয় সুগম। ২০০৮ সালের প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনের সময় ক্লারিয়ন প্রজেক্টের মাধ্যমে Obsession: Radical Islam's War Against the West এর ২৮ মিলিয়ন ডিভিডি দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া হয়। এছাড়া আমেরিকান সাবেক স্পিকার নিউইট গিনগরিচ, এডেলসন ফ্যামিলি

থেকে অন্তত ১০ মিলিয়ন ডলার কামিয়ে নেয়, আর ১২ সালের প্রাইমারি প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনের সময় সে বলে 'শরিয়াহ আমেরিকাসহ পুরো বিশ্বে স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের পক্ষে মারাত্মক এক হুমকি।' অপরদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প এ ফাউন্ডেশন থেকে পায় ৩৫ মিলিয়ন ডলার, ট্রাম্প ইসরায়েল পক্ষীয় সর্বোৎকৃষ্ট প্রেসিডেন্ট হবে ধরেই এডেলসন ফ্যামিলি তাকে এত ব্যাপক অর্থায়ন করে।

ইনভেস্টিগেটিভ প্রজেক্ট অন টেরোরিজম

এন্টি ডিফেমেশন লিগ (ADL) তথা মানহানি নিরোধক সংস্থাই ইসলামের মানহানি করার জন্য IPT-কে অর্থায়ন করে! আইপিটি কর্ণধার স্টিভেন ইমারসন হোয়াইট হাউসের সাবেক স্ট্রাটেজিক অফিসার স্টিভেন ব্যানিনের যোগসাজশে নানা কুচক্রের ফন্দি আঁটে। তার মধ্যে ব্যাননের প্রস্তাবকৃত ফিল্ম Destroying the Great Satan : The Rise of Islamic Facism [sic] in America অন্যতম। ১৯৯৫ সালের ওকলাহোমা সিটিতে বোমা বিস্ফোরণের জের ধরে মধ্য প্রাচ্যের ইসলামি দেশগুলোকে হিসেবে no-go zones ঘোষণা রটায়।

জুইস ফেডারেশন

জুইস ফেডারেশন বিভিন্ন দেশে জায়ানিজমের মিশন বাস্তবায়নের অন্যতম এজেন্ডা নিয়ে কাজ করে। উত্তর আমেরিকায় স্থানীয়ভাবে এদের ১৪৮টি সদস্য ফেডারেশন রয়েছে, এরই সাথে আমেরিকা ও কানাডাজুড়ে রয়েছে ৩০০টি কমিউনিটির সাথে স্ট্রং নেটওয়ার্ক। এই ফেডারেশনের কাজের ধরন দুরকম। কেউ কেউ মুখে মধু মনে বিষ নিয়ে বেড়োয় অর্থাৎ সামনাসামনি খুবই সাপোর্ট করে ইসলামপন্থিদের। আর অপরপক্ষ সরাসরি ইসলাম বিদ্বেষে ঘি ঢেলে যায়। ইসলাম-বিদ্বেষী প্রোপাগান্ডা রটানো, ইসলামিক সেন্টার নির্মাণের বিরোধিতা করে পথ রোধ করা ইত্যাদি কাজের জন্য এসব ফেডারেশন বছরে লাখো কোটি ডলার উপঢৌকন পায়। পকেটও ভারি হয়, ধর্মীয় মিশনও সম্পন্ন হয়। [৭৩]

---

[৭৩] JVP's Jewish Organizations & Islamophobia Module

জুইস কমিউনাল ফান্ড

ইসলামোফোবিয়ার হালে পানি জোগাতে আর একই সাথে গা বাঁচিয়ে চলার জন্য বিভিন্ন মহলের উপদেষ্টা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর উপযুক্ত উপদেষ্টা জোগাড় করাও বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ইসলামোফোবিয়া উপদেষ্টা জোগাড় করার ঝামেলা অনেকাংশে সামাল দিতে অর্থ ঢালে জুইস কমিউনাল ফান্ড। ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্কে ২০০১ থেকে ১৩ সালের মধ্যে ১.৫ মিলিয়ন ডলার ব্যায় করে জুইস কমিউনাল ফান্ড।[৭৪]

[৭৪] International Jewish Anti-Zionist Network Report: Business of Backlash

বিষাক্ত ইসলামোফোবিয়া এবং সংশয়ের পথ

ড্যানিয়েল হাকিকাতজু

আমেরিকান মুসলিমগণ আতঙ্কের দোলাচলে, তাদের বহুলাংশই ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত; তাদের প্রেসিডেন্ট পরিবর্তনের সাথে সাথে ডান-বাম থেকে প্রকাশ্যেই ইসলামোফোবিয়ার নতুন ধোঁয়াশা জেকে বসে। ভাবাবেগ একটি জায়েজ বিষয় যা প্রয়োজনের সময় আমাদের আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে রক্ষা করতে কাজ দেয়, তবে এটির নেতিবাচক ফলাফলও বাহুল্য। আমরা পবিত্র কুরআনে পড়েছি, মুমিন সম্প্রদায়গুলোকে আল্লাহ তায়ালা ভীতির মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার মুখোমুখি সফল সম্প্রদায়গুলো ভয়বাক্যের পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালাকে দেয়া অঙ্গীকার ও দ্বিন পালনে করেছে মনোনিবেশ। ফেতনার দাবানলে বসে ইমানের উপর নির্ভর করে সে অঙ্গীকার পালন করা বেশ কষ্টকর কাজ তখন ভীতি ও দুশ্চিন্তা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ সাধতে পারে। ইসলামোফোবিয়ার ভয়াল রূপ আমাদের বর্তমান মুসলিম সমাজকে বিপদজনক পথে চালিত করার সমূহ সম্ভাবনা রাখে। এটার মেকানিজম বুঝার জন্য কুরআনে বর্ণিত ইসরায়েলিদের সম্পর্কিত বিবরণাদিতে নজর বুলালেই চলে। অনেক ক্ষেত্রেই বনি ইসরায়েলের চরম মাত্রার ভীতি তাদেরকে খোদার আদেশ সরাসরি অস্বীকার করার প্রতি ধাবিত করে, যা শেষে বিনাশ ডেকে আনে।

"অতঃপর, ফেরাউন ও তার নেতৃবর্গের নির্যাতনের ভয়ের কারণে মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজ সম্প্রদায়ের গুটি কয়েকজন লোক ব্যতীত বাকিরা ইমান আনল না। নিশ্চই সে দেশে ফেরাউন ছিল অতি পরাক্রমশালী এবং সীমালজ্ঞনকারীদের অন্তর্ভূক্ত।" ৭৫

ভীতির উৎস

হাল আমলে একই ধরনের গতিশীলতার দেখা মেলে ধর্মীয় ও জাতিগত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে। চোখ খুলে দেয়ার মতো করে উস্কানিমূলকভাবে "দ্য ফেডারেলিস্ট" নামক ম্যাগাজিনে 'লিবারালিজম আমেরিকান ইহুদি সম্প্রদায়কে কীভাবে ধ্বংসের দ্বারে ঠেলে দিয়েছে' শিরোনামে আর্টিকেল প্রকাশ করেছে। গত কয়েক প্রজন্মের উপর আমেরিকান রাজনীতি ও নৈতিকতার মাধ্যমে ইহুদিরা যে আগ্রাসন চালিয়েছে তার

[৭৫] সূরা ইউনুস-৮৩

ফলে প্রজন্মগুলোর বিশ্বাসের ভিত হয়েছে নড়বড়ে, প্রবন্ধটিতে তাই বর্ণিত হয়েছে। পিউ গবেষণা কেন্দ্রের এক গবেষণা প্রবন্ধটিতে দেখিয়েছে যে 'ইহুদি হওয়ার মানে কী?' এ প্রশ্নের উত্তরে এক ইহুদি উত্তরদাতা বলে, কেউ ভাবতে পারে যে উত্তরটি হবে এমন কিছু 'আল্লাহতে বিশ্বাস আনয়ন করা, তাওরাত তেলাওয়াত করা, বা ইবরাহিম এবং মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করা। যাইহোক, পিউ রিসার্চের জরিপে উঠে এসেছে অধিকাংশ আমেরিকান ইহুদিদের মতে এ বিষয়গুলি ইহুদি জাতিসত্তার কোন পরিচয় বহন করে না; যেখানে 'ইহুদিদের ঐতিহ্যগত খাবার খাওয়া, এবং ভাল হাস্যরসাত্মক অনুভূতি থাকা'কে ইহুদি জাতিসত্তার পরিচায়ক বলে গণ্য করা হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারী কিছু ইহুদির মতামত অনুযায়ী তাদের ধর্মীয় পরিচয় বহনকারী দুটি বৈশিষ্ট হল 'ইসরায়েলের যত্ন নেওয়া আর ইহুদি আইন পর্যবেক্ষণ করা'। তবে পরেরটি তালিকার শেষের দিকে ছিল। ইহুদি জাতিসত্তার পরিচয় বহনকারী অন্যান্য যে বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে তা হলো 'নৈতিক জীবনযাপন, ন্যায় বিচার ও সমতার জন্য কাজ করা। যদিও এসব নিশ্চিতভাবে ইহুদিধর্মে অন্যন্য মূল্যবান নয়।

এসবের সাথে ভয়ের কী সম্পর্ক! এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ 'হলোকাস্ট এর কথা স্মরণ করা' এটি ইহুদি জাতি সত্তার সাথে এমনভাবে জড়িত যে সামগ্রিক ভাবে ৭৩ শতাংশ ইহুদিই এটার স্বীকৃতি দেয়। এ বিষয়টির ভয়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া কি কাকতালীয় ঘটনা! ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে সবচে বড় এ ঘটনা হৃদয় পটে ধারণ করে রাখাটা কি কোন কাতকালীয় বিষয়! এ হলোকাস্ট পুরোটাই ইহুদিদেরকে কেন্দ্র করে গড়া বলে তারা বিবেচনা করে।

হলোকাস্টের স্মরণ ইহুদি পরিচয়ের প্রধানতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হওয়া আর তালিকার বাকিগুলির ইহুদি ধর্ম চর্চা-সাংস্কৃতি চর্চা এবং প্রভাবশালী আমেরিকাদের সমর্থিত মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ততটা কাজে দেয় না। ভয় একটি শক্তিশালী উদ্দীপক এবং শক্তিশালী সমর্থক। হলোকাস্টকে বিকল্প পথ হিসেবে বিশ্বাস করা সম্ভব হলে সব অনৈতিক বিষয়ই কার্যত ন্যায়সঙ্গত বিবেচিত হতে পারে। (আত্মরক্ষার খাতিরে)

ইহুদি সম্প্রদায়ের বিপরীতে, আমেরিকান মুসলিম সম্প্রদায়গুলোর অধিকাংশের ইতিহাসেই গণহত্যা হয়নি। যদিও আমেরিকান মুসলিম সমাজের কিয়দাংশ সম্মুখীন হয়েছে, যেমন কৃষ্ণাঙ্গ, আদিবাসি, বসনিয়ান এবং ফিলিস্তিনি আমেরিকান মুসলমানগণ। নিঃসন্দেহে আমেরিকান মুসলমানগণদের যে কোন হুমকির মুখে সতর্ক থাকতে হবে। সাথে সাথে সমাজের বিশ্বাসের উপর হুমকির উপস্থিতি কেমন

অনিচ্ছাকৃত নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে তা নিয়ে সমাজটিকে আরও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

উদাহরণ: গণহত্যার অপচ্ছায়া যদি দূরে থেকেও কারো মননে হাতছানি দেয়, তবে সুপ্রতিষ্ঠিত কোন ধর্মের নীতিও ব্যাতিক্রমভাবে নমনীয় এমনকি বাতিল পর্যন্ত হয়ে যায়। আর যদি গণগত্যার কড়া মাথার উপর হাজির থাকে তাহলে কেউ আত্মরক্ষার জন্য যেকোন কিছু করাকেই সঠিক বলে বিবেচনা করতে পারে। হয়তো পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে, রাজনৈতিক ভুল থেকে গা বাচিয়ে, স্বাধীনচেতা ভাব দূর করে, সমাজে প্রচলিত প্রসিদ্ধ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে না গিয়ে সামগ্রিক ভাবে সমাজ থেকে বৈরিতা দূর করা থেকে হাত গুটিয়ে, এসব কাজকেও সঠিক বলে চালিয়ে দিতে পারে। সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সিদ্ধান্ত বহুলাংশে সম্ভাব্য ভয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভয়-ভীতি একটি ন্যায় সঙ্গত আবেগ নয়, এটা বলার কোন উপায় নেই। নিশ্চিত করে এটাকে ভাল কাজ সম্পাদনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তবে প্রশ্ন হলো, যখন এটি ন্যায়সঙ্গত তখনো সব কিছুতে এর কেমন প্রভাব পড়ে?

মুসলিম পরিচয় মানেই কি হিজাব এবং হামাস?

সাম্প্রতি সমাজতাত্বিক ও নৃতাত্বিক গবেষণায় সঠিকভাবে এ প্রশ্নের উত্তর উঠে এসেছে। অনেক গবেষণাই দেখিয়েছে যে, ব্যাপক বৈষম্য ও বঞ্চনার কারণে সাংস্কৃতিক আশঙ্কা নিয়ে সংখ্যালঘুরা কেমন আচরণ করে। গবেষণাগুলো দেখিয়েছে যে সাংস্কৃতিক এ আশংকাগুলো ইতিবাচক ভাবে দুটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত।

১. জাতিগত প্রয়োজনীয়তা

২. বহুসাংস্কৃতিক আদর্শ

সাধারণভাবে এটা দিয়ে বুঝায় যে, যদি কোন সংখ্যালঘু গোষ্ঠী প্রভাবশালী গোষ্ঠী দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয় তবে তারা সবকিছুর আগে তাদের জাতিস্বত্তার পরিচয় বহনকারী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধগুলো দিগুণ আকারে চর্চা করতে থাকবে। দ্বিতীয়ত, তারা ক্রমবর্ধমান বহুসাংস্কৃতিক জালে আটকা পড়ার প্রবণতা রাখে যা সমাজের সকল স্বাস্থ্যকর গোষ্ঠীগুলোর পালন করা উচিত সমানভাবে। এমন গোষ্ঠীর উপস্থিতি সমাজকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করবে।

এই গতিশীলতা মূলত আমেরিকান মুসলিম সমাজের আভ্যন্তরীন ব্যাপার নিয়ে ব্যাখ্যা দেয় ৯/১১ ঘটনার পর থেকে। নিশ্চিতভাবে ইসলাম কোন সংস্কৃতির নাম নয় আর মুসলিম কোন জাতিগত জনগোষ্ঠী নয়। তবে অন্তর্নিহিত ধারণাগুলি

ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তখন ইসলামকে মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং চর্চার সমন্বিত রূপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটাই নাস্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বক্তব্য। ইসলামকে কালচারের অংশ হিসেবে ফুটিয়ে তোলা।

এই বিষয়টিতে, আমেরিকান মুসলমানরা বড় মাপের সাংস্কৃতিক দুশ্চিন্তায় ভোগে শুধু মাত্র আমেরিকান সমাজে সাধারণভাবে ইসলামবিদ্বেষী আচরণের কারণেই না বরং মুসলমান এবং তাদের প্রতিষ্ঠানকে টার্গেট করে সরকারের বিদ্বেষপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করার কারণে। মুসলিম সম্প্রদায়ের অনুভূত এ ভয় তাদের প্রয়োজন ও বহুসংস্কৃতিবাদে দিকে ঠেলে দেয়। আমেরিকান সাংস্কৃতিক চাপ মুসলমানদের উপর এক প্রকার ইতিবাচক প্রভাবও ফেলেছে মুসলিম পরিচয় ধারণ করতে। এক কথায় অপ্রকাশিত মুসলিম। অপরদিকে মুসলমানরা বহুসংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে যেহেতু তারা রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে বেশি সম্পৃক্ত ছিল। উদাহরণস্বরূপঃ মুসলমানগদের অন্তর্ভূক্তি আন্তবিশ্বাসী-আস্থামূলক ঘটনাগুলোতে ছিল বেশ। মূলধারার রাজনৈতিক দল ও জোটগুলিতে মুসলিমদের উপস্থিতি ছিল বেশ স্বরব। মুসলিম নেতা, ইমাম এবং বক্তাদের ভাষায় বহুসংস্কৃতি, বৈচিত্রায়ন, প্রাসঙ্গিকতা এবং অন্তর্ভূক্তির রেশ লেগেই থাকত।

যখন দুশ্চিন্তা এবং ভয়; দুটি আপাত বিরোধী শক্তি প্রয়োজনবাদ ও বহুসংস্কৃতায়নের প্রবণতা উস্কে দেয়। এর কারণ বহুসংস্কৃতায়ন হলো আগ্রহের ভিত্তিতে অনেক বিষয়ে একত্রে এক মালায় গাথা। অন্যথায় প্রয়োজনবাদ হলো প্রভাবশালী সংখ্যাগরিষ্ঠদের থেকে ব্যাক্তি স্বাতন্ত্রকে আলাদা করায় গুরুত্বারূপ। এ দুই বৈপরিত্তের চিন্তা দূর করার উপায় কী?

আমেরিকান মুসলমানদের জন্যবিপদাশংকা হলো, এই দুশ্চিন্তা প্রভাবশালী সংস্কৃতির সাথে সরাসরি সংঘর্ষমূলক ইসলামের বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং চর্চায় কমতি বা ইচ্ছাকৃতভাবে কম গুরুত্বারোপের মত ফল বয়ে আনতে পারে যখন সংস্কৃতাঙ্গনে তা আরও জোরদার করার সময়। ফলত মুসলমানদেরকে কিছু সমন্বিত ও প্রয়োজনীয় পরিচয় ধারণ করতে হতে পারে। যদিও প্রাথমিকভাবে তা ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে সংস্কৃতিক পরিচয়। যখন তারা নিজেদেরকে আমেরিকার বৃহত্তর সংস্থা এবং পরিবেশের সাথে একীভূত করে নিচ্ছে যার সিংহভাগই সাংস্কৃতিক বৈচিত্রকে সহ্য করে এমনি উৎযাপনও করে। তবে জাতিগত, আদর্শিক ও ধর্মীয় বৈচিত্রকে নয়। বতর্মান বছরগুলোতে আমেরিকান কিছু রাজনৈতিক দলে মুসলিমদের অন্তর্ভূক্তিতে তার আলামত আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আমেরিকান ইহুদিদের দৃষ্টান্ত শিক্ষা দিয়ে যায়। একটি সম্প্রদায় হিসেবে আমেরিকান ইহুদিদের স্বতন্ত্র পরিচয়ের ক্ষেত্রে

নিজেদের ভিতরগত শক্তিশালি ঐক্য বিদ্যমান। যেমন: তাদের প্রয়োজনবাদের কারণে তারা সামাজিক, রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত এবং সাংস্কৃতিকভাবে সম্পৃক্ত তদের বহুসংস্কৃতিবাদের জন্য। অন্যকথায় তারা বহুসংস্কৃতিবাদ ও প্রয়োজনবাদের বিভক্তি সমাধা করেছে। পূর্বে উল্লেখিত পিউ রিসার্চে নিরূপিত হয়েছে, ইহুদি জাতিসত্বার পরিচায়ক বিষয়গুলির সাথে ধর্মের খুব অল্পই যোগসাজস রয়েছে।

একই সময়ে মুসলিম ও নাস্তিক

ইহুদি পরিচয়ের ধর্মনিরপেক্ষতাই 'ইহুদিদের নাস্তিক্যের' ব্যাখ্যা প্রদান করে। প্রভুতে বিশ্বাস ছাড়াই ইহুদি হওয়া যায় সব ইহুদি এর সাথে একমত হবে না। তবু ইহুদি নাস্তিক্যবাদি সংস্থাসমূহ বেশ পাকাপোক্ত ভিত গড়ে তুলেছে এবং আমেরিকান সামগ্রিক ইহুদির তুলনায় ক্রমবর্ধমান রয়েছে। অর্ধেকেরই বেশি আমেরিকান ইহুদির প্রভুর অস্তিতে শংসয় রয়েছে, এটা আশ্চর্যজনক কথা নয়। একই ধরনের ঝোঁক আমরা মুসলিম সমাজেও দেখতে পাই। যেমন, 'এক্স-মুসলিম তথা প্রক্তন মুসলিম' 'এথিস্ট মুসলিম তথা নাস্তিক মুসলিম' নামক লেভেল জুড়ে নিয়েছে যারা নিজেদেরকে সাংস্কৃতিগতভাবে মুসলিম তবে ধর্মের দিক দিয়ে নাস্তিক। নাস্তিক মুসলিম শব্দ দিয়ে বুঝায় ইহুদিদের মতন মুসলমানদেরও জাতিগত এবং সংস্কৃতিগত লেভেল জুড়ে দেয়া, এটা যেন একের ভিতর অনেক রূপ। নিশ্চিতভাবে আরবি 'মুসলিম' শব্দটি দিয়ে বুঝায় একজন ব্যক্তি যে আল্লাহ তায়ালার প্রতি আত্মসমর্পন করেছে, এবং ধর্মগত দিক থেকে সে মুসলমান। আর বিশ্বাস এবং ধর্ম-চর্চার ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট নিয়মনীতি রয়েছে। এই নিয়মনীতি আল্লাহ প্রদত্ত, তা ওহির মাধ্যমে পৌঁছেছে। তবে নাস্তিক্যবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেখানে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করা হয়, সেখানে এসব মুসলিমদের প্রচলিত নাস্তিক্যবাদী নিয়মনীতিতে চালিত করা যায়। এমনকি এই মানদন্ড অনুসারে 'ইহুদি মুসলিম' বা 'খৃস্টান মুসলিম' শব্দগত ও ধারণামূলকভাবে হওয়া সম্ভব।

ফলত সার্বিকভাবে ইসলামোফোবিয়ার রূপে 'সাংস্কৃতিক দুশ্চিন্তা' মুসলামনদের নাস্তিক্যবাদ গ্রহণে এবং মুসলিম পরিচয়কে শতধা বিভক্ত করতে নিয়মিত চাপ সৃষ্টি করতে থাকবে। একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে এইসব চাপের বিষয়ে আমাদের সুসচেতন হতে হবে যাতে আমরা এর লক্ষণ শনাক্ত করে প্রতিরোধের চেষ্টা করে যেতে পারি। মুসলিম বিরোধী ধর্মান্ধতার বিকলাঙ্গ ভয়ের কাছে আমরা নিজেদেরকে সপে দেয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রাণ হারাই (প্রাণের ডাক শুনতে পাই না।) এর বিপরীতে আমরা সেই ভয়গুলিকে ব্যবহারিক ও আধ্যাতিক ইতিবাচক দিক বলে

গণ্য করতে পারি। যথা ইসলামিকভাবে অবগত কর্মকান্ড-সক্রিয়তা, আল্লাহতে বিশ্বাস-নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি এবং সর্বশক্তিমানের ভয় অন্তরে ধারণ করা।

এটাকে ভিন্নভাবে দেখলে, বিশ্বে যদি চরম মাত্রায় ইসলামোফোবিয়ার ধারকরা বিরাজ করে যারা ইসলামকে ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে (মানতে নারাজ) হটিয়ে দিয়ে চায়। সেখানে তাদের জন্য দুটি পথ আছে।

এক. নির্বাসন, অন্তর্ভূক্তি কিংবা হত্যা; ধর্মান্ধতা তথা ধর্মীয় বিদ্বেষের মাধ্যমে এমনকি গণহত্যার মাধ্যমে।

দুই. মুসলানদের বিশ্বাসে কুঠারাঘাত করার জন্য, ইমান নড়বড়ে করে তোলার পট প্রস্তুত করা, অবস্থা তৈরি করা। যেমনঃ মুসলমান হওয়ার সাথে এবং ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস ও কর্মকান্ডের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

আমাদের নিশ্চিত করা জরুরি, প্রথম পন্থার সাথে সোৎসাহে সতর্ক সংগ্রামের সময় দ্বিতীয় পন্থার বিরুদ্ধে সমানভাবে গুরুত্বারোপ করতে যেন ভুলে না যাই। দ্বিতীয় পন্থাও প্রথমটির মত সমানভাবে পৈশাচিক ও ধ্বংসাত্মক।

ভাষান্তর: হাবিবুর রহমান রাকিব

ইসলামোফোবিয়ার অন্তরালে

ড. আব্বাস বারজিগার, যয়নব এরেইন

কাউন্সিল অন আমেরিকান ইসলামিক রিলেশন্স 'CAIR' (Council on American-Islamic Relations)' এবং ইউনিভার্সিটি অফ কালিফোর্নিয়া বার্কলে'-এর (Center for Race and Gender at UC Berkeley) এক যৌথ গবেষণার সূত্র ধরে এক বোমাফাটানো প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গবেষণায় উঠে এসেছে, ইসলামকে ভীতিকর হিসাবে প্রচার করে 'ঘৃণা' ছড়ানো বা 'ইসলামোফোবিয়া' এখন একটি লাভজনক ব্যবসার নাম। ২০০৮-২০১৩ সময়কালে ২শ' মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ আমেরিকাতে ব্যয় করা হয়েছে শুধু মুসলমাদের সম্পর্কে ঘৃণা ও ভীতি ছড়াতে। বাংলাদেশি টাকায় যা প্রায় ১,৬৭৮ কোটি টাকারও বেশি! এই গবেষণায় ৭৪টি বিভিন্ন গ্রুপকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যারা অর্থের বিনিময়ে 'ইসলামোফোবিয়া' ছড়িয়েছে। ইসলামোফোবিক এই গ্রুপগুলোর মধ্যে রয়েছে নারীবাদী, খ্রিস্টান, জায়োনিস্ট ও প্রভাবশালী বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম।

ইসলামোফোবিয়াকে সুবিশাল এক ব্যবসা হিসেবে উল্লেখ করে CAIR-এর একজন মুখপাত্র উইলফ্রেডো রুইজ বলেন-

"অনেক মানুষ আছে যারা ইসলামোফোবিয়া ছড়িয়ে প্রতি বছর মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার কামাই করছে। এই মানুষগুলো প্রায়ই নিজেদের ইসলাম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে জাহির করেন, আসলে তারা তা নন।"

Confronting Fear শীর্ষক এ গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৩ সাল অবধি দেশটিতে আইন বা আইনের সংশোধনীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যেখানে ৮১টি ছিল ইসলাম ধর্মাচরণকে কটাক্ষ করে প্রণীত এবং ৮০টি রিপাবলিকানদের দ্বারা প্রণীত হয়েছিল। এ সবের বিষফল ছিল অবধারিত। হিজাব নিষিদ্ধ হয় দেশে দেশে। কুরআন পোড়ানোর ঘটনা, নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপমান ও ব্যঙ্গ কার্টুন প্রকাশ চলতে থাকে। মুসলিম জনগোষ্ঠী গভীর সংকটের মুখোমুখি হয়। তারা আক্রান্ত হয় গোষ্ঠীর হাতে, সমাজের হাতে, রাষ্ট্রের হাতে। একান্ত ন্যায্য মনে করেই

মুসলিমদের বিরুদ্ধে অপরাধপ্রবনতা জারি থাকে। মুসলিমদের আঘাত, অপমান এমনকি হত্যার মতো ঘটনা অব্যাহত থাকে।

ইসলামোফোবিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে যতটা রাজনৈতিক, তারও চেয়েও বেশি অর্থনৈতিক। তাদের চোখে এটা সম্পদ লুণ্ঠন ও অস্ত্র বাণিজ্যের সহজলভ্য হাতিয়ার মাত্র, কিন্তু এর ফলে প্রতিনিয়ত বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে নতুন মাত্রায়, আর অকারণেই প্রাণ দিতে হচ্ছে শত-সহস্র নিরপরাধ মানুষকে। ইসলামোফোবিয়া হচ্ছে মাল্টি মিলিয়ন ডলারের ইন্ডাস্ট্রি। Center for American Progress ইসলামোফোবিক ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত বিভিন্ন সংস্থা এবং দাতাদের সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য স্বচ্ছভাবে তুলে ধরেছে। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো এটা শুধু আমেরিকান ইসলামোফোবিক ইন্ডাস্ট্রির চিত্র, বিশ্বজুড়ে এটা কেমন হতে পারে তা অনেকটাই অজানা।

ইসলামোফোবিয়ায় মার্কিন মুলুকে বিনিয়োগের ফলশ্রুতিতে জনমনে ভয়াবহ বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। নোম চমস্কির ভাষায় এটা হচ্ছে "মনোজাগতিক উপনিবেশ" । CNN-এর তথ্যমতে শুধু ২০১৪-১৫ সালেই মার্কিন মুলুকে ইসলাম-বিদ্বেষী "হেইট ক্রাইম" বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৭ শতাংশ। কানাডায় ৫৩ শতাংশ, লন্ডনে ৪০ শতাংশ। জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, চায়নাসহ ইউরোপ ও আমেরিকার অন্যান্য দেশে একই অবস্থা। আল-জাজিরার একটি অনুসন্ধানী দল দেখিয়েছে, মার্কিন ইসলামোফোবিক ইন্ডাস্ট্রির পেছনে রয়েছে প্রায় ৭৪টি সংস্থা এবং তাদের পোষ্য গণমাধ্যম।

৯/১১ পরবর্তীতে সৃষ্ট ইসলামোফোবিয়ায় মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫০ শতাংশ। শুধু হিজাব পরার কারণে উন্নতবিশ্বে ৬৯ শতাংশ মুসলিম নারী বৈষম্যের শিকার হয়। মুসলিম হওয়ার কারণে বেকারত্বের সম্ভবনা বৃদ্ধি পায় ২৯ শতাংশ! এসব পরিসংখ্যান সেইসব দেশের যারা বিশ্বজুড়ে সবাইকে অসাম্প্রদায়িকতা, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার শেখায়! এছাড়া বিশ্ব নিয়ন্ত্রকদের জন্য ইসলামোফোবিয়া একটি সহজলভ্য হাতিয়ার। ইসলামোফোবিয়ার মাধ্যমে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে তেল সম্পদ লুট করা হচ্ছে। পৃথিবীর মোট খনিজ তেলের ৭৫ শতাংশ রিজার্ভ রয়েছে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে, আর আমেরিকায় রিজার্ভ রয়েছে মাত্র ২ শতাংশ তেল। পেট্রো-ডলার অর্থনীতিতে তেল যার নিয়ন্ত্রণে, বিশ্ব তার নিয়ন্ত্রণে।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক রানিমেইড ট্রাস্ট ১৯৯৬ সালে সব ধর্মাবলম্বী বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ১৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করে, যার প্রধান ছিলেন অধ্যাপক গর্ডন কনওয়ে। ওই কমিটি যে রিপোর্টগুলো প্রকাশ করে, তার শিরোনাম ছিল- Islamophobia a Challenge For Us All। রিপোর্টটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে ব্রিটিশ মিডিয়ায় তোলপাড় শুরু হয়। অনেকেই একে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেন। ২০ বছর পরে রানিমেইড প্রকাশ করে এর ফলোআপ। যার শিরোনাম ছিল- Islamophobia –still a challenge to us all. এর মানে পরিষ্কার, ইসলামোফোবিয়া কমছিল না। বরং সত্য হলো, বেড়েই চলেছে। **ইসলামোফোবিয়া কনস্পেটকে বোঝার জন্য নিম্নে সামগ্রিক একটি চিত্র তুলে ধরা হলো—**

- ইসলামোফোবিয়া কী?
- মুসলিমদের বিরুদ্ধে জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণা।
- কারা এর শিকার?
- মুসলিম নারী, শিশু, পুরুষ এবং তাদের সাথে বিশেষায়িত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জনগোষ্ঠী, হোক তা ভাষা, বর্ণ, আর পোশাক-আশাকে।

প্রয়োগের কয়েকটি ধরন

 ১. শারীরিক নির্যাতন

২. বৈষম্য

 নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ

৪. মুসলিম-বিরুদ্ধ নীতির দৌরাত্ম্য

ইসলামোফোবিয়া শনাক্তকরণ পদ্ধতি : কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে যদি নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদির সঙ্গে জড়িত পাওয়া যায় তবে তা ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত বলে বিবেচিত হবে। নিচের লক্ষগুলো ছাড়াও একাধিক বিষয় রয়েছে, মুসলিম মাত্রই সেইগুলো অনুধাবন করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। উধাহারণ হিসেবে কয়েকটি পয়েন্ট উল্লেখ করা হলো।

১. কেউ যদি ইসলামকে সহজাতভাবে সহিংস, নারী-বিদ্বেষী, নিকৃষ্ট, অসহিষ্ণু, সেকেলে, অচলনসই, স্বৈরাচারী, সমকামী, চালবাজ, স্বার্থবাদী, ধোঁকাবাজ, সভ্যতা-বিরোধী বলে অভিযোগ তোলেন।

২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের মতো ইসলামকে নিজেদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি মনে করা। ইসলাম ও ইসলামি সংস্থাকে নিজেদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কাজে লিপ্ত বিবেচনা করা।

৩. মুসলিমদের জন্য বৈষম্যমূলক আইনিব্যবস্থা সমর্থন প্রদান। যেমনটা করেছেন সোমালিয়ার মুসলিমবিদ্বেষী নারীবাদি লেখক আয়ান হিরিস আলি। মুসলমানদের প্রতি প্রদর্শিত বৈষম্যকে আইনিভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য মার্কিন সংবিধান সংশোধনের পরামর্শ দেন তিনি।

৪. শরিয়াহ আইনের বিরোধিতা করা, শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী মুসলিমদের 'জঙ্গি' বা সন্ত্রাসী ট্যাগ লাগানো।

হালের আমেরিকায় এন্টি-মুসলিম ঘটনাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১. **তর্জন-গর্জন:** আমেরিকার মিনসোটা শহরে জ্যাকব লেটারনো-এলশারকবি নামক ১৫ বছর বয়স্ক নবীন হাইস্কুল ছাত্র বারবার হুমকি-ধমকির ঘটনার শিকার হয়ে নিজেকে স্কুল থেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ৮ম স্টান্ডার্ডে থাকাকালীন যখন তার মা স্কার্ফ পরা শুরু করে জ্যাকব বিদ্বেষমূলক আচরণের শিকার হতে শুরু করে। আপত্তিকর কথাবার্তা ও বন্ধুদের প্রশ্নবাণের মুখেও নিজের ধর্ম আড়াল করেনি। পরক্ষণই সে 'সন্ত্রাসী' ও আরও নানা কটু শব্দবাণে জর্জরিত হতে থাকলো, অধিকন্তু পর্যায়ক্রমে চলতে থাকলো শারীরিক অপমান। একবার তো তাকে জোরজবরদস্তির সাথে লকারে আবদ্ধ করা হলো, এতে সে প্রচণ্ড আঘাত পায়। অরেকবার

ধাতব দরজায় হিংস্রভাবে ধাক্কা দেয়ায় তার কণ্ঠাস্থি ভেঙে যায়। এহেন শতাধিকবার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করার পর নভেম্বর ৯, ২০১৭ তারিখে সে স্কুল বাসে গুরুতর আক্রমণের শিকার হওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি পর্যন্ত করতে হয়েছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ এহেন শারীরিক ও মৌখিক নির্যাতন-নিষ্পেষণের সমাধানে ব্যর্থ হওয়ায় জ্যাকব নিজেকে স্কুল থেকে ২০১৮-র ২৯ এপ্রিল গুটিয়ে নেয়।

২. **মসজিদে হামলা :** ২০১৭ সালের ২৮ জানুয়ারির সকাল, টেক্সাসে অবস্থিত ভিক্টোরিয়া ইসলামিক সেন্টারে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। ভয়াবহ দাবানল মসজিদকে ভস্মীভূত করে। পড়ে রইল কঙ্কালসার ইটের জীর্ণ দালান। ২৬ বছরবয়সি মার্ক পেরেজ এ ঘৃণ্য অগ্নিকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত হয়ে ২৪ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সেই রাতে মার্কের সহযোগী উদ্বেলিত হয়ে বলে, 'মসজিদ পোড়ার দৃশ্য দেখে মার্ক যারপরনাই খুশি ছিল'। সেই অগ্নিশিখার ছবি সফলতার কৃতিত্বস্বরূপ নিজ ফোনে তুলেও রেখেছিল। জনসমাজ তখন বিধ্বস্ত ও ভীতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল। মসজিদ পুনর্নির্মাণসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সমর্থন প্রদর্শিত হলেও সে ভীতবিহ্বলতা দীর্ঘসূত্রতা লাভ করে। যেখানে এক সময় নামাজিরা দ্বার উন্মুক্ত রেখে সালাত আদায় করতো, সেখানে প্রবেশ করতে এখন নির্দিষ্ট কোডের প্রয়োজন পড়ে!

৩. **ভ্রমণ/ইমিগ্রেশন :** ড. ইবলাল জাকজোক, কলম্বাস ওহিয়োতে বসবাসরত আমেরিকান নাগরিক। ২০১৪ পর্যন্ত সিরিয়াতে অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। সে সময়ে সিরিয়ান প্রতিরক্ষা বাহিনী তাকে গ্রেপ্তার করে দু'সপ্তাহ আটকে রেখে বেধড়ক মারধর করে। এই অব্যাবহিত গৃহযুদ্ধ ও নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার্থে ড. জাকজোক ও তার পরিবার তুরস্কে গা ঢাকা দেয়। ডিসেম্বর ২০১৪-তে পরিবার তুরস্কে রেখে যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় প্রার্থনা করতে যান ড. জাকজোক। তাকে আশ্রয় প্রদান করা হয় এবং সেই সাথে লাভ করেন ওহিয়ো স্টেট ইউনিভার্সিটি ফেলোশিপ যেখানে তিনি Surveying, Remote Sensing and Geographical

Information Systems পাঠদান করবেন। আশ্রয়লাভে সমর্থ হয়ে ড. জাকজোক, তার স্ত্রী ও তিন সন্তান ২০১৬ সালে পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে। তার এক মেয়ে তুরস্কে থেকে যেতে বাধ্য হয়। কেননা তার বয়স একুশোর্ধ্ব ছিল। ফলে সে আশ্রয় সুবিধা লাভ করেনি।

২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট সে তুরস্ক থেকে আমেরিকার নাগরিকত্ব চেয়ে আবেদনপত্র লেখে। অন্যদিকে ২০১৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ট্রাম্প আমেরিকায় মুসলিম প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে, যা সিরিয়ানদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। নিষেধাজ্ঞা তুর্কিদের আওতাভুক্ত করে। তাই ড. জাকজোকের তুর্কি বসবাসরত মেয়ে ভিসা পায় না এবং পিতা-মাতা ও ভাইবোনদের সাথে মিলিত হওয়া তার হয়ে ওঠে না। অপরদিকে সে তুর্কিতেও স্থায়ী আইনি বসবাসাধিকার পায় না; আর সিরিয়া ফিরে যাওয়া তো আগুনে ঝাপ দেয়ার শামিল। সেখানে সে মুখোমুখি হবে নিপীড়ন বা মৃত্যুর। জুন ২০১৮ সালে তুর্কি সর্বোচ্চ আদালত মুসলিম নিষেধাজ্ঞা আইন অব্যাহত রাখার রায় দেয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিবারের সাথে তার সাক্ষাত করা বাধাগ্রস্ত হয়।

মুসলিম-বিরোধিতার ধারাপ্রবাহ

আমেরিকান জনহিতৈষী ও ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্ক

CAIR-এর গবেষণা অনুসারে আশ্চর্যজনকভাবে ২৯টি ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্ক ১০৯৬ টি দাতব্য সংস্থাকে অর্থায়ন করতে দেখা গেছে ২০১৪-১৬ এর মধ্যে। এই সংস্থাগুলো বিস্তৃত পরিসরে বিভিন্ন ভাগে দান করে। ২০ ডলার থেকে শুরু করে ৩২.৪ মিলিয়ন ডলার! এসব অরগানাইজেশনকে তিনটি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা যায়-

১. দাতা পরামর্শ তহবিল
    - ভ্যানগার্ড চ্যারিটেবল- ৩.৭ মিলিয়ন ডলার
    - ডোনার ট্রাস্ট ইনকরপোরেশন- ১.৮ মিলিয়ন ডলার
    - ডোনার ক্যাপিটাল ফান্ড ইনকরপোরেশন- ৪.৪ মিলিয়ন ডলার
    - ফিডালিটি চ্যারিটেবল- ৮.৭ মিলিয়ন ডলার
    - স্কুয়াব চ্যারিটেবল- ৫.৭ মিলিয়ন ডলার

২. বিশ্বাসভিত্তিক দাতা পরামর্শ তহবিল
   - ন্যাশনাল খ্রিস্টিয়ান ফাউন্ডেশন- ১৫.৭ মিলিয়ন ডলার
   - জুইস কমিউনাল ফান্ড- ৩.২ মিলিয়ন ডলার

৩. পারিবারিক বৃত্তি
   - এডেলসন ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন- ৬.১ মিলিয়ন ডলার
   - দ্য এবসট্রাক্ট ফান্ড- ৩.১ মিলিয়ন ডলার
   - স্টিফেন হ্যারল্ড স্কিমেল ফাউন্ডেশন ইনকরপোরেশন- ১ মিলিয়ন ডলার
   - এমজেড ফাউন্ডেশন- ১.৫ মিলিয়ন ডলার
   - মিরোসকি ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন ইনকরপোরেশন- ১.২ মিলিয়ন ডলার
   - ইজিন এন্ড ইমিলি গ্রান্ট ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন- ১.৪ মিলিয়ন ডলার
   - ডিয়ানা ডেভিস স্পিনসার ফাউন্ডেশন- ১.২ মিলিয়ন ডলার
   - নিউটন এন্ড রিচেল বেকার চ্যারিটেবল ট্রাস্ট- ১.১ মিলিয়ন ডলার
   - খ্রিশ্চিয়ান অ্যাডভোকেট সার্ভিং ইভেনজেলিজম ইনকরপোরেশন- ৩২.৪ মিলিয়ন ডলার
   - হেভেনলি ফাদার্স ফাউন্ডেশন- ১.২ মিলিয়ন ডলার

উল্লেখিত সংস্থা সমাজে মুসলিম-বিরোধী এজেন্ডা বাস্তবায়নে ইসলামোফোবিয়া ট্যাক্সমুক্ত ডোনেশন সংগ্রহ করে। মুসলিম-বিরোধী এ নেটওয়ার্কে ফলে সামাজিক প্রভাব—

- সম্প্রদায়গুলোকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা
- আইনি পদ্ধতির অপব্যবহার
- ভুল তথ্য সম্প্রসারণ
- মূলধারার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিভ্রান্তি ও কুয়াশার জালে আবদ্ধ করে রাখা
- বিশেষ আগ্রহের ক্ষেত্রে উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে অনৈতিকতার জন্ম দেয়া

ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্ক : ১.৫ বিলিয়ন মার্কেটপ্লেস

আমেরিকান কালচার এবং রাজনৈতিক আলাপাঙ্গনে ইসলামোফোবিয়ার ক্ষতিকর প্রভাব মূলধারার মিডিয়া ও বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা অঙ্গনের আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। David Horowitz Freedom Center Ges Center for Security Policy-এর মতো সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম-বিরোধী সংঘগুলো জাতীয় সুরক্ষা, ইসরায়েল প্রতিরক্ষা ও দেশি কালচার রক্ষার ছদ্মবেশে মুসলিম-বিদ্বেষী ধর্মান্ধতার বিষবাষ্প ছড়াতে ব্যস্ত। আরও অনেক মাল্টি-মিলিয়ন সংস্থার সাথে এ সংস্থাগুলোও অনলাইন ম্যাগাজিন, রেডিও শো, ডিজিটাল মিডিয়া, স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ বা ছোটোখাটো নীতি-নির্ধারক প্রতিষ্ঠান এর ঢাল হিসেবে ব্যবহার হয়। যখন কিছু সংস্থা প্রাথমিকভাবে ইসলাম-বিরুদ্ধ কর্মকাণ্ডে নিবেদিত আর অন্যরা সুদুরপ্রসারী রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নে ইসলামোফোবিয়া এজেন্ডাকে কাজে লাগাচ্ছে। ২০১৪-১৬ সময়কালে ৩৯টি মুসলিম-বিরুদ্ধ সংস্থা তাদের সামষ্টিক সাংগঠনিক অর্থায়নে কমপক্ষে ১.৫ বিলিয়ন ডলারের অনুদান লাভ করেছে। ব্যক্তিগত অনুদান, মেম্বারশিপ ফি, বিনিয়োগকৃত যানবাহনসহ নানা খাত থেকে এই সামষ্টিক অর্থ ওঠানো হয়।

২০১৪-১৬ সময়কালে তাদের বিভিন্ন সংগঠনের আয় বা আয়ক্ষমতা এবং ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্কের সার্বিক আর্থিক ধারণশক্তির বিশ্লেষিত তথ্য এখানে প্রদান করা হবে। সাথে প্রদত্ত হবে জাতীয় পলিসিতে প্রভাব খাটাতে এবং ব্যক্তিক লাভের মুখ দেখতে সংস্থাগুলোর সে অর্থ ব্যয়ের নজিরবিহীন ফিরিস্তি।

এই সংস্থাগুলোর একত্রিত সন্নিবেশই ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্ক নামে খ্যাত, একটি শক্তিশালী বিকেন্দ্রিক ইনফরমাল কর্মযজ্ঞ যা স্থানীয় নির্বাচন, রাষ্ট্রীয় আইন ও ফেডারেল পলিসিতে সফলভাবে প্রভাব ফেলে।
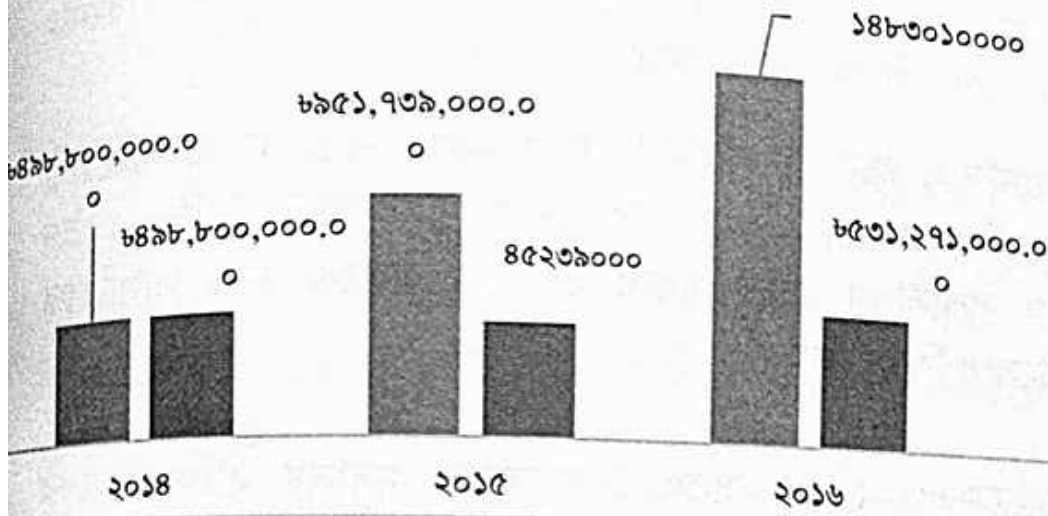
প্রকল্পে নিয়েজিত অর্থ : রাজনীতি, মিডিয়া, আইন প্রয়োগ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, লবিয়িং গ্রুপ এবং অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে আমেরিকায় ইসলাম ও মুসলিম-বিরোধী মনোভাব চাঙা করতেই এই ১.৫ বিলিয়ন ডলার অকাতরে বিলিয়ে দেয়া হয়।

নিম্নে আলোচিত মুসলিম-বিদ্বেষী চারটি সংস্থার প্রোফাইল তাদের ইসলামোফোবিয়া প্রচারের উল্লিখিত নানা পন্থা চিত্রিত করেছে। প্রতিটি প্রোফাইলেই ১৮টি মুসলিম-বিদ্বেষী সংস্থা ও বিশেষভাবে ইসলামোফোবিক প্রোগ্রাম, পলিসি ও কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সংস্থা থেকে লব্ধ অর্থপ্রবাহের ধারা প্রদর্শিত হয়েছে।
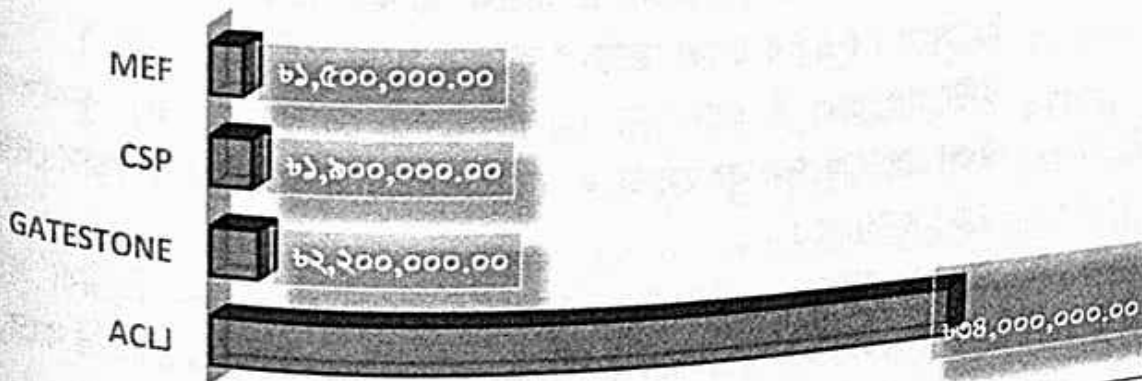
American Center for Law and Justice (ACLJ): ৳ ৩৪,০০০,০০০

মিডিয়ায় খৃস্টধর্ম প্রচারকদের অন্যতম প্যাট রবার্টসন এবং আইনজ্ঞ জে সেকুলা প্রতিষ্ঠিত এসিএলজে একটি মুসলিম-বিরোধী আইনি সাংবিধানিক সংস্থা। ACLJ এই লব্ধ অর্থ দুটি ক্ষেত্রে ব্যয় করে।

১. টেনেসি ও জর্জিয়ার পাবলিক স্কুলে ২০১৫ সালে ইসলাম-বিরোধী যুদ্ধপ্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল। সেখানে ইসলাম, খ্রিস্ট, ইহুদি– এ তিন ধর্ম বিশ্বাসীগণ একই সত্তার উপাসনা করাকে তারা আপত্তিকর হিসেবে শিক্ষা দেয়।

২. এসিজেএল ২০১৭ সালে বৈষম্যমূলক মুসলিম বহিষ্কৃতকরণের পক্ষালম্বন করে পুরোদমে। বিচারসংক্রান্ত বিভিন্ন ধাপে পূর্ণ সহায়তা প্রদানে নিষিদ্ধকরণে কোর্টের রায় বাস্তবায়ন করতে এসিজেএল বহুমাত্রিক প্রচেষ্টা চালায়।

Gatestone Institute : ৳ ২,২০০,০০০

গেটস্টোন ইনস্টিটিউট একটি ক্ষুদ্রকায় তথ্য বিনির্মাণ ও প্রচারণা সংস্থা। ইসলাম, মুসলিম এবং জাতীয় নিরাপত্তা সুদূরপ্রসারী গুঞ্জনের দ্বারা ধ্বংসযজ্ঞ হিসেবে এ প্রতিষ্ঠান কাজ করে। ইসলামকে পশ্চিমা সমাজের জন্য বিপদজনক হিসেবে ফুটিয়ে তুলতে নানা তোড়জোর চালায়; তাতে তাদের অর্থ ব্যয় করে। তাদের অর্থ বিনিয়োগের খাত ও কর্মতৎপরতা–

১. ২০১৮ সালে গেটস্টোন একটি গল্প দাঁড় করায়। যাতে ফুটিয়ে তোলা হয়, সিংহভাগ মুসলিম যুবক আফ্রিকা, এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে উদ্ভূত। জার্মানির অভিবাসী ধর্ষণ সমস্যা, যা মুসলিম ধর্ষক দল দ্বারা, আর যুক্তরাজ্য রূপায়িত হচ্ছিল এক ইসলামি কলোনি হিসেবে। (এসব তারা তাদের কল্পিত গল্পে ফুটিয়ে তোলে।)
২. ইউরোপাঞ্চল জিহাদিদের (মুসলিমদের বোঝানো হয়) পুনর্দখল হলে শ্বেতাঙ্গদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হবে, এ মর্মে পূর্বাভাস দেয় ২০১৭ সালে।
৩. ২০১৬ সাল। গেটস্টোন টরেন্টোভিত্তিক অনলাইন মিডিয়া দ্য রেবেল-এর যোগসাজশে ১২টি ইসলাম-বিরোধী ভিডিও তৈরি করে,

the anti-Muslim hate group, Middle East Forum-এর কর্ণধার ড্যানিয়েল পাইপ-এর মতো অন্যতম মুসলিম-বিরোধী একটিভিস্টদের দ্বারা রচিত। ভিডিওর বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান পেয়েছে 'পাশ্চাত্যকে ইসলামিকরণের ভীতিকর দিক এবং ইউরোপ কি ইসলামিকরণের সামনে আত্মসমর্পণ করবে? না কি নিজেদের মান রক্ষার্থে মৌলবাদী ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে?' এ জাতীয় উস্কানিমূলক মিথ্যা গল্পগুলো গেটস্টোনের মিডিয়া ব্রেইটবার্ট নিউজসহ সহযোগিদের সহায়তায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। এ মিথ্যার দৌরাত্ম্য মার্কিন মূলধারার রাজনীতিতে পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে।

৪. গেটস্টোন প্রচারিত মিথ্যাগুলোর অন্যতম হচ্ছে ইউরোপের 'no-go zones' সম্পর্কে। তারা রব তোলে এটা এমন একটা জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে যেখানে মুসলিম অভিবাসীরা একটি আদর্শ সমাজ গড়ে তুলেছে। যাতে স্থানীয় পুলিশ তাদের রাষ্ট্রীয় আইন ততটা খাটাতে পারেনি। এসব মিথ্যার দৌরাত্ম্য ২০১৬-তেই টেক্সাসের প্রাথমিক রিপাবলিকান সিনেটে পৌঁছে গেছে, টেড ক্রুজবিরোধী দলীয় হিসেবে তা সম্পাদকীয় পাতায় উল্লেখ করেছে, পরে সরকার দলীয় হয়ে, ববি জিন্দাল উল্লেখ করেছে লন্ডনে প্রদত্ত বক্তব্যে, আর ডোনাল্ড ট্রাম্প তার বক্তব্যে এর পুনরাবৃত্তি করে। ২০১৬-এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সমগ্র আবহই ইসলাম ও মুসলমানদের ভয়, আস্থাহীনতা, আর ঘৃণায় পূর্ণ ছিল এহেন মিথ্যাচারের ডামাডোল পেটানোর ফলে।

Center for Security Policy (CSP) : ৳ ১,৯০০,০০০

সেন্টার ফর সিকিউরিটি পলিসি মৌলিকভাবেই একটি মুসলিম-বিরোধী লবিয়িং এবং প্রোপাগান্ডায় জড়িত। তাদের কর্মতৎপরতা ও অর্থায়ন–

১. ২০১৫ সালেই এ সংস্থা চারটি সুরক্ষাকর্ম শীর্ষক সম্মেলন আয়োজন করে, নেভাডা, সাউথ ক্যারোলিনা, নিউ হ্যাম্পশায়ার এবং লোয়ায়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইসলামোফোবিয়া ও জেনেফোবিয়া (বিদেশি বা অজ্ঞাত কল্প ব্যক্তিদের প্রতি এক প্রকার ভয় লালন করা) আনয়ন ও বাস্তবায়নে এগুলো হলো প্রাথমিক হাতিয়ার রাষ্ট্র। ডোনাল্ড ট্রাম্প, টেড ক্রুজ, রিক স্যান্টোরিম এবং বেন কারসন তৎকালীন আবাসন

ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রীসহ উল্লেখযোগ্য মুসলিম-বিরোধী রিপাবলিকান প্রার্থীদের অংশগ্রহণে মুখরিত ছিল সম্মেলনগুলো।

২. ২০১৫-এর সেপ্টেম্বরে অধিকন্তু রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীদের সাথে সম্পর্ক বন্ধন জোরদার করে। সিএসপি যৌথভাবে ইরানবিরোধী মিছিলের আয়োজন করে, যাতে ক্রুজ ও ট্রাম্প বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত ছিল। সিএসপি র‍্যালিতে Act for America সংগঠনের সভাপতি ব্রিজিট গ্যাব্রিয়েলকে আমন্ত্রণ জানায়। সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়ে স্টেজকে মাতিয়ে রাখে। এর পর ডিসেম্বরে আমেরিকা প্রবেশে মুসলমানদের পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা ও অবরুদ্ধকরণের পক্ষে সিএসপি গঠিত পোলকে ট্রাম্প অকস্মাৎ ন্যায়সঙ্গত বলে আখ্যা দেয়। কেলিয়ান কনওয়ে, যে বর্তমানে ট্রাম্পে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োজিত। পরিচালিত জরিপ সংস্থাকে সিএসপি সে বছরের জুনে উল্লিখিত জরিপটির জন্য নিয়েজিত করে।

৩. উপরন্তু মুসলিম-বিরোধী অবস্থান ও নীতি প্রণয়নে রিপাবলিকান প্রার্থী ও কর্মকর্তাদের যোগসাজশে তারা আদাপানি খেয়ে নেমেছে। সিএসপি মুসলিম-বিরোধী আইন প্রয়োগ প্রশিক্ষণেও আত্মনিয়োগ করেছে। ২০১৫-এর জুলাই মাস, সিএসপি প্রাক্তন এফবিআই এজেন্ট জন গোয়াভোলোর (আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় মুসলিম-বিরোধী ব্যক্তি) সাথে এরিজোনা আইন প্রয়োগ-এর জন্য ম্যারিকোপা অঞ্চলের প্রশিক্ষণ সুবিধাসম্বলিত শেরিফের অফিসে ৭ ঘণ্টার ব্রিফিং দেয়ার কাজ করেছে। জন গোয়াভালো আমেরিকার আইন বাস্তবায়নে ইসলাম-বিরোধী নির্দেশনা প্রদানকারী প্রশিক্ষণ দলের প্রতিষ্ঠাতা ও ভীতি অনুধাবন করাতে বদ্ধপরিকর। 'আমেরিকা ইসলামের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত'– এ ঘৃণ্য বক্তব্যের প্রবক্তা সে।

Middle East Forum (MEF) : ৳১,৫০০,০০০

ডানিয়েল পাইপ গঠিত মিডেল ইস্ট ফোরাম একটি চরমপন্থি নীতি নির্ধারণী সংস্থা। এটি ইসলাম ও মুসলিম-বিরোধী অসংখ্য উদ্যেগের অগ্রনায়ক। আমেরিকান মুসলিম সমাজে নানা বাধা-নিষেধ আরওপে ফোরামের সক্রিয় লবিয়িং সর্বান্তঃকরণে অনিষ্টকর। মিডেল ইস্ট ফোরামের কর্মচক্র ও অর্থায়নের ক্ষেত্রবিশেষ–

১. মিডেল ইস্ট ফোরাম তিনটি বিল এডভান্স করেছিল-
ক. মুসলিম ব্রাদারহুডকে সন্ত্রাসী আখ্যা প্রদান- আইন
খ. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ইস্যুতে শত্রুর অভিধা দেয়া- আইন
গ. ধর্মীয় অগ্নি- আইন

এসব এমন ভয়ংকর অধিকরণ পন্থা যাতে মুসলিম সম্পৃক্ত সম্ভাব্য যেকোনো কিছুই বা মুসলিম জনজীবন ও রাজনৈতিক অধিকারের সাথে আংশিক সম্পর্কযুক্ত যেকোনো চর্চা ও কাজই অপরাধের তালিকায় যুক্ত হয়ে যায়। এসব কমিউনিটি সেন্টার, ত্রাণদাতা, মসজিদ এবং মুসলিম নাগরিক কার্যক্রমে যুক্ত সদস্যদের পর্যন্ত আক্রান্ত করতে পারে, তারাও এর আওয়াতভুক্ত হতে পারে। এ কারণে মুসলিমরা কট্টর ডানপন্থি নব্য-নাজি জনগোষ্ঠীর হাতের খেলনায় পরিণত হবে। যারা প্রত্যাশা করে, সকল মুসলিমকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিতে। এরা কোনো প্রকার পরোক্ষ বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে মুসলিমদের সন্ত্রাসী আখ্যা দেয় না; বরং রাখঢাক ও দ্বিধা-ভয়হীনভাবেই মুসলিমদের সন্ত্রাসী নামে ডাকে।

২. ইসলামিক রিলিফ, দ্য ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকা, দ্য ইসলামিক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা, মুসলিম এলায়েন্স অব নর্থ আমেরিকা, মুসলিম আমেরিকান সোসাইটি, মুসলিম পাবলিক এফেয়ার্স কাউনসিল, মুসলিম স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, মুসলিম ইয়ুথ অব নর্থ আমেরিকা এবং ইয়ং মুসলিমস-এর মতো আমেরিকান মুসলিম সংগঠনগুলোর প্রতি চড়াও হতে এমইএফ মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করে। আমেরিকান মুসলিম নাগরিকদের আইনপ্রণেতা, মিডিয়া, সম্প্রদায় ও কর্পোরেট লেভেলের প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে সম্পৃক্ততা নিয়ে অলীক নিন্দিত তথ্যের বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছে এমইএফ।

৩. প্রাত্যহিক মুসলিম জনজীবনকে তিক্ততায় পর্যবসিত করতে
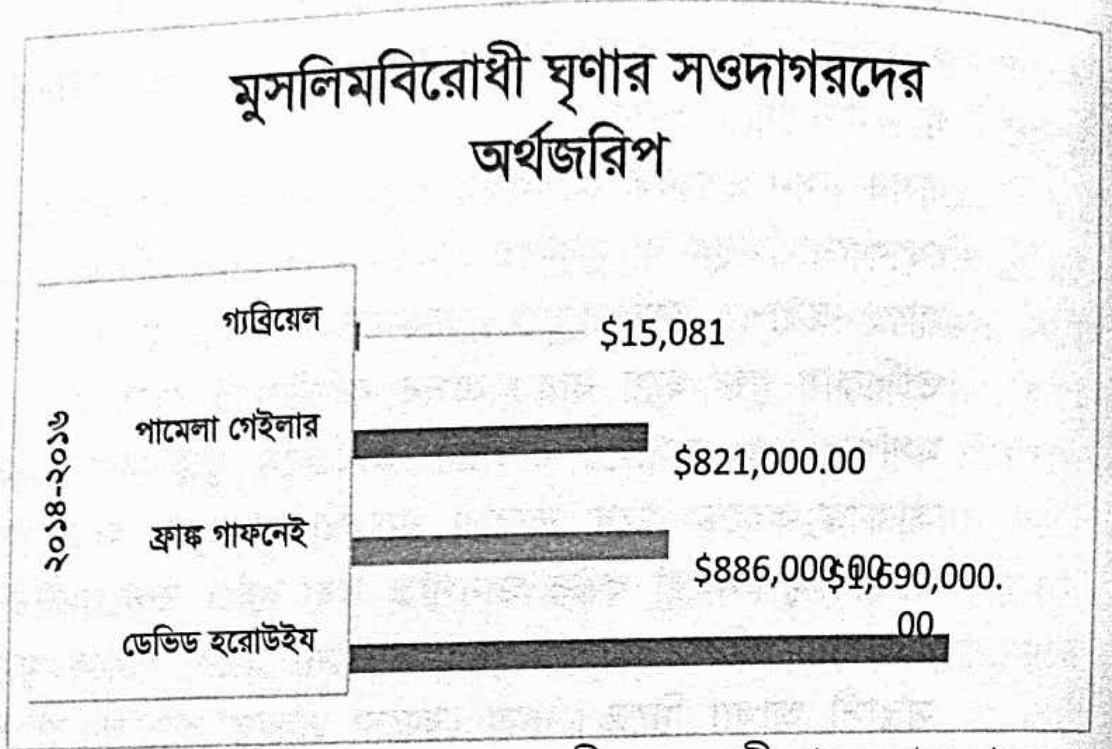
কংগ্রেসকে লবিয়িংয়ের মাধ্যমে তীব্রতর পরীক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করতে তারা বিভিন্ন নীতির প্রয়োগ করেছে। অত্যাবশ্যকীয়ভাবে মুসলিম-বিরোধী প্রশিক্ষণ তারা আরওপ করে, যে প্রশিক্ষণের প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়ায়, আমেরিকানদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হিসেবে মুসলিমদের ফুটিয়ে তোলা। অধিকন্তু তারা হোয়াইট হাউসে ইসলাম-বিরোধী কমিশন প্রণয়ন কল্পে বিস্তারিত প্রস্তাবনা প্রবর্তন করেছে।

ঘৃণার মাধ্যমে প্রোফাইলিং

কতিপয় মুসলিম-বিরোধী ধর্মান্ধ কুসংস্কার ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। মুসলিম-বিরোধী দলগুলোকে নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে লাখ লাখ ডলার হাতিয়ে রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ বনে গেছে।

এখানে গ্যাব্রিয়েলের আয়কৃত সম্পদের পরিমাণ প্রথমে বেশি থাকলেও পরবর্তীতে জরিপ সংস্থার মাধ্যমে কম দেখানো হয়।

মুসলিম-বিরোধী সংস্থাসমূহের বিবরণী

ACT for America : অ্যাক্ট ফর আমেরিকা আমেরিকার সবচেয়ে বড় মুসলিম-বিদ্বেষী সংস্থা। অ্যাক্ট মুসলিম-বিরোধী নীতি ও নীতিকারদের সমর্থন করে চলে। মুসলিম-বিরোধী আয়োজন ও ষড়যন্ত্রনীতি উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

American Center for Law and Justice : খ্রিস্টধর্ম-প্রচারক প্যাট রবার্টসন এবং জে সেকুলা প্রতিষ্ঠিত এসিএলজে একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাংবিধানিক আইনি সংস্থা। মুসলিম-বিরোধী নীতি ও আইনপ্রণয়নে সমর্থন জোগায় এবং মুসলিম-বিরোধী প্রোপাগান্ডায় আত্মনিয়োগ করে।
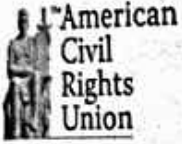
American Civil Rights Union : একটি আইনি সংস্থা যা এসিএলইউ-এর বিকল্প রক্ষণশীল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মুসলিম-বিরোধী স্টেটমেন্ট, ব্রিফিং আর মামলা এগিয়ে নিতে তারা আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে।

American Freedom Law Center : ডেভিড ইয়েরোশালমি বিনির্মিত মুসলিম-বিরোধী আইনি সংস্থা আমেরিকান ফ্রিডম ল' সেন্টার। ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্কের আইনি পরামর্শক হিসেবে মুসলিম-বিরোধী আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ তাদের কর্মতৎপরতার অংশ।

American Future Fund : আমেরিকান ফিউচার ফান্ড একটি ডানপন্থি অলাভজনক সংস্থা যারা রাজনৈতিক প্রজ্ঞাপন, স্পষ্টত ইসলাম-বিরোধী কর্মকাণ্ড, ফেডারেল প্রার্থীদের নির্বাচনে পরাজয় ত্বরান্বিত করা নিয়েই তাদের তৎপরতা।

American Islamic Forum for Democracy : জুহদী যেসার প্রতিষ্ঠিত আমেরিকান ইসলামিক ফোরাম ফর ডেমোক্রেসি একটি মুসলিম-বিরোধী লবিয়িং গ্রুপ। তারা 'ইসলামো-ফ্যাসিবাদ' যুদ্ধের আওয়াজ তোলে।

American Family Association : একটি লবিয়িং গ্রুপ যা ইসলামোফোবিক আদর্শ লালনকারী স্থানীয়দের যোগসাজশে মুসলিম-বিরোধী পলিসিতে সমর্থন জোগায়।

American Freedom Alliance : মুসলিম-বিরোধী এবং জলবায়ু পরিবর্তনবিরোধী প্রচার-প্রচারণা তেজোদীপ্ত করতে ভূমিকা রাখা একটি লবিয়িং সংস্থার নাম আমেরিকান ফ্রিডম অ্যালায়েন্স।

American Freedom Defense Initiative : মুসলিম-বিরোধী এক্টিভিস্ট পামেলা গেলার পরিচালিত বিদ্বেষ প্রচারকারী সংস্থা আমেরিকান ফ্রিডম ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ। বর্ণবাদী ও ঘৃণাসম্বলিত বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য তারা সুপরিচিত। নিউইয়র্ক পার্ক ৫১ মসজিদ বিতর্ক নির্মাণে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী সংস্থা।

Americans for America : একটি কলোরাডোভিত্তিক লবিয়িং- ভুল তথ্য প্রদর্শনকারী সংস্থা যারা দেশজুড়ে মুসলিম-বিরোধী আইন প্রয়োগ ও প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করে।

Americans for Peace and Tolerance : এটি বুস্টনভিত্তিক লবিয়িং গ্রুপ। যার প্রধান কার্যাবলি হচ্ছে আমেরিকায় ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে ষড়যন্ত্রমূলক তথ্যের প্রচারণা।

America's Survival : মুসলিম-বিরোধিতায় ইন্ধন জোগাতে অলীক তথ্য উপস্থাপনকারী সংস্থা আমেরিকা'স সারভাইভাল। প্রাথমিকভাবে তাদের ওয়েবসাইট ষড়যন্ত্রমূলক তথ্যাবলি প্রচারে নিয়োজিত।
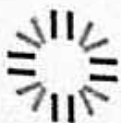
Ayaan Hirsi Ali Foundation : ইসলামোফোবিয়া প্রচারে নানা বক্রোক্তি ও চিরচেনা পদ্ধতিতে এরা কাজ করে। এটি আয়ান হিরসি আলী প্রতিষ্ঠিত স্বঘোষিত মানবাধিকার সংস্থা- আয়ান হিরসি আলি ফাউন্ডেশন। (আয়ান হিরসি আলী সোমালী বংশোদ্ভূত ডাচ

আমেরিকান, ইসলামের বিরুদ্ধে লিখিত তার অনেকগুলো বই প্রকাশিত হয়েছে।)

Center for Security Policy : ফ্রাঙ্কগেফনেই প্রতিষ্ঠিত একটি মুসলিম-বিরোধী প্রোপাগান্ডা গ্রুপ। মুসলিম-বিরোধী উদ্দীপনাকে উজ্জীবিত, উন্নত ও সমর্থিত করা যাদের অন্যতম কাজ।

Christian Action Network : এ দলের মূল কাজ হচ্ছে সরাসরি মেইল প্রেরণ, মুভি নির্মাণ, ইন্টারভিউ, প্রিন্ট মিডিয়াসহ নানাভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে অবান্তর তথ্যসন্ত্রাস চালানো।

CLARION project

Clarion Project : একটি মুসলিম-বিরোধী প্রচারণা দল যারা ইসলাম-বিরোধী প্রোপাগান্ডা বাস্তবায়ন এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে মুভি নির্মাণ ও ও সম্প্রসারণ করে। যেমন– Obsession : Radical Islam's War Against the West Ges The Third Jihad : Radical Islam's Vision for America

CAMERA

Committee for Accuracy in Middle East Reporting : ৬১৫,০০০ ডলারেরও বেশি তাদের প্রাপ্ত আয়। এটি একটি লবিয়িং ও মিডিয়া মনিটরিং সংস্থা। যা অসত্য তথ্য উপস্থাপন, মূলধারার আমেরিকান মুসলিম ও মুসলিম সংস্থাসমূহের সম্মানহানি করা ও ইসলাম-বিরোধী এজেন্ডা বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।

Concerned Women for America : একটি জননীতি নির্ধারণী নারী সংস্থা। যারা ফ্লোরিডা ও নর্থ ক্যারোলিনায় মুসলিম-বিরোধী নীতি নির্ধারণে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকে। সিডাব্লিউএ বিভিন্ন আয়োজনে মুসলিম-বিরোধী বক্তাদের জোগান দেয়।

CBN

Christian Broadcasting Network : খ্রিস্টধর্ম প্রচারক প্যাট রবার্টসন প্রতিষ্ঠিত প্রধানতম মিডিয়া প্লাটফর্ম সিবিএন। প্যাট রবার্টসন ইসলামের বিরুদ্ধে

কুসংস্কার প্রচার করে, যথা- "ইসলাম আসলে অকল্যাণকর ধর্ম, ইসলাম একটি নৈরাজ্যের ধর্ম"– এ জাতীয় রব তুলতে এ মিডিয়া ব্যবহৃত হয়।

Christians and Jews United for Israel : এ সংস্থা মুসলিম-বিরোধী বিভিন্ন বিষয়বস্তু তাদের মিডিয়া প্লাটফর্মে প্রচার-প্রচারণায় নিয়োজিত।

Citizens for National Security : ফ্লোরিডাভিত্তিক গবেষণা সংস্থা যারা মুসলিম-বিরোধী ষড়যন্ত্র নীতি ও মিথ্যে ত্বরান্বিত করতে তারা একেবারে আঁটঘাট বেঁধে নেমেছে।

Conservative Forum of Silicon Valley : ক্যালিফোর্নিয়াভিত্তিক মুসলিম-বিরোধী তৃণমূল সংগঠন। যা ধর্মান্ধতায় সমাকীর্ণ পোস্ট করে সোস্যাল মিডিয়াগুলোতে। এরা বিভিন্ন সেমিনারে ইসলাম-বিরোধী বক্তা সরবরাহ করে।

David Horowitz Freedom Center :

মুসলিম-বিরোধী লবিয়িং, মিডিয়া ও মনগড়া তথ্য প্রচারকেন্দ্র। জিহাদ ওয়াচ, ফ্রন্ট পেজ ম্যাগাজিন, ট্রুথ রিভল্ট ডটকম, ইসরায়েল নিরাপত্তা প্রজেক্ট, ডিসকভার দ্য নেট ডটকম, স্টুডেন্ট ফর একাডেমিক ফ্রিডম এবং ইন্ডিভিজুয়াল রাইট ফাউন্ডেশনের মতো বর্ণবাদ ও মুসলিম-বিরোধী কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেয়।

Eagle Forum & Eagle Forum Education and Legal Defense Fund : ইসলাম-বিরোধী নব্য রক্ষণশীল লবিয়িং গ্রুপ যারা বিভিন্ন প্রদেশে ইসলাম-বিরোধী আইনি তৎপরতায় যুক্ত থাকে।

Endowment for Middle East Truth : এটি একটি নীতি নির্ধারণী লবিয়িং সেন্টার হিসেবে কাজ করে। যা ইসলাম-বিদ্বেষী অলীক তথ্য প্রচারে লিপ্ত।

FLAME Facts and Logic about the Middle East

Facts and Logic about the Middle East : সানফ্রান্সিসকোভিত্তিক গবেষণা সংস্থা যারা মুসলিম-বিরোধী প্রপাগান্ডা উদ্ভাবন ও বিকাশে লিপ্ত। স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশের পূর্বে এফএলএমই CAMERA-এর চ্যাপ্টার হিসেবে পরিগণিত হতো।

Florida Family Association : একটি ডানপন্থি বিদ্বেষমূলক সংস্থা যা মুসলিম-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ও ষড়যন্ত্রকারী সংস্থা।

FREEDOM of CONSCIENCE DEFENSE FUND

Freedom of Conscience Defense Fund: একটি আইনি সংস্থা যারা আমেরিকার মুসলিমদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা লড়ে এবং স্কুলে ইসলামোফোবিয়া প্রচারে উদ্যোগ নেয়।

GATESTONE INSTITUTE INTERNATIONAL POLICY COUNCIL

Gatestone Institute : একটি নিউইয়র্ক সিটিভিত্তিক মুসলিম-বিদ্বেষী সংস্থা যারা মুসলিম-বিরোধী অসত্য গল্প তৈরি ও বিস্তারে অবদান রাখে।

GLOBAL FAITH INSTITUTE

Global Faith Institute : এটি খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক সংস্থা যারা মুসলিম-বিরোধী মিডিয়া বিষয়বস্তু, ষড়যন্ত্রমূলক নীতি প্রণয়ন ও ভুল তথ্য উৎপাদন ও বিস্তারে পটু।

Forum for Middle East Understanding : শিক্ষা বিস্তারের ছদ্মবেশে এরা ইসলাম-বিরোধী নীতি ও তথ্য বিচ্ছুরণের কাজের আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

Foundation for Advocating Christian Truth: খ্রিস্টান **answeringmuslims.com** ওয়েবসাইট পরিচালনায় নিয়োজিত সংস্থা এফএসিটি। একটি মুসলিম ও ইসলাম-বিরোধী সাইট যারা অসত্য তথ্য উপস্থাপন করে।

FDD DEFENSE OF DEMOCRACIES

Foundation for Defense of Democracies : একটি নব্য রক্ষণশীল লবিয়িং সংস্থা যারা ইসলামোফোবিয়ার সন্ত্রাসী যুদ্ধের বর্ণনাধারায় নীতি ও চর্চাকে ত্বরান্বিত করে।

Investigative Project on Terrorism : একটি প্রদাহী গ্রুপ, ইসলাম-বিরোধী কুসংস্কার বিনির্মাণ ও প্রচারই যাদের মুখ্য কাজ।
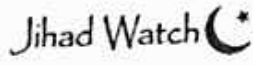
Jihad Watch : ডেভিড হরোউইটয ফ্রিডম সেন্টার আশ্রিত একটি আধুনিক মিডিয়া প্লাটফর্ম জিহাদ ওয়াচ।

Lawfare Project: ৪৩০,০০০-এরও বেশি ডলার তারা ফিডালিটি চ্যারিটেবল থেকে আয় করে।

মিডেল ইস্ট ফোরামের সাবেক পরিচালক প্রতিষ্ঠিত ইসলাম-বিরোধী গ্রুপ হচ্ছে লফেয়ার প্রজেক্ট। যাদের মৌলিক কার্যকরণের মধ্যে ইসলামোফোবিয়া ষড়যন্ত্র ও প্রোপাগান্ডার আয়োজন অন্যতম।

Middle East Forum: ইসলাম-বিরোধী নীতি নির্ধারণী কেন্দ্র যারা অবান্তর বিষয়বস্তু নির্ধারণ, ঘৃণা জিইয়ে রাখা, প্রোপাগান্ডা, অসত্য তথ্য প্রচার এবং ইসলাম-বিরোধী সংস্থাসমূহকে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান ইত্যাদি বিষয়কে নিজেদের কার্যক্রম হিসেবে সাজিয়েছে।

Middle East Media Research Institute :

প্রায় ১২০০,০০০ ডলার এরা স্কুয়াব চেরিট্যাবল থেকে আয় করে। এটি একটি ছদ্মবেশী গবেষণা সংস্থা যারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের বিভিন্ন পাঠ্যের ভুলভাবে ভাষান্তর করে। এর মাধ্যমে মুসলিম-বিরোধী প্রোপাগান্ডার প্রতি জনসমর্থন ও সাধুবাদ হাসিল করতে পারে।

National Review Institute : একটি নব্য রক্ষণশীল পত্রিকা যারা ইসলাম-বিরোধী ফিচার তৈরি ও প্রকাশনা ও ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র ও প্রোপাগান্ডা নির্মাণ যাদের অন্যতম কাজ।

Society of Americans for National Existence (sane) : ডেভিড ইয়ুরুশালমি প্রতিষ্ঠিত একটি ইসালামবিরোধী নীতি নির্ধারণী সংস্থা যারা ইসলামকে অপরাধী সাজাতে বদ্ধপরিকর। ২০১৫ সালে সেভ এ নেছামা ইভোমেন্ট নামক সংস্থার সাথে জুড়ে নিজেকে পুনরায় চিহ্নিত করেছে।

Straight Way of Grace Ministry : এই ইসলাম-বিরোধী সংস্থার কাজ হলো ইসলাম নিয়ে চক্রান্ত সাজানো ও ইসলাম চর্চা-বিশ্বাসের অসম্মান করার পথ অনুসন্ধান করা এবং আমেরিকান মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের সয়লাব করা।

Unconstrained Analytics : এটি একটি জালিয়াতি নীতি নির্ধারণী সংস্থা জাতীয় সুরক্ষার সাথে তালমিলিয়ে তারা মুসলিম-বিরোধী উপকরণ তৈরি করে।

Oak Initiative : একটি জাতীয় সংস্থা যারা মুসলিম-বিরোধী একরোখা চিন্তন উন্নয়নের কাজ করে।

Proclaiming Justice to the Nations : একটি শিক্ষামূলক সংস্থা যারা ষড়যন্ত্রমূলক তত্ত্ব প্রচারের পাশাপাশি ইসলামি বিশ্বাস ও চর্চাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে বিভিন্ন মিথ্যার রূপায়ণ করে।

Religious Freedom Coalition : একটি আইনি সংস্থা যারা সভ্যতার সংকটের পক্ষাবলম্বন করার সাথে সাথে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা করে।

United West, aka Security Research Associates : একটি ফ্লোরিডাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান যারা ইসলামকে শত্রুভাবাপন্ন করে চিত্রিত করে।

এছাড়া আরও যে মানবাধিকার সংস্থা এই নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত– অক্সফাম, আমেরিকান রেড ক্রস, ইউনিসেফ, দ্য সেলভেশন আর্মি, সাওথার্ন প্রোভার্টি ল সেন্টার, **ACLU**

আরও যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্কের অধীন– কলম্বিয়া স্কুল অব নার্সিং, স্ট্যান্ডফোর্ড ইউনিভার্সিটি, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, টিচ ফর আমেরিকা, প্রিন্সটোন ইউনিভার্সিটি।

মেগা ফান্ডারস অব ইসলামোফোবিয়া
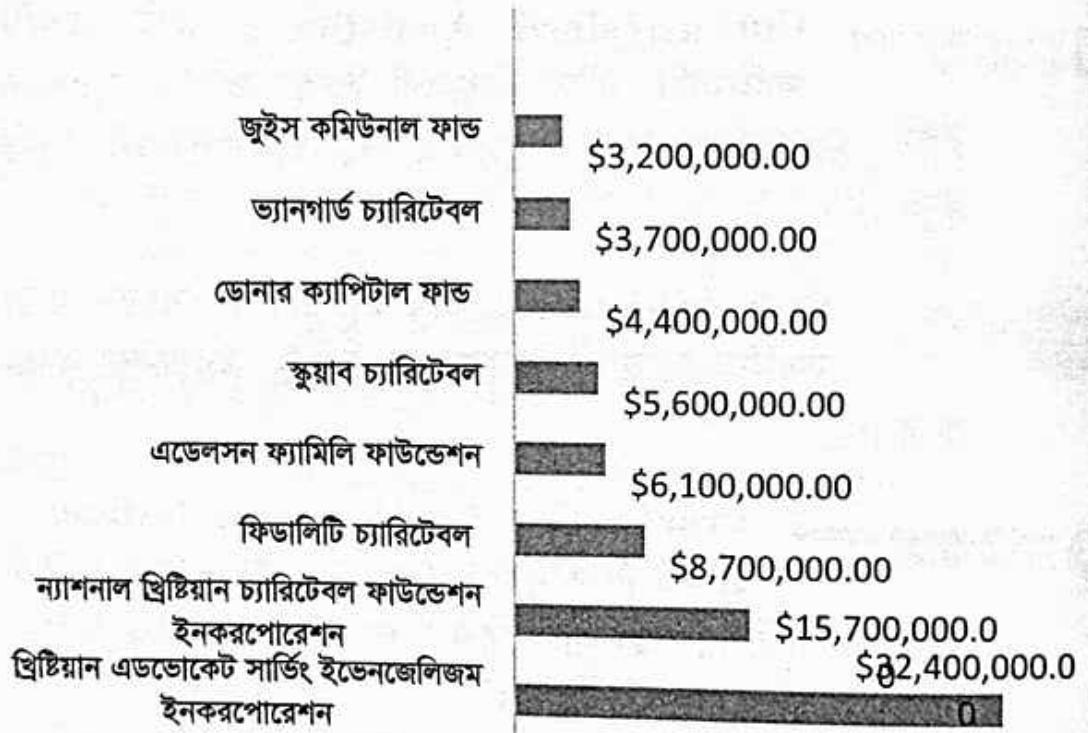
রাজনীতি ও আইনে বিরূপ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

প্রায় এক দশক ধরে ইসলামোফোবিয়া ও মুসলিম-বিরোধী উন্মত্ততা নির্বাচনি রাজনীতির মজ্জার সাথে মিশে গেছে। বস্তুত চলমান গবেষণায় দেখাচ্ছে মুসলিম-বিরোধী মানসিকতা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বেড়েই চলেছে। তা অভ্যন্তরীণ বা বহির্গত সন্ত্রাসী ঘটনা নয় যা অনেকে ভাবতে পারেন।

ইসলামোফোবিয়া যদিও রাজনীতির সাথে স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচন আনুষ্ঠানিক ক্ষমতারোহণের জন্য ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্কের জন্য একটি বাতায়ন উন্মুক্ত করেন।

ট্রাম্প ইনকর্পোরেশন. মুসলিমবিরোধী দানব-হাইড্রা[৭৬]

ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্ক বর্তমান প্রশাসনে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে, ট্রাম্পের বক্তৃতা ও তার অনুসৃত নীতিতেও এর বড় রকমের প্রভাব পড়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনে এক ডজনেরও বেশি ব্যক্তি সরাসরি এ নেটওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এটা অনস্বীকার্য যে, মুসলিম-বিরোধী গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও বৈষম্য ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতা লাভ পেয়েছিল। যদিও অসংখ্য ইসলাম-বিরোধী নীতিমালা তার ক্ষমতারোহণের পূর্বেই ছিল। যেমন– Countering Violent Extremism Ges Terrorist Screening Database (এসব মূলত মুসলমানদের হয়রানি করার কূটকৌশল।) পূর্বপ্রতিষ্ঠিত নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশের মুখোশ এই প্রশাসন ছুড়ে ফেলেছে এবং ইসলামোফোবিয়ার স্পষ্ট রূপ প্রকট হয়েছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার ৪৫তম প্রেসিডেন্ট

ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্কের অভীষ্ঠ লক্ষ্যের সাথে ট্রাম্পের বক্তৃতা ও নীতি সরাসরি সমর্থন করে। কংগ্রেসের যৌথ আয়োজিত প্রথম বক্তব্যেই সে 'মৌলবাদী ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ' শব্দগুচ্ছ প্রয়োগ করে, যা সরাসরি ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্কের হাতিয়ার। তখন থেকে অসংখ্য বার এই শব্দ ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে তার বক্তব্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

"প্রয়োজনে যেকোনো পন্থায়ই হোক না কেন, উগ্র ইসলামি সন্ত্রাসবাদ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। আদালত আমাদের অধিকার অবশ্যই ফিরিয়ে দেবে, আমাদের হতে হবে কঠোর।" (১৮/৮/১০১৭ বিকাল ৪ টা ৬ মিনিটে টুইট করে।)

---

[৭৬] গ্রীক রূপকথায় **'হাইড্রা'** এমন এক ক্ষুদ্রকায়-শক্তিশালী ন'মাথার জলজ সাপাকৃতির দৈত্য যার একটি শিরশ্ছেদ করলে তাজা ক্ষত থেকে জন্ম নেয় দুটি শির-ব্রিটানিকা। এখানে ট্রাম্প প্রশাসন ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্কে কতটা অক্ষয় তা বুঝাতে রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

একই মাস অক্টোবরেই সে পুনরায় মার্কিন আর্মি অফিসার জেনারেল জন পার্সিং শুকরের রক্তে ডুবানো গুলি দিয়ে মুসলমানদের গুলি করার (১৯০১-১৯১৩ *সালের ফিলিপাইনের মোরা বিদ্রোহ চলাকালীন ঘটনা-time.com*) গল্প বলার ছলে মৌলবাদী ইসলামি সন্ত্রাসবাদ প্রসারের মিথ্যা রব তোলে। "জেনারেল পার্সিং সন্ত্রাসী আটক করে যা করতেন তা অধ্যয়নের ফলে দেখা যায় মৌলবাদী ইসলামি সন্ত্রাস আমেরিকায় জায়গা করে নিতে পারেনি" যা ছিল যুক্তরাজ্যে অপরাধের হার বৃদ্ধির জন্য দায়ী। নভেম্বরে সে যুক্তরাজ্যের মুসলিম-বিরোধী সংগঠনের পক্ষ নিয়ে তিন বার টুইট করেছে।

অধিকন্তু বিবৃতি ও টুইটের পাশাপাশি ট্রাম্প মুসলিম-বিরোধী নীতি ত্বরান্বিত করেছে যাতে ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্কের লাভ হচ্ছে ষোলোআনা। এর মধ্যে অতি আলোচিত 'অসাংবিধানিক মুসলিম নিষিদ্ধকরণ'।

টুইটে প্রদত্ত বিবৃতি

- 'নিউ ইয়র্ক সিটি শীর্ষ পুলিশ আইনিভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়েছে। সতর্কতা আমাদের সুরক্ষার চাদরে আবৃত করে। আমাদের নিরাপদ রাখতে কমিশনার কেলি ও মেয়র ব্লুমবার্গের প্রয়াসকে আমি সমর্থন করি। (১৩ মার্চ ২০১২, দুপুর ৩:২৬)
- সিরিয়ান মুসলিম আমেরিকা হয়ে মেক্সিকোতে অনুপ্রবেশ করেছে। আর এখন ওকলাহোমা ও কানসাসে ঢুকছে, অভিনন্দন? (১৩ অক্টোবর ২০১৫, রাত ১২:৩০)
- একজন প্রতিবেদক যে ডাটাবেজ-প্রতিবেদন তৈরি করে তার পক্ষাবলম্বী আমি নই। আমেরিকাকে সুরক্ষিত রাখতে নজরদারি তালিকা, অতন্দ্র প্রহরার মাধ্যমে ইসলামি সন্ত্রাসবাদকে প্রতিহত করতে হবে। (২০ নভেম্বর ২০১৫, দুপর ২:৫১)
- আমেরিকার দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে ১৩ সিরীয় শরণার্থী ধরা পড়েছে, আরও কতজন এটা করেছে? **আমাদের মজবুত প্রাচীর দরকার**। (২২ নভেম্বর ২০১৫, রাত ১১:৫৩)
- যুক্তরাজ্য তাদের মুসলিম সমস্যা সমাধানে প্রচুর কোশেশ করছে, সত্য বলতে ঘটমান অবস্থা বুঝার মতো জ্ঞানী সবাই। খুবই দুঃখজনক! (১০ ডিসেম্বর ২০১৫, সকাল ৮:৪৯)

- ব্রাসেলসে ভয়ানক আক্রমণ সত্ত্বেও অনভিজ্ঞ হিলারি চায় বর্ডার দুর্বল ও উন্মুক্ত থাক, যাতে মুসলিমরা উড়ে এসে জুড়ে বসতে পারে। কোনো সুযোগ নাই! (২২ মার্চ ২০১৬, রাত ৯:৫৯)
- এটা ঠিক যে কতিপয় দেশের জন্য ভ্রমণ নিষিদ্ধকরণ আমাদের দরকার। তবে এসব রাজনৈতিকভাবে বলা কিছু শব্দ নয় যা আমাদের জনগণকে সুরক্ষা প্রদানে সমর্থ হবে না। (৫ জুন ২০১৭, রাত ১০:২০)
- যেহেতু নিষেধাজ্ঞা একজন বিচারকের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল অনেক বিপজ্জনক লোক গণহারে প্রবেশ করতে পারে আমাদের দেশে। কী এক ভয়ানক সিদ্ধান্ত! (৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, বিকাল ৫:৪৪)
- বিচার বিভাগের মূলত ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞায় পানি ঢেলে না দিয়ে এর সাথেই থাকা উচিত ছিল, রাজনৈতিকভাবে সঠিক এক সংস্করণ তারা এসসির কাছে অর্পণ করেছে। (৫ জুন ২০১৭, সন্ধ্যা ৭:২৯)

এটা আসলেই হতাশাব্যঞ্জক যে ২৬ জুন ২০১৮-তে উচ্চ আদালত মুসলিম নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ৯ জন বিচারকের ৫ জনই মুসলিম-বিরোধী কুসংস্কার বাস্তবায়নে মুসলিম নিষিদ্ধকরণ কোনো সমস্যা নয় বলে রায় দেয়। ট্রাম্পের মুসলিম-বিরোধী কার্যক্রম শুধু মুসলিম নিষেধাজ্ঞাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ট্রাম্প প্রশাসন Countering Violent Extremism-Gi bvg cv‡ë Countering Islamic Extremism নাম দেয়। যখন ধারাবাহিকভাবে শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাসের সয়লাব এফবিআই ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের দ্বারা স্বীকৃত হতো, তাদের ছাপিয়ে সব দায় মুসলিমদের ঘাড়ে চাপাতে তারা ছিল বদ্ধপরিকর।

১. পূর্বে যখন নিরপেক্ষ শব্দে আরওপিত ছিল প্রোগামটি তখনও তারা একচেটিয়াভাবে আমেরিকান মুসলিম নাগরিকদের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতো।
২. প্রোগ্রামটি নিছক মিথ্যা নিরপেক্ষতা দূর করে স্পষ্টত আমেরিকান মুসলিম নাগরিকদের দিকে নজর তাক করে এবং তাদের লক্ষ্যবস্তু বানায়। যদিও গবেষণামূলক ডাটা সরকারবিরোধী সহিংসদের উগ্রবাদ প্রমাণ করে, যা দেশের জন্য সবচে বড় হুমকি।

২০১৭-এর ডিসেম্বরে জাতীয় নিরাপত্তানীতি ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্কের নীতি ও ভাষার প্রচার ও বিন্যাসকে প্রশাসনের ভিতরে আরও পোক্ত করে। উদাহরণস্বরূপ এতে বলা হয়েছে—

> "আইএস ও আল-কায়দার মতো জিহাদী সন্ত্রাসবাদীরা বর্বর মতাদর্শ প্রচার করে যাচ্ছে। সরকারের ধ্বংসসাধন ও নির্দোষ ধর্মত্যাগীদের নৃশংসভাবে হত্যা করার কথা বলে। জিহাদী সন্ত্রাসবাদীরা তাদের অধীনস্থদের শরিয়াহ আইন মানতে বাধ্য করে।"

এখানে শরিয়াহ শব্দটিকে যে পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়েছে, তা মৌলিকভাবে মুসলিম-বিদ্বেষী গোষ্ঠীসমূহের অনুসৃত পদ্ধতি। এরা শরিয়াহকে মনে করে গণতন্ত্রবিরোধী ও নিপীড়ন-সহিংসতার অস্ত্র। অথচ শরিয়া বলতে মূলত নৈতিক অবকাঠামোকে বোঝায়।

হাইড্রা প্রশাসন সম্পাদিত মুসলিম-বিরোধী বিবৃতি ও কার্যকলাপ

কিলিয়ান কনওয়ে : কনওয়ে সিএসপির সাথে এক হয়ে কাজ করেছে। এ সংস্থার সাবেক প্রেসিডেন্ট ও সিইও ছিল সে। সংস্থাটি তাদের জন্য অসংখ্য জরিপ চালিয়েছে। ২০১৫ সালে আমেরিকান মুসলিমদের মিথ্যা বাক্যবাণে জর্জরিত করতে সিএসপির কমিশন পেয়ে কনওয়ের দ্বারা অবান্তর জরিপ পরিচালিত হয়েছিল। মুসলিম নিষিদ্ধকরণের পরিকল্পনা ট্রাম্প যখন প্রথম ঘোষণা করে তখন এই ঘৃণে ধরা ও বিতর্কিত জরিপকে ন্যায়বিচার হিসেবে উল্লেখ করেছিল।

ফ্রেড ক্লিটস: ফ্রড ক্লিটস সিএসপি রিপোর্টের সহ-রচয়িতা। যার দাবি ছিল সরকারের উচিত 'শরিয়া অনুসারী আইনজ্ঞদের ও এর চর্চাকে আমেরিকান নাগরিকদের নির্বাসনের আইনি প্রক্রিয়া হিসেবে নির্ধারণ করা। বিবৃতি দেয় যে, 'অধিকাংশ মুসলিম ও ইসলামি কর্তৃপক্ষ জিহাদ ও শরিয়ার আধিপত্য বিস্তার করে অথবা অন্তত সমর্থন করে'। ইউরোপে 'নো গো জোন' নামে মুসলিম-বিরোধী মিথ-এর জন্ম দিয়েছে, ইসলামী শরিয়া আইন দ্বারা পরিচালিত স্থান বলে এ স্থানের নামে গুজব রটিয়েছে।

দাবি তোলে 'সিংহভাগ আমেরিকান মুসলিম সংস্থা ও মসজিদ জিহাদী এজেন্ডা বাস্তবায়নে গোপনে কাজ করছে বলে, রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তাদের নিরপেক্ষ হতে হবে।' রব তোলে যে 'মুসলিম সম্প্রদায়গুলোতে সমস্যা

বিদ্যমান, তারা মৌলবাদী বিশ্বচিন্তায় নিমগ্ন যা আধুনিক সমাজব্যবস্থার বিচ্যুতি কামনা করে এবং বৈশ্বিক শাসনের মাধ্যমে বিশ্বের সবার ওপর শরিয়া আইন চাপাতে চায়।'

স্টিফেন মিলার: স্টফেন ব্যানন-এর সাথে মিলে সর্বপ্রথম মুসলিম নিষেধাজ্ঞার খসড়া তৈরি করে। লিখেছে 'মুসলমান যেখানেই পাওয়া যাক না কেন, তাদের বিশ্বের সব দেশেই পাওয়া যায়, তারা জিহাদী তত্ত্বের অনুগামী'। ডুক ইউনিভার্সিটিতে ডেভিড হরোউইটয ফ্রিডম সেন্টারের মাধ্যমে Terrorism Awareness Project চালু করেন এবং পরিচালনা করে। প্রজেক্টি দাবি করে তাদের চূড়ান্ত মতামত হলো, 'উগ্রবাদী বামপন্থি এবং তাদের ইসলামি মিত্র মিলে আমেরিকান মূল্যবোধ বিনষ্ট করে এবং সন্ত্রাসের সময় নিজের পিঠ বাঁচাতে দেশকে নিরস্ত্রকরণে আত্মনিয়োগ করে। 'আমেরিকার জিহাদ সম্পর্কে যা জানা উচিত' এবং 'খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ একটি যুদ্ধ' দেশজুড়ে বিভিন্ন ক্যাম্পাস ও সংবাদপত্রের শিরোনামে প্রচারণা চালায়।

A Time to Kill শিরোনামে একটি কলামে সে বলে, "ইসলাম কতটা শান্তিপ্রিয় ও সদয় ধর্ম তা আমরা অনেক শুনেছি! এসব যতবারই বলা হোক প্রকৃত সত্য কিছুতেই পাল্টাবে না। প্রকৃত সত্য হলো, লাখ লাখ উগ্রপন্থি মুসলমান আপনি শুধু একজন ইহুদি-খ্রিস্টান অথবা আমেরিকান হওয়ার কারণে আপনার মৃত্যুতে উল্লাস করবে।" সে আরও বলে, "ইসলামি সন্ত্রাসবাদীরা এই দেশে বসবাসরত প্রতিটি নারী-পুরুষ ও শিশুর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে"

মাইক পম্পেই: তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, ইসলামিক সোসাইটি অব উইচিতা সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করেছে। তিনি 'সিকিউরড ফ্রিডম রেডিও'তে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য দেন যে, মৌলবাদী ইসলামিক সন্ত্রাসী সরকার ও ইসলামি বিষয়াদির বিস্তার জনগণকে সন্ত্রাসী কাজে জড়িত হতে উদ্বুদ্ধ করছে। আমেরিকান মসজিদ ও ইসলামি সংস্থাকে কেন্দ্র করে তিনি একটি কাল্পনিক সন্ত্রাসী অবকাঠামো তৈরি করে জোর প্রচারণা চালান। ২০১৪ সালে একটি গির্জায় আগত জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ইসলামকে যারা একমাত্র জীবনবিধান হিসেবে বিবেচনা করে তারাই আমেরিকার জন্য হুমকিস্বরূপ। তিনি 'ওয়ার অন টেরর'কে মনে করেন খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে ইসলামের যুদ্ধ।

বোস্টনে বোমাহামলার পর এ সহিংসতায় মুসলিমরা জড়িত, এই দাবি নিয়ে পম্পেই গিয়েছিলেন হাউজ ফ্লোরে। সেখানে মিথ্যা দাবি তুলে বলেন, মুসলিম নেতারা এ ঘটনার কোনো রকম নিন্দা জানায়নি। আমেরিকার মসজিদ ও ইসলামি আইনি সংস্থার অর্থায়নের মাধ্যমেই উগ্রবাদের প্রতি নিশ্চুপ থাকার এ প্রচলন হচ্ছে বলে সে সমালোচনা জুড়ে দেয়। পম্পেইয়ের মতে, এ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নীরবতা হলো ইসলামে বিশ্বাসীরা শান্তিতে বিশ্বাস করে না এবং আমেরিকাজুড়ে মুসলিম নেতারা এহেন কাজের সাথে জড়িত আছে।

জন বোল্টন: গেটস্টোন ইনস্টিটিউট-এর কর্ণধার হিসেবে কাজ করছেন। এটি নিউইয়র্কভিত্তিক একটি আইনি সংস্থা যারা আমেরিকাবাসীদের এই বলে সতর্ক করে যে, 'জিহাদিদের ক্ষমতাগ্রহণ' ইউরোপের শ্বেতাঙ্গদের জন্য ব্যাপক মহামারিরূপে আবির্ভূত হবে।

হিদার নিউয়ের্ট: ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ট ট্রাম্প সম্পর্কে মুসলমানদের উদ্বেগ নিয়ে নিউইয়র্ক টাইমসের একটি রিপোর্টকে কেন্দ্র করে হিদার উপহাস করে টুইটে বলেন 'তাদের আইএসআইএস-এর সাথে মিলিত হওয়া উচিত'।

২০১৩ সালে মিনোসোটা ইয়োমকা (প্রতিযোগিতা আয়োজক সংস্থা, বিশেষত সাঁতার।) ঘোষণা হওয়ার পর মুসলিম মেয়েদের ধর্মীয় পোশাকে এক প্রাইভেট সাঁতার ক্লাসের আয়োজন করতে হয়। একে কেন্দ্র করে হিদার দাবি তোলেন 'শরিয়া আইন এখন সব পরিবর্তন করে ফেলছে।' একটি বিভাগে সোমালি হিজাব পরিহিতা দুই মেয়ের ছবি ব্যবহার করে শিরোনাম দেয়া হয়– 'শরিয়া আইন'।

ওয়াইল্ড ফেরিস: জিহাদিরা পশ্চিমাদের সাথে মিলে মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন করেছে। ২০০৮ সালে ক্লারিয়ন প্রজেক্টের অধীনে নির্মিত ছবি The Third Jihad, এর গুপ্ত বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ আন্‌জাম দেয়।

জেফ সিজনস: সিজনস বলে 'উন্মুক্ত ও স্বাধীন বিশ্বে আমরা আবারো এক আধিপত্যবাদী হুমকির মুখোমুখি হয়েছি। এবার সে হুমকি আদর্শিক ও সর্বনাশী ইসলাম'।

ধর্মভিত্তিক শরিয়া আইন... মূলত আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক আইনের সাথে বিরোধপূর্ণ যা গির্জা ও দেশকে আলাদা করে ফেলে, আর উন্নততর পৃথিবীর পথে ফ্রি ডিবেটকে বাধা হিসেবে গণ্য করে।

সিবাসটিয়ান গোর্কা: গোর্কা অবান্তর দাবি তোলেন যে, 'সন্ত্রাসবাদ ইসলাম ও কুরআনে বর্ণিত 'সামরিক' অংশে প্রোথিত। যারা ধর্মের ভূমিকাকে উপস্থাপন করে তারা বাস্তব দুনিয়ার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়াকে অপনোদন করছে।

তার লিখিত Defeating Jihad : The Winnable War নামক বইতে দাবি করে, আমেরিকান সেনাবাহিনী সন্ত্রাস ও উগ্র সহিংসবাদী নয় তা স্বীকৃত হওয়া দরকার তবে বৈশ্বিক জিহাদি আন্দোলন এবং আধুনিককালের সর্বগ্রাসী মতবাদ ইসলামের সামরিক ইতিহাসে প্রোথিত আছে।

ধর্ম ও জাতিগত বিদ্বেষকে স্বাভাবিক বিবেচনায় সমার্থবোধক বলে সে বিশ্বাস করে। ট্রাম্প নির্বাচনের পর ফ্লেরিডার জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে গোর্কা একটি মৃত বাদামি চামড়ার লোকের ছবি প্রদর্শন করে যার শরীরে রাইফেলের নির্যাতনের ছাপ দৃশ্যমান ছিল। শ্রোতারা যখন আনন্দে হর্ষধ্বনি করছিল সে চিৎকার করে বললো– **'আমরা এখন জিততে পারি, আমরা বিজয় ছিনিয়ে নিতে পারি'**।

ফক্স নিউজে প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে সে বলে, আমেরিকা ছিল একটি জুডো-খ্রিস্টান জাতি, মুসলিম শরণার্থীদের গ্রহণ করা তাদের জন্য জাতীয় আত্মহত্যার শামিল।

স্টিভ ব্যানন: স্টিফেন মিলারের সাথে মিলে ব্যানন মুসলিম নিষেধাজ্ঞার প্রথম নীল নকশা প্রণয়ন করেন। ইসলাম শান্তির ধর্ম নয়, ইসলাম বশ্যতা ও দাসত্বের ধর্ম বলে কটাক্ষ করেন। তিনি ইসলামকে সবচেয়ে উগ্রবাদী ধর্ম হিসেবে উল্লেখ করেন।

রব তোলে, হিটলার ও নাজিইজম থেকেও অন্ধকারজনক কিছু হচ্ছে ইসলাম এবং ইসলামকে রাজনৈতিক মতাদর্শ ও শরিয়া আইনকে নাজিবাদ, ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজমের সাথে তুলনা করে। ব্যানন তার বক্তব্যে উল্লেখ করে, আমরা ইসলামি ফ্যাসিবাদের সাথে সুস্পষ্টভাবে যুদ্ধের ময়দানে আছি। মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মাঝে অস্তিত্বহীন এক যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে সে যুক্ত করে "আমি বিশ্বাস করি উগ্রবাদী ইসলামের বিরুদ্ধে খুব খুব খুব আক্রমণাত্মক অবস্থান নেয়া উচিত।" শরিয়া আইন টেক্সাসের ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে এবং ব্লাসফেমি বিষয়ে শরিয়া আইনের অনুসরণ চলছে– বলে মূল ধারার মিডিয়াগুলোতে অবান্তর আওয়াজ ওঠান স্টিভ ব্যানন।

ডকুমেন্টারিজাতীয় তিন ভাগে বিভক্ত একটি ছবির রূপরেখা প্রণয়ন করেন ব্যনন। যার আলাদা আলাদা নাম হলো the culture of intolerance, radical Muslims I enablers among us. আর সামগ্রিকভাবে ব্যানন এর নামকরণ করে– Destroying the Great Satan: The Rise of Islamic Fascism in America.

বৃটবার্ট নিউজ নেটওয়ার্কে 'রাজনৈতিক সঠিকপন্থা মুসলমান ধর্ষণ সংস্কৃতিকে দমন করেছে' 'জন্ম নিয়ন্ত্রণ মেয়েদের আকর্ষণহীন ও পাগলাটে করে তোলে' 'উপাত্তঃ পশ্চিমা যুব মুসলিমরা হলো টিকিং টাইম বোমার মতো যেন উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসের সাথে ক্রমবর্ধমান এক সহানুভূতি'। এসব উপহাস মার্কা শিরোনামে সংবাদ প্রচার করেন ব্যানন।

মাইকেল ফ্লিনঃ 'আমি ইসলামকে ধর্ম মনে করি না। আমি মনে করি এটি একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ। ইসলাম তার ধর্মপরিচয় বিশ্বব্যাপী গোপন করে আছে– বিশেষত পশ্চিমা বিশ্বে ও যুক্তরাষ্ট্রে। টেক্সাসের ডলাস শহরে 'অ্যাক্ট' নামক সংস্থার অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, ইসলাম একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ। নিঃসন্দেহে সে ধর্মের ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে। আরও বলেন যে, আপনারা জানেন আমি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দিনাতিপাত করেছি। ইসলাম হলো ক্যান্সারের মতো। এটা এখন মারাত্মক ক্যান্সারের রূপ ধারণ করেছে।

সাউথটন শহরের আহাভাত তোরাহ ধর্মকেন্দ্রে তিনি বলেন, 'নাজিইজম, ফ্যাসিজম, ইমপিয়ারিলিজম, কমিউনিজম-এর মতো আমরা আরও একটি ইজম-এর সম্মুখীন হচ্ছি। তা হলো ইসলামিজম। এই পৃথিবীর ১.৭ বিলিয়ন মানুষের শরীরে এই ক্যান্সার বাস করছে। এর মূলোৎপাটন করা তাই আবশ্যক।' আরও দাবি তোলেন 'উগ্রবাদী ইসলাম বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। যা আমাকে রাতের বেলা উপলব্ধি করায় যে শয়তান এখনো বিদ্যমান।

আল জাজিরায় প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে ফ্লেইন বলে, সে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত আছে। নিউইয়র্ক পোস্টের সম্পাদকীয় পাতার বিপরীতে লিখে 'ইসলামি বিশ্ব : এক বিরাট ব্যার্থতার নাম'। তার The Field of Fight নামক বইয়ে লেখে, শরিয়া একটি সহিংস আইন যা বর্বর বিশ্বাসে প্রোথিত। টুইট করে বলে, মুসলমানদের ভয় যৌক্তিক বিষয়।

মুসলিম-বিরোধী ধর্মান্ধতাকে বৈধতা প্রদান

"যদি এটি হাঁসের মতো চলে, হাঁসের মতো সাঁতার কাটে, হাঁসের মতো ডাকে তাহলে তা হাঁসই।[৭৭] প্রাবাসীবিরোধী আইনের উদ্দেশ্য ছিল একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা ধর্মের মানুষজনকে লক্ষ্য করে প্রতিকূল ব্যবস্থা গ্রহণ করা।"
মন্টনার গভর্নর স্টিভ বুলক

দেশজুড়ে মুসলিম-বিরোধী বিলের নাড়ি-নক্ষত্র

২০১০-২০১৮-র মধ্যে আমেরিকাজুড়ে মুসলিম-বিরোধী ২০১৮টি বিল ও আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। যার মধ্যকার ৮৩টি বিলের ৭টি মুসলিম-বিরোধী সংস্থার সাথে যুক্ত। এ ৮৩টি বিলের ৭২টি যুক্ত ছিল অসবৎরপধহ চঁনষরপ চড়ষরপু অষষরধহপব (অচচঅ)-এর সাথে। অচচঅ একটি আইনি সংস্থা তবে এর ফান্ডিং সম্পর্কে কোনো তথ্য ইন্টারনেটে সহজলভ্য নয়। যার ৫৭টি বিল লিখিত বা সংশোধনী হয়েছিল ALAC মডেল ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করে। American Laws for American Courts (ALAC) হলো ডেভিড ইয়েরুশালমি রচিত উন্নততর আইন যা মূলত ইসলামের বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত।

শরিয়াহ্‌র বিরুদ্ধে ভীতি প্রচারে রিপাবলিকান অনুমোদন

২০১৭ সালে রিপাবলিকান জাতীয় কমিটি Listening to America নামে একটি অনলাইন জরিপ করে, যাতে নিম্নোল্লিখিত প্রশ্ন দুটি করা হয়–

১. আপনি কি শরিয়া আইনের সম্ভাব্য বিস্তারের বিষয়ে উদ্বিগ্ন?
২. আমাদের দিকে ধেয়ে আসা উগ্র ইসলামি সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করতে আপনি কি আরও কার্যকার পদক্ষেপ প্রত্যাশা করেন?

২০১২ সালে রিপাবলিকান জাতীয় সম্মেলন একটি পার্টি প্লাটফর্মে সংশোধনী আনে, যা কানসাসের স্টেট সেক্রেটারি ক্রিচ কোবাচ-এর মাধ্যমে উত্থাপিত হয়। যা মূলত মুসলিম-বিরোধী বিদেশি আইন প্রণয়নে শক্তি জোগায়। ২০১৬ সালের পার্টি প্লাটফর্মেও একই ধরনের প্রয়াস দেখা গেছে।

[৭৭] এটি একটি প্রবাদ, যা ডাক টেস্ট নামেও পরিচিত। কারো বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সে পরিচিত হয় এটি এ প্রবাদের গূঢ়ার্থ।

ইসলামোফোবিয়ার পরিসমাপ্তি?

ইউরোপ-আমেরিকার অবকাঠামোগত বর্ণবাদের দীর্ঘ ইতিহাসের খুব গভীরে ইসলামোফোবিয়া প্রোথিত। জরিপ বলছে যে, তা আমেরিকান সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাই মুসলিম-বিরোধী ধর্মান্ধতা অদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হবে, এমন আশা করা অমূলক।

যাইহোক, এটাও ভাবার বিষয় যে, মূলধারার জনপরিসরগুলোতে ইসলামোফোবিয়ার কুশীলবদের নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের কাজের দৃশ্যমানতা এবং তাদের কাজের নিন্দা ও সমালোচনার পরিমাণও বেড়েছে। বিদেশিদের নিয়ে আতঙ্কে থাকা রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা মুসলিম রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ নিয়েছে এবং মুসলিমদের অভিবাসনে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরওপের জন্য চাপ প্রয়োগ করেছে। জনগণ এতে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং আদালত ন্যায়ের পক্ষে রায় দেয়। যেসব প্রার্থী ইসলামোফোবিয়ার প্রচারণা চালিয়েছে তাদের চেয়ে বিরোধীদল- যারা প্রচারণা চালায়নি তারা ভালো করেছে। ২০১৬-২০১৮-র মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মুসলিম প্রার্থী পাবলিক অফিসে নির্বাচিত হয়েছে। ২০১৯ সালে কনগ্রেসের হলে দুজন মুসলিম মহিলার অন্তর্ভুক্তি হয়েছে।

জনপরিসরে মুসলিম ও ইসলাম সম্পর্কে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে দীর্ঘমেয়াদি আরও উন্নততর আচরণের সংকেত থাকা সত্ত্বেও ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যে লোকসান করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণের জন্য প্রচুর শ্রম দিতে হবে।

এ প্রতিবেদন তৃতীয়পক্ষ বা নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের জন্য একটি স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি প্রদান করছে, যারা তাদের কলিগদের এবং বিশাল জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে সাহায্য করতে চায় একটি জটিল জাল সম্পর্কে। যে জালটি ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্কের অর্থায়ন করে, সমর্থন জোগায় এবং পৃষ্ঠপোষকতা করে।

যখন বিভিন্ন সমীক্ষা ইসলামোফোবিয়া অর্থায়নের ইঙ্গিত প্রদান করে, এই প্রতিবেদন আমেরিকার মূল ধারার মানবহিতৈষী ও একরোখা ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ তৈরি করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের ক্ষমতায়ন করতে পছন্দ অবহিতকরণ ও সংযুক্তি শনাক্তকরণে অনেক কিছুই করা হয়েছে। তবে এসব প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে কারা অংশীদার ও সহায়তার জন্য আগত আর্থিক প্রণোদনার উৎসই বা কি? (তা অধরাই

থেকে যায়)। যদিও এটা আশা করা বাতুলতা যে, বহু মিলিয়ন ডলারের ইসলামোফোবিয়া শিল্প রাতারাতি উধাও হয়ে যাবে না, তবে পাঠকগণ উল্লেখযোগ্য সংস্থা, বিপুল জনগণ, সমাজসেবক সম্প্রদায় যে চুপ করে বসে থাকার পাত্র নয় তা আঁচ করতে পারবে। যখন মুসলিম-বিরোধী সংস্থাসমূহ তাদের এজেন্ডা ত্বরান্বিত করার জন্য আমেরিকান মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের অপব্যবহার করে চলছে।

আমরা আশাবাদী যে, স্থায়ী কর্মপন্থা, প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং নিবেদিত ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে উন্নয়নশীল সমাজ ও মূল ধারার মিত্ররা মিলে ইসলামোফোবিয়া নেটওয়ার্ককে সমাজের প্রান্ত সীমায় পিছু হটাতে বাধ্য করবে।

ভাষান্তর : হাবিবুর রহমান রাকিব

ইসলামোফোবিয়ার দায়ভার বনাম অপবাদের রাজনীতি

রকিব মুহাম্মদ

তুমুল করতালির মধ্য দিয়ে জেনারেল মঞ্চে উঠে এলেন। মিসরীয় প্রেসিডেন্টের বিশেষ ভাষণের দিন। ২৭ রমজানে সাধারণত প্রেসিডেন্টরা মিসরীয় জাতির উদ্দেশে বিশেষ ভাষণ দেন। সেই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালের রমজানে মঞ্চে এলেন প্রেসিডেন্ট আব্দুল ফাত্তাহ সিসি। প্রেসিডেন্ট সিসি শুরুতেই ইসলামোফোবিয়ার কারণ, অনুঘটক ও বিস্তারিত বয়ান দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রেসিডেন্টের আলোচনার মূল ভাবই হলো ইসলামোফোবিয়ার মৌলিক কারণ, কিছু মুসলিমের কিছু কর্মকাণ্ড। যদিও এবারই প্রথম নয়, বরং ইতোপূর্বে তিনি এমন বলেছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আল আজহারের ইমাম শায়খ তায়্যিব এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। আরও হতাশার বিষয় হলো- আরব গণমাধ্যম ও বিভিন্ন প্লাটফর্মে অনেক আলোচক ও মুহাদ্দিস ইসলামোফোবিয়ার দায় মুসলিমদের ওপরই দিচ্ছেন! কেউ তো এটার খুবই সরলীকরণ করেছেন। সন্দেহ নেই, কিছু ব্যক্তি তুচ্ছ ব্যক্তিস্বার্থে এমনটা করছেন।

ইসলামোফোবিয়া-সংশ্লিষ্ট পরিভাষার পক্ষ-বিপক্ষের আলোচনা করব না আমি। মুসলিম, মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিরুদ্ধে কতটা গভীর ঘৃণা ও - বিদ্বেষ সমাজ, রাজনীতি ও গণমাধ্যমে নির্বিচারে প্রচারিত হচ্ছে তার কিছুটা তুলে ধরবো আমি। এটা একদমই অসমর্থনযোগ্য ঘৃণা ও বিদ্বেষ। আরব ও ইসলামি দুনিয়ায় ইসলামোফোবিয়াকে যতটা আত্ম-সমালোচনা ও সরলীকরণ হিসেবে দেখা হয়, ততটা নয়। বরং শেকড় আরও বহু গভীর ও বহু শাখাপ্রশাখাসমৃদ্ধ।

মুসলিমদের আচরণ দ্বারা ইসলামোফোবিয়ার ব্যাখ্যা করা

কেউ কেউ সদিচ্ছা আবার কেউ হয়তো কুমতলবে মুসলিমদের কথিত আচরণের মাধ্যমে ইসলামোফোবিয়ার ব্যাখ্যায় আগ্রহী হন। তারা মুসলিমের আচরণকে ইসলামোফোবিয়ার মূল কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু এই তত্ত্বের ব্যাখ্যাদাতারা যে বড়ো ধরনের ভুলের শিকার হয়েছেন, তা তারা বুঝতে পারছেন না। তাদের নিকট মুসলমানের শুধু নেতিবাচক ও নিন্দনীয়

অবস্থায়ই সামনে আসে। একটি সমাজের ব্যাপকভিত্তিক ইতিবাচক আচরণকে উপেক্ষা করে শুধু নেতিবাচক দিক দ্বারা পুরা সমাজের ওপর বিধান আরওপ করা খুবই অন্যায়। একটি অবকাঠামোর এক-পঞ্চমাংশের অসুস্থতা কি পূর্ণ কাঠামোর অসুস্থতাকে অনিবার্য করে তোলে?

ভিকটিমকে দায় দেয়ার তত্ত্ব মেনে নেয়ার দ্বারা নাৎসি ও ফ্যাসিস্টদের হাতে সাদা চেক হস্তান্তর করার নামান্তর। অন্যদিকে এদের কুৎসিত চেহারা ফুটে ওঠে যখন আমরা দেখি, ভিকটিমকে দোষারোপ করার নীতি সকল স্থানে প্রয়োগ করে না। বরং সমাজের সংখ্যালঘু প্র্যাক্টিসিং মুসলিমসহ ধর্মীয় ব্যক্তিদের দেয়া হয়। কিছু সরল ও বিভ্রান্ত ব্যাখ্যা অনুমিত হয়, আমাদের জগতের সমস্যা শুধু মুসলিমদের মধ্যে। অন্যরা কোনো ভুলই করে না। কিংবা তাদের ভুল ক্ষমাযোগ্য। যেন তারা বর্ণবাদ মুসলমানদের দেখেই শিখেছে এবং প্রয়োগ করেছে।

ভিকটিমের আচরণের মাধ্যমে ঘৃণা ও বর্ণবাদী প্রবণতার ব্যাখ্যা করাটা পরিপূর্ণ অন্যায়। এই ব্যাখ্যায় ভুক্তভোগীর নিন্দা করা হয় এবং অপরাধীকে সহযোগিতা করা হয়। বর্ণবাদের মূল উৎস অনুধাবনে কিন্তু এই কর্মপন্থা কোনোভাবে সহায়ক হয় না। একই সাথে এ ধরনের কার্যপদ্ধতি সমস্যার সমাধানের নামে বিভ্রান্তিকর বিকল্প তৈরি করে। ভুক্তভোগীর নিন্দাকে শুধু তার প্রতি লাল কার্ড প্রদর্শনেই ক্ষান্ত হয় না। বরং বিশ্বজুড়ে ঢেকে যাওয়া বর্ণবাদের দায় ইসলামের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। বর্ণবাদী প্রবণতা এবং আত্মসমালোচনার মধ্যে পার্থক্য না করে এসব তাত্ত্বিকরা -বিদ্বেষ ছড়ানো এবং মূল্যবোধ লঙ্ঘন করতে থাকেন।

বাস্তবতা উপেক্ষা করে ভুক্তভোগীর নিন্দা করা

মুসলমান এবং তাদের আচরণের সাথে ইসলামোফোবিয়ার সম্পর্ক জুড়ে দেয়ার অর্থ হলো, বিশ্বের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হলে মুসলমানদের পরিবর্তন করতে হবে। আর তাদের নিকট বিশ্ব বলতে পাশ্চাত্যই। এটা আসলে তাদের কিছু পরিকল্পিত আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য মগজ ধোলাইয়ের একটি মাধ্যম। এসব বক্তারা কখনো পশ্চাৎপদতা ও চরমপন্থার পেছনের মূল বিষয় তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভব করে না। যদি মেনে নেয়া হয় যে, 'আমাদের মধ্যকার সমস্যার মূল কারণ আমরাই'। যার দাবি হলো 'আমরা পরিবর্তন হই, যাতে বিশ্ব আমাদের গ্রহণ করে'। এটি তো বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের মতো। বৌদ্ধিক

ব্যক্তিরা মস্তিস্ক সচেতন রেখে নিজেদের মূলনীতি ও মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করবে। যাতে দেশের ভিতরে ও বাইরে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন না হয়।

কিন্তু এই তাত্ত্বিকরা কখনো মানবাধিকার, মানবমর্যাদা ও মজলুমের অধিকার সচেতন হতে সাহস করে না। জনগণের মধ্যে অর্থবৈষম্য, সম্পদের অসম বন্টন ও ধনী-গরিবের বিশাল ফারাক নিয়ে কথা বলাটা যতোটা কঠিন, তাদের নিকট ঠিক ধর্মের মূলপাঠ পূনর্বিবেচনার আহ্বান করাটা ততটাই সহজ। এদের বৈপরিত্য খুব সহজেই প্রকাশ পায়, যখন তারা মুসলমানদের অন্যদের সাথে সহাবস্থান বজায় রাখার জন্য কুরআন-সুন্নাহের দলিল দেয়। কিন্তু তারাই আবার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ইসলামোফোবিয়ার দায় পুরা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে আর তারা কুরআনের আয়াত খুঁজে পায় না।

কিছু মানুষ বুঝতে চায় না, কীভাবে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে বর্ণবাদ প্রকাশ পাচ্ছে। যুগে যুগে কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছে এই বর্ণবাদ। মুসলমানদের নিন্দা করতে বয়ান-বিবৃতিতে বর্ণবাদ ব্যবহার করে বিশ্বের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পরিবর্তনের কথা বলে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য। অথচ এরাই জনগণের অধিকার ও প্রাপ্য না দিয়ে জনগণের থেকে লজ্জিত সেসব মূল্যবোধের নিন্দায় সরব থাকে, যে মূল্যবোধ একই সাথে পাশ্চাত্য বিশ্ব ও ইসলামের নিকট সমান গ্রহণযোগ্য।

তাদের বক্তব্য কি এটাই দাবি করছে, মুসলিমরা অন্যদের মতো মানুষ নয়। অন্যদের মতো তাদের থেকে কোনো দোষত্রুটি প্রকাশিত হতে পারবে না। মানুষ তো কখনো ভালো করে, কখনো মন্দ করে। কখনো তো কোনো সমাজের একজন সদস্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে পারে। এ জন্য দেড় বিলিয়নের বেশি জনগোষ্ঠীর মূল দৃষ্টিভঙ্গিকে পাশ কাটিয়ে বিচ্ছিন্নতাকে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে উপস্থাপন করার কোনো অর্থ হয় না। বিশ্বের জাতিগোষ্ঠীর উত্থান-পতনের জটিল সমীকরণ অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

অনেকে অবচেতনভাবে ভুক্তভোগীর ওপর দায় চাপিয়ে দেন, যদিও তারা এটা অনুভব করেন না। সমাজের অপরিণত গোষ্ঠীর বক্তব্য এবং মানব সমাজের অমোঘ নিয়ম সম্পর্কে অনবগতিই এর উল্লেখ্যযোগ্য কারণ। ইতোপূর্বেও এমন দেখা গেছে। সমাজের নির্দিষ্ট অঙ্ক আরও পরিষ্কার করে বললে

ইহুদিদের একটি গোষ্ঠীর অপরিণত কর্মকাণ্ডের কারণে তারা গণহত্যার শিকার হয়েছে। এবং এই অসদাচরণকে তাদের ওপর নির্যাতন করার পক্ষে কারণ হিসেবে দাঁড় করিয়েছে তৎকালীন জাতীয়তাবাদীরা। নাৎসিদের বর্ণবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ কিন্তু আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের ওপর বিশ্বাস করতো না। এই জাতীয়তাবাদের বলি শুধু ইহুদিরা নয়। বরং অন্যান্য জনগোষ্ঠীও এর শিকার হয়েছে। আর এখন ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে উগ্র ডানপন্থি নব্য নাৎসিদের প্রধান শিকার হচ্ছে মুসলিমরা।

চরমপন্থা ও ইসলামোফোবিয়া

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে থাকা কিছু ব্যক্তি মুসলিমদের আচরণকেই ইসলামোফোবিয়ার দায় হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এই সমস্যা মোকাবিলায় 'চরমপন্থার মোকাবিলা' শীর্ষক আলোচনার শিরোনামেই বড় ধরনের গলদ রয়েছে। এতে তাদের পূর্ব কল্পিত চিন্তাপ্রবণতার স্পষ্ট ছাপ থাকে। কিছু মানুষ তো চরমপন্থার মোকাবিলায় আবার নিজেরাই চরমপন্থা অবলম্বন করেন। এমনকি মানবীয় মহান মূল্যবোধ ধারণ করার আহ্বান করে তারাই আবার তা নিজ পায়ে পদদলিত করেন। সমাজের কোনো অনুষ্ঠানে চোরকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে একজন নির্দিষ্ট মুসলিমদের পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং অন্য ধর্মাবলম্বী তথা হিন্দু, খ্রিস্টান, ইহুদি ও নাস্তিককে এড়িয়ে যাওয়াকে অবশ্যই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলতে হবে।

ইসলামোফোবিয়া রোধে ভাবমর্যাদা উন্নয়ন

কিছু কিছু মুসলিম তাদের সামাজিক পরিমণ্ডলে ভাবমর্যাদা উন্নয়নের লক্ষ্যে খুব প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। প্রতিবেশী মুসলিমের প্রতি সদাচার সকল মুসলিমের ওপর নিঃসন্দেহে প্রভাবক নয়। হয়তো সর্বোচ্চ বলা হবে, সে একজন ভালো প্রতিবেশী। তাকে কখনো বলা হবে না 'সে আদর্শিক মুসলিম'। হ্যাঁ, বলবে, সে আমাদের অনেকটা কাছাকাছি।

বর্ণবাদ ও ঘৃণাচর্চার এই আদর্শ কোনো বিশেষ যৌক্তিক ভিত্তির ওপর স্থাপিত নয়। বরং এই বর্ণবাদ বেছে বেছে তার চিত্র প্রকাশ করে শুধু মুসলমানের সামনে। কিছু আরব ও মুসলিম দেশ তাদের ভাবমর্যাদা উজ্জ্বল করার স্বার্থে প্রশাসনে নারীদের নিয়োগ দেয়। বৈদেশিক প্রচারণায় বিভিন্ন ডেলিগেট হিসেবে তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতৃপ্ত পাশ্চাত্যের বক্তব্য হলো– 'পাশ্চাত্যের অনুসরণে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে

তোমাদের'। এক্ষেত্রে যে আরব কিংবা মুসলিমদের মৌলিক চারিত্রিক উৎকর্ষতা ও পরিচয়ের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকে না, তা এখানে বলা বাহুল্য! তবে ভাবমর্যাদা উন্নয়নের কী অর্থ হলো?

কিছু মানুষ আবার চরিত্র ও আচরণ সংশোধন এবং বর্ণবাদ ও ঘৃণাপ্রকাশ বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। তাদের বক্তব্য মুসলিমকে সংশোধন হতে হবে। তাদের দাবি অনুসারে বলতে হয়, কোনো মুসলিম-কর্তৃক কৃত নির্দিষ্ট বিব্রতকর আচরণ কি সকল মুসলমানকে দোষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারে? মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম হোক! ব্যক্তির আচরণ দ্বারা কি গোষ্ঠীকে অভিযুক্ত করা ন্যায়সঙ্গত?

অনেকে পাশ্চাত্য মুসলিমদের ভাবমর্যাদার বৃদ্ধির অংশ হিসেবে মুসলমানদের শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। পাশ্চাত্য তো তাদের বাইরের গোষ্ঠী, সমাজ ও রাষ্ট্রকে জগতই জ্ঞান করে না, বরং তৃতীয় বিশ্ব ইত্যাদি নাম দ্বারা অভিহিত করে মানসিকভাবে নিপীড়ন করে। অথচ আমার মতে, কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের শক্তিশালী হওয়ার অর্থই পাশ্চাত্যের সাথে কৌশলগত লড়াই-সংঘাতের রাস্তা প্রশস্ত হওয়া। শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও ইসলামোফোবিয়াকে এটা আরও উস্কে দেবে।

পাশ্চাত্যে মুসলিমদের অর্জনকে উপেক্ষা করা

অনেকের ধারণা 'মুসলমানদের ভাবমর্যাদার উন্নয়ন হলে পাশ্চাত্য তাদের ইজ্জত দেবে। এই অর্জন ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি ঘৃণার মাত্রা হ্রাস করবে।' যদি এটা বলি তবে নিশ্চিত বাড়িয়ে বলা হবে না যে, ইউরোপের অধিকাংশ দেশের হাসপাতাল থেকে যদি বিশেষজ্ঞ মুসলিম ডাক্তার প্রত্যাহার করা হয়, তবে সব হাসপাতাল অচল হয়ে পড়বে। আরব ও ইসলামি বিশ্বের অনেক মেধা শরণার্থীর ঢলের সাথে ইউরোপে প্রবেশ করেছে। হ্যাঁ, এটা সত্য! ইউরোপ আশ্রয় দিয়েছে কিন্তু তাদের যে জীবনের সব মহাঅর্জন তারা বিতরণ করেছে, অভিজ্ঞতা দিয়েছে' তা কিন্তু কম নয়।

সবসময় কিছু আওয়াজ তো বৈচিত্র্যময় অর্জনের কথা বলতে থাকে। ভাবমর্যাদা উজ্জ্বলের কথা বলে। অন্যরা নাকি এতে আমাদের স্বীকৃতি দেবে। ইউরোপের মাঠকাঁপানো তারকা মুহাম্মাদ সালাহ, মাসউদ ওজিল, যায়নুদ্দিন যায়দান ও সামী খাদিরাহের মতো ব্যক্তিদের অর্জন কিন্তু তেমন পরিবর্তন আনেনি। বরং তা আরও বর্ণবাদের তাপকে বাড়িয়েছে।

জীবিত ব্যক্তিদের অবদানে যদি কারো সন্তুষ্টি না আসে, তবে মাটির ভেতর সন্ধান করতে পারেন। গত দুটি বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের হয়ে যেসব মুসলিম জীবনদান করেছে, তাদের দিকে দেখুন। সেসব কবরস্থান দেখুন! একটি জাতির জন্য রক্তদানের থেকে বড়ো কোনো দান হতে পারে না। ফ্রান্স, ব্রিটেন ও অস্ট্রিয়াসহ আরও অনেক ইউরোপীয় শক্তির পক্ষ হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শক্তির পক্ষে প্রায় পঁচিশ লাখের বেশি মুসলিম সৈন্য লড়াই করেছে। হতে পারে সেসব যুদ্ধ ছিল অনৈতিক ও অবৈধ। এসব সৈন্যদের মরদেহ বিভিন্ন গ্যারিসন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ইসলামোফোবিয়ার এসব ব্যাখ্যাদাতারা কিন্তু ফ্রান্সের, ইংল্যান্ডের, বেলজিয়াম, ইতালি, কিংবা অস্ট্রিয়ার গ্যারিসনের গোরস্তানে অনুসন্ধানের সুযোগ পায়নি।

যারা সফলতা ও অর্জনের খবর জানতে চান, তারা তো জানতে পারবেন। কিন্তু যে বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাকার কথা বলি তা হলো, ভাবমর্যাদা বাড়াতে নতুন নতুন সফলতা ও অর্জনে উৎসাহিত করার মধ্যে কোনো মানবাধিকার তো থাকে না। কারণ, যারা কোনো উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জনে সক্ষম নয়, তাদের সাথে কি তবে বর্ণবাদী ও ঘৃণামূলক আচরণ করার সুযোগ রয়েই যাচ্ছে! এটা তো দেখা যাচ্ছে, অর্জনহীন মানুষকে মূল্যায়নের কোনো সুযোগ নেই, তাকে নিদেনপক্ষে মানবিক সম্মানও দেয়া যায় না!

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাখ্যা

পাশ্চাত্য ও ইউরোপীয় গণমাধ্যমের স্বাভাবিক ট্রেন্ড হলো– কোনো হামলার ঘটনায় হামলাকারীর পারসোনাল লাইফকে পৃথক রাখা। প্রায়ই 'হামলাকারী মুসলিম' শুধু এই তথ্যের আলোকেই ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিভিন্ন তথ্য তুলে আনতে থাকে। কোন জনবহুল মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে সে থাকে, কোন মসজিদে নামাজ আদায় করতো এবং তারপর ঐ মসজিদের ইমামকেও কোনোভাবে সন্দেহের তালিকায় আনার চেষ্টা করা। গণমাধ্যম কর্তৃক এই প্রতিবেদন আসার সাথে সাথে এলাকাটির মুসলিমরা, তাদের বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান অপরাধের সাথে তাদের ধর্ম ও ব্যক্তিগত সংশ্লিষ্টতার কথা নাকচ করে দিয়ে বিবৃতি দিতে থাকেন।

তাছাড়া আরও একটি দৃশ্যমান অজুহাত খুবই সচারচার দেখা যায়, কোনো মুসলিম কর্তৃক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পর গণমাধ্যমগুলো একটি বিষয় চেপে যায়; হামলাকারী মানসিক বৈকল্যতায় ভুগছিলেন কি না? অথচ অমুসলিম কেনো ব্যক্তি যদি এমন হামলার সাথে জড়িত হতো, সেক্ষেত্রে গণমাধ্যমে ব্যাপক

আকারে প্রচারিত হয়, হামলাকারী বন্ধুর বিচ্ছেদে কিংবা অর্থনৈতিক সংকটে মানসিকভাবে অসুস্থ ছিল। প্রতিটি হামলার পর এ ধরনের কর্মপন্থা খুবই স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায়। অন্যদিকে ইন্টারনেটের সার্চ ইঞ্জিনগুলোতে সন্ত্রাস ও সহিংসতা শব্দ সার্চ করলেই তার সাথে ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে সম্পর্কিত কোনো কী ওয়ার্ড চলে আসে।

পাশ্চাত্যের ইসলামোফোবিয়া

পাশ্চাত্যের ইসলামোফোবিয়া আজকের নয়। নাৎসি জার্মানির জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রধান অনুঘটক বর্ণবাদ এবং এন্টিসেমেটিজম। ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা এই ইসলাম-বিদ্বেষ থেকে ইউরোপ এখনো মুক্ত হতে পারেনি। বরং শরণার্থী ও ভিনদেশিদের প্রতি বর্ণবাদী আক্রমণ সত্তর ও আশির দশকে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপর নব্বই এর দশকে এটার তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেতে পেতে উপস্থিত হয় ২০০১ সালের এগার সেপ্টেম্বর। এই তারিখের পর থেকে শরণার্থী, বহিরাগত ও বিদেশি বিশেষত মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা বহুমাত্রিকতা পায়। ইউরোপজুড়ে মুসলিমদের ওপর হামলা শুরু হয়। এরপর থেকে পশ্চিম গোলার্ধের এই অঞ্চলটি ইসলামবিরোধী একটি বিশেষ পরিমণ্ডলে রূপ নেয়। গত কয়েক বছর থেকে রাজনীতিবিদরা বিশেষত চরম ডানপন্থিরা তাদের নির্বাচনি প্রচারণায় ইসলামোফোবিয়াকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করছে। যেমন- ফ্রান্সের জাতীয়তাবাদী দল, অস্ট্রিয়ার ফ্রিডম পার্টি, বেলজিয়ামের ফালামিস পার্টি ও সুইডেনের সুইডিশ পার্টিসহ আরও অনেক দেশের অনেক দল রয়েছে। তাছাড়া গত পনেরো বছরে খোদ মধ্যপন্থি দলগুলোও ইসলামোফোবিয়ার বিভিন্ন বক্তব্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কোথাও তো ইসলামবিরোধী আইন কার্যকর করেছে মধ্যপন্থি হিসেবে পরিচিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। ইসলাম-বিরোধী আইনের কারণে মিনার নির্মাণে নিষেধাজ্ঞাসহ মসজিদ বন্ধ করা হয়েছে। মুসলিম নারীদের হিজাবের প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রদানের পাশাপাশি মুসলিম কমিউনিটিকে পর্যবেক্ষণে বিশেষ আইনও প্রণয়ন করা হয়েছে। অপরদিকে অস্ট্রিয়ার ইসলামবিরোধী আইনের মতো বিভিন্ন বর্ণবাদী আইনেরও স্বীকৃতি দিচ্ছে বিভিন্ন দেশ। এসবকিছুই একজন মুসলিমকে পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতার জন্য হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করছে।

এখানে বর্ণবাদ-পাঠে একটি গভীর দৃষ্টিভঙ্গি দৃষ্টিগোচর হয়। বর্ণবাদ কখনো বর্ণবাদের শিকার ব্যক্তিদের সামনে আনে না। বরং তারা সবসময় সামনে আনে বর্ণবাদীকে। বর্ণবাদী শুধু তার বক্তব্যই বলে যায়। কিন্তু বর্ণবাদের শিকার ব্যক্তি কিন্তু তার কোনোকিছু বলার সুযোগ পায় না। উদাহরণস্বরূপ-

সবসময় মানুষের মনে একটি প্রশ্ন উঁকি দেয়, সুইডেনে মিনার নির্মাণ-বিরোধীদের কথাই গণমাধ্যমে আসে। 'এখানে বলতে গেলে মুসলিম নেই বা খুবই অল্প। এ অঞ্চলে মসজিদের প্রয়োজন নেই।' এভাবে ব্যক্তি-স্বার্থ হাসিলের জন্য রাজনীতিবিদরা ইসলামোফোবিয়াকে ব্যবহার করে। ২০১৫ সালে অস্ট্রিয়ার সাধারণ নির্বাচনে ফ্রিডম পার্টি তাদের নির্বাচনি প্রচারণায় 'শরণার্থী ও ইসলামায়নের বিশৃঙ্খলা কিছুতেই চলতে দেয়া হবে না'- এই শিরোনাম ব্যবহার করে।

বর্তমানে তো ইসলামোফোবিয়া একটি নতুন আদর্শ খুঁজে পেয়েছে। ইসলামোফোবিয়ার সমর্থকরা নিখাঁদ খ্রিস্ট রাজ্য নির্মাণের ইচ্ছা পোষণ করছে। কিছুদিন আগে এস্তোনিয়ার রক্ষণশীল সমাজকল্যাণমন্ত্রী খ্রিস্টান শরণার্থীদের স্বাগত জানানোর যৌক্তিকতায় একপর্যায়ে দাবি করেন, 'যাই হোক আমরা খ্রিস্ট সভ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি দেশে আছি।'

পোল্যান্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইফা কোপাকজ তার দেশকে খ্রিস্টান রাষ্ট্র বলে অভিহিত করেন। খ্রিস্টান জনগণকে সাহায্য করা পোল্যান্ডের দায়িত্ব বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রকৃতপক্ষে এটা কোনো বিচ্ছিন্ন দাবি নয়। বরং এর গভীর কারণও রয়েছে।

পোল্যান্ডের অভিবাসন এজেন্সি জানায়, 'শরণার্থীদের আবেদন গ্রহণে ধর্মীয় ব্যাকগ্রাউণ্ড যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। হাঙ্গেরিতে বিশালসংখ্যক শরণার্থী মানুষ রয়েছে। দেয়ালহীন ইউরোপের ঐক্যের প্রতীক বহুজাতিক তত্ত্ব আজ হুমকির মুখে।'

হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ফিকো জানান, 'যারা দেশে ঢুকছে, এরা অন্য ধর্মের অনুসারী। তারা পুরোপুরি ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। এদের অধিকাংশ খ্রিস্টান নয়, এরা মুসলিম' এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো- ইউরোপ এবং ইউরোপের পরিচিতি কি খ্রিস্টধর্মের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ? উল্লিখিত বক্তব্যগুলোর ভেতর স্পষ্টভাবেই মুসলিম শরণার্থীকে আলাদা রাখা হয়েছে। হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমরা তাদের প্রবেশ করতে দেবো না। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের দেশে এত সংখ্যক মুসলিম শরণার্থী না নেয়ার সিদ্ধান্তে পূর্ণ অধিকার আমাদের আছে।' [৭৮]

[৭৮] ইংরেজি প্রবন্ধ অবলম্বনে

ফোবিয়ার চ্যালেঞ্জে ইসলাম

জাবির মাহমুদ

ক্রুসেড যুদ্ধেকে নিরূপদ্রব চালিয়ে যাওয়ার জন্য জর্জ বুশের চেতনাদীপ্ত বাণীই হোক অথবা নবি আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কঠোরতর প্রশিক্ষণের কালিমালেপন কিংবা জিহাদকে হিংস্রতা বলে ব্যক্ত করার কার্যত কৌশল– এই সবকিছুর পেছনে একটা উদ্দেশ্যই নিয়ামক। ইসলামকে একটি বর্বর ধর্মাদর্শ সাব্যস্ত করে বিশ্বব্যাপী তার গ্রহণযোগ্যতাকে বাধাগ্রস্ত করা। এতদসত্ত্বেও যে ইসলাম একটি শান্তি, শৃঙ্খলা, মধ্যমপন্থি এবং সহজতর মাযহাব। কঠোরতা, বিশৃঙ্খলা, স্বেচ্ছাচারিতা, গোঁড়ামি হুলুস্থুল যতো কর্মযজ্ঞের সাথে ইসলামের সম্পর্ক তেমনই; যেমন সম্পর্ক আঁধারের সাথে আলোর। দিনের সাথে রাতের এবং সত্যের সাথে মিথ্যার। ফিরে দেখা ইতিহাসে পশ্চিম এবং ইসলামের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তো যথেষ্ট প্রাচীন ও সেকেলে। ইসলামের বিস্তৃতির পর থেকেই খ্রিস্টানবিশ্ব মুসলমানদের ওপর ক্রুসেডের নামে; এক-দুটি নয়, সাত-সাতটি ক্রুসেড যুদ্ধ চাপিয়েছে।

পরবর্তীতে সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ূবীর বিজয়ের মাধ্যমে সেই ধারার সমাপ্তি ঘটে। সেসময় সম্রাট নবম লুই মুসলমানদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের পর পশ্চিমাদের উপদেশ প্রদান করেছিলেন যে, 'যদি তোমরা মুসলমানদের ওপর বিজয় লাভ করতে চাও; তবে তোমরা যোদ্ধা বাহিনী তৈরির পরিবর্তে তাদের আক্বিদার ওপর আঘাত করো। যাতে করে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ বংশধররা পাকা ফলের মতো তোমাদের ঝুড়িতে এসে পড়ে।' সম্রাট ফ্রান্সিসের ওই উপদেশের ওপর ইউরোপীয় নীতিনির্ধারকদের থেকে **orientalist** এবং ঈসায়ী মুবাল্লিগরাই বেশি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। রোমের পোপের; ইসালাম এবং পয়গম্বরে ইসলাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আরোপিত ভিত্তিহীন অভিযোগ, এরই ধারাবাহিকতার অংশ।

বিশেষত তার এই আপত্তি যে, 'পৃথিবীতে ইসলাম তরবারির জোরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' এই প্রচারণারই একটা অংশ; যা পশ্চিমারা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণের জন্য তুলে রেখেছে। চিন্তা ও কাজের দিক থেকে যার উদ্দেশ্য ইসলামের মোকাবিলায় পিছ পা হওয়ার পর; পৃথিবীকে তার ব্যাপারে পথভ্রষ্ট করা। অতীতে এমনতরো অপবাদের দালিলিক জবাব উলামা, ফুকাহারা

দিয়েছেন। হিন্দুস্থানে আল্লামা শিবলী নু'মানী 'সিরাতুন্নাবী' লিখে পয়গম্বরে ইসলাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মানবিক বৈশিষ্ট্য এবং চিন্তার ব্যাপকতা সাব্যস্ত করেছিলেন। স্যার সৈয়দ রহ. ও যুগের বদনাম এবং উইলিয়াম মুরের সিরাতুন্নাবীর ওপর করা কতক আপত্তির জবাব দিয়েছেন। অন্যান্য মুফাক্কিরে ইসলামরাও ইসলামের ওপর আরওপিত বিশেষত 'ইসলাম তরবারির জোরে পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়েছে' অভিযোগের প্রশান্ত জবাব দিয়ে একথা স্পষ্ট করেছেন যে, ইসলাম তার প্রকাশকাল থেকেই শান্তির মাযহাব ছিল।

পৃথিবী অবগত আছে যে, মক্কা মুকাররমা যেখান থেকে ইসলামের রবি প্রথম বিকিরিত হয়েছে, সেখানে তরবারি মুহাম্মদ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে নয়; বরং তাকে অমান্যকারীদের কব্জায়ই ছিল। নবিয়ে পাক সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যেই প্যানেল যুদ্ধবাজের তকমা লাগায়; তারা ওই ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করে যে, হুজুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৫৩ বছর বয়স অব্দি যুদ্ধ তো দূরের কথা; তরবারিই হাতে নেননি। এমনকি তখন আরব সংস্কৃতিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্যাপক ছিল। প্রত্যেকেই অল্প বয়সে সৈনিক হিসেবে গড়ে ওঠতো। জীবনের শেষ লগ্নে এসে; মদিনায় অবস্থানকালে হুজুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেসব রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হয়েছে; তারা তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। হুজুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের ময়দানে আগমণ করেন। তখন তিনি যুদ্ধকে ইবাদত বানিয়ে দেন। আদেশ জারি হয় যে, মহিলা, বাচ্চা, বৃদ্ধা-বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং ইবাদতখানায় আশ্রিত কারো ওপর যেন হাত ওঠানো না হয়! ঐশ্বরিক ফরমান ছিল, শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ কর; যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে উদগ্রীব। তাকিদ করেছেন যে, যদি প্রতিপক্ষ সন্ধি করতে চায় তবে তাদের সন্ধি-প্রস্তাব কবুল করে নাও।

নবিয়ে রহমত সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাখ্যা করেন যে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য বুঝে নাও। এটা না গণিমতের সম্পদ লাভের জন্য; আর না সক্ষমতা অর্জনের। কুরআনে জিহাদের উদ্দেশ্য এমন করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে একদলকে অপর দলের মাধ্যমে দমন না করতেন; তাহলে পাদ্রীদের খানকা, ইহুদি এবং নাসারাদের উপাসনালয় এবং মুসলমানদের মসজিদ; যাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, সবই ধ্বংস হয়ে যেতো। এজন্যই জোর গলায় এই দাবি উত্থাপন করা যায়

যে, মুসলমানরা যেখানেই তরবারি উত্তোলন করুক না কেন; তাদের উদ্দেশ্য কেবলই নিজেদের এবং মজলুমদের তরফ থেকে প্রতিরোধই ছিল। অমুসলিমদের জোরপূর্বক ইসলামে দিক্ষিত করা মোটেই নয়। পাশাপাশি এমন একটি পরিবেশ গড়ার ইচ্ছে ছিল। যেখানে সমূহ মতবাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকবে। এবং সেসব ধর্মানুসারীরা কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা ছাড়াই নিজেদের ধর্মীয় বিধান নির্বিঘ্নে পালন করতে পারবে।

রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোটা জীবনই বিশ্ববাসীর সামনে রয়েছে। যেখান থেকে এমন একটা উদাহরণও দেয়া যাবে না যে, কাউকে ইমান আনতে জবরদস্তি করা হয়েছে। কারণ এটাই, মুসলমানদের অনেক নিকটাত্মীয়দের মৃত্যুও কুফর অবস্থাতেই হয়েছে। মক্কার কাফেরই হোক বা ইহুদি সম্প্রদায়; তারা ইসলামের মতো শান্তি আর ভাতৃত্বের ধর্ম এবং তাদের নীতি-নির্ধারকদের বিরোধিতা এজন্যই করেছেন যে, তারা বুঝতেন যে, মানবিক সমতা ও ভারসাম্যতার এই আন্দোলন; শতবর্ষ ধরে চলমান। এবং এই আন্দোলনই তাদের কর্মযজ্ঞ নিষ্ফল করে দেবে। ফলে মদিনায় যে উচ্চতর উসূলের উপর ইসলামি রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকে বিচারকের আসনে বসার পূর্বেই নিষিদ্ধ করে দেয়া হবে। এই লক্ষ্যেই যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হয়। ব্রিটিশ লেখক লর্ড রেডলে উল্লেখিত যুদ্ধের খুঁটিনাটি টেনে লিখেছেন যে, সেসব যুদ্ধে আহত ব্যক্তিকে আর কেই-বা আহত ব্যক্তির মোকাবিলা করছিল; যুদ্ধের সিলসিলার সূচনাতে তাকালেই সেটা জানা যায়।

বদর প্রান্তরে সংঘটিত হয় একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ। মদিনা থেকে যার দূরত্ব ২৩ মাইল। মদিনা থেকে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে মক্কার কাফেররা সেখানে পৌঁছেছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধ, উহুদ। উহুদ প্রান্তরে সংঘটিত হয়। যেটা মদিনা থেকে ১২ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। সেই যুদ্ধের আক্রমণ সূচনা মক্কার কাফেররাই করেছিল। তৃতীয় যুদ্ধ, গাজওয়ায়ে আহযাব। যেই যুদ্ধে ইসলামের সব দুশমনরা বিশেষত ইহুদিরা মদিনা অবরোধ করে রেখেছিল। এই তিনটি যুদ্ধে একটি বিষয়ই সাব্যস্ত হয় যে, আক্রমণকারীরা মুসলমান ছিলনা। তাদের প্রতিপক্ষ ছিল। আর প্রতিরক্ষার দায়িত্বই কেবল মুসলমানরা পালন করেছিল। এটাও চিন্তার বিষয় যে, মুসলমানরা শক্তি অর্জনের পর; প্রথমবারেই যুদ্ধের জন্য নয়; বরং হজ্জ আদায়ের জন্য মক্কায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল। অথচ তারা তাদের বাহুর শক্তিবলেই চাইলে সেখানে পৌঁছতে পারতো! তবুও মক্কাবাসীরা তাদের তখনই প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। বরং

একবছর পরের শর্তজুড়ে দেয়। হুজুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য; মক্কাবাসীদের সমস্ত শর্ত মেনে নেন।

হুজুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শৃঙ্খলাপ্রীতির এরচেয়েও বড়ো দৃষ্টান্ত হলো সে সময়ের; যখন হুজুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের বিরাট সৈন্যবাহিনীর সাথে বিজয়ীর বেশে নিজের পুরনো ভূমি মক্কায় প্রবেশ করেন। তো, যারা তাকে মক্কা থেকে বের করেছিল। তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন। যুদ্ধ এবং রক্তপাত তো দূরের কথা; ইসলামের কোনো শত্রুরই গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। তাদের জীবন এবং ধন-সম্পদ নিরাপদ থাকে। এর থেকে বেশি ইসলামের নিরাপত্তাপ্রীতি এবং নবি সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মানবিক সম্মাননা প্রদানের দলিল, আর কিই-বা হতে পারে! বর্তমান ইসলামি বিশ্বের মানচিত্রে যদি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায়; তাইলেই জানা যাবে যে, সেখানকার কিছু অঞ্চল এমন রয়েছে যে, যেখানে কখনোই মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করেনি।

ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ এবং আফ্রিকার অনেক ভূখণ্ডেই আরব বণিক এবং উলামায়ে কেরামদের মাধ্যমে ইসলামের আলো পৌঁছে। হিন্দুস্তানের দিকে এমন অনেক অঞ্চল রয়েছে; যেখানে সর্বপ্রথম সুফিরাই তাদের তাঁবু স্থাপন করেন। এবং চারিত্রিক তেজস্বীতায় মানুষের দিল জয় করে নেন। হযরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী, খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী এবং মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরীদের হাতে লাখো মানুষ ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন। এই অন্তরজয়ী কাফেলা মানুষদের মুহাব্বতকারী তরবারি দিয়ে কাবু করার বিদ্য জানতেন।

আজকাল আমেরিকা, ইউরোপে ইসলাম গ্রহণের যে প্রবাহ চলমান; তার নেপথ্যে কোন্ শক্তি এবং জুলুম ক্রিয়াশীল আছে? এটি ইসলামের সাধারণত নীতিশ্রদ্ধা এবং চিন্তাশক্তিরই নিছক একটি ঝলক। সেখানে এই ধর্মমতের প্রতি চৈন্তিকদের আগ্রহের প্রবাহ ক্রমশই বাড়ছে। ইসলামোফোবিয়ায় আকণ্ঠ ডুবে থাকা পশ্চিমা সম্প্রদায়ও আলোচিত বাস্তবত্ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল। কিন্তু ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা তাদের এ বিষয়ের ওপর অপারগ করছে যে, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ইমেজের প্রকাশ ঘটাবে! তাদের নিকট পৃথিবীতে কমিউনিজমের পরাজয়ের পর ইসলামই সবচে বড়ো হুমকির কারণ। বর্তমানে আমেরিকা এবং ইউরোপে হাজার হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করছে। বিগত কয়েক বছরে ২০ হাজারেরও অধিক আমেরিকান সৈন্য

ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছেন। এটা কোনো ধরনের জুলুম বা উদ্বুদ্ধের ফলাফল নয়। বরং ইসলামি শিষ্টাচার, দৃষ্টিভঙ্গি এবং উত্তম নীতিরই প্রভাব। ইসলামের সৌন্দর্য যতোটুকুই উদ্ভাসিত হচ্ছে; মানুষও ঠিক তেমনই ইসলামের দিকে ঝুঁকছে। মিথ্যা, অপবাদ এবং প্রোপাগান্ডীয় এজেন্ডার কার্যত কোনো স্থায়িত্ব নেই। সবশেষে তাদের সত্যের সামনেই মাথা পেতে নিতে হয়। ইসলামের গুরুত্ব ফিলহাল এজন্য বাড়ছে যে, পশ্চিমা এবং তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি দীর্ঘকাল ধরেই মানবজীবনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা এটাই প্রথম এবং একমাত্র সভ্যতা; যা কার্যত বর্ণবাদী। এবং প্রান্তিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই অধুনিক সভ্যতা মানুষদের অগণিত মাসআলার শিকারে পরিণত করে। বঙ্কবৃদ্ধি, পারস্পরিক সম্মানবোধের অভাব, সত্তাগত কুপথ-গমন এবং পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে সামগ্রিক এবং ব্যক্তিগত শোষণ বা নির্যাতনই তার ফলাফল। এই সভ্যতাকে ঠিক ঈসায়ী সভ্যতাও বলা যায় না। কেননা ওটা অধুনিক ভাবাদর্শের জনক। এবং যতোক্ষণ পর্যন্ত না ওখানে ঐশ্বরিক শক্তিকে জায়গা দেয়া যাচ্ছে; এই সভ্যতা এমনিভাবে পরাজিত হয়েই থাকবে। ইসলামোফোবিয়ার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য যেখানে উল্লিখিত বাস্তবতার প্রসিদ্ধি এবং প্রচার জরুরি; সেখানে ইসলামের সৌন্দর্য এবং বরকতের ব্যাপারে পশ্চিমাদের পরিচিত করানোও উপকারী হবে। কেননা অভিজ্ঞতাবলেই এ বিষয়টি পরিস্ফুট হয়েছে যে, যারা ইসলামের শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে এর চর্চা শুরু করে দেয়; তারা খুব দ্রুতই সেটাকে গ্রহণ করে নেয়। এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা পেরেশানই থেকে যায় যে, পশ্চিমাদের মুক্তচিন্তা, মানুষ নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছাকে ছেড়ে একটা ধর্মাদর্শের অনুসরণকে কেন আপন করে নিচ্ছে! পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীরা; এই মগজ-গ্রথিত বিষয়-সমাধানে এজন্য ব্যর্থ হয়েছেন যে, তারা প্রথমত. ইসলামকে কঠোরতার নজরে দেখতো। দ্বিতীয়ত. জেহেনকে আপন কব্জায় রেখে ইসলামের চর্চা করতো। সামগ্রিক অবস্থায় ইসলামের দাওয়াত অথবা তার ইতিবাচক পরিচিতিই সেই মাধ্যম, যেটা 'ইসলামোফোবিয়া'র ভিত্তিকে দুর্বল করে পতন ঘটাতে সক্ষম।

কাভারিং ইসলাম
ইসলামোফোবিয়ার পাঠ্য

রকিব মুহাম্মদ

ইসলাম একটি আদর্শিক জীবব্যবস্থা, যার শক্তিশালী সংস্কৃতি রয়েছে। এটি অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি বিশ্বাস। প্রাগৈতেহাসিক কাল থেকে সভ্যতার অগ্রযাত্রায় ইসলামের ভূমিকা অত্যুজ্জ্বল। সাহিত্য, আইন, রাজনীতি, ইতিহাস ও শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইসলামের রয়েছে অসামান্য অবদান। ইসলাম তার আবেদন নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী। এককথায় এটি মন এক জীবনবিধান যা, ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক সীমানা মাড়িয়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে আফ্রিকা, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এমনকি পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকায়ও। ফলত সব মানচিত্রে ছড়িয়ে পড়েছে এর অনুপম প্রাণশক্তি। কিন্তু বিশ্বব্যাপী পশ্চিমের অনুদার ও সংকীর্ণ প্রচারণার অনিবার্য ফলস্বরূপ ইসলাম ও এই বিশ্বাসের অনুসারীদের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তার নগদ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে 'ইসলামোফোবিয়া'। গোয়েবলসের এর 'প্রোপ্যাগান্ডা' তত্ত্বমতে একটি মিথ্যাকে বারবার প্রচার করা হলে সেটিই সবার কাছে সত্য বলে গ্রহণীয় হয়। আর দর্শকদের এই মহজধোলাইকে সহজ করে দেয় কিছু বায়াজড মিডিয়া।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভত্তিক কিছু গণমাধ্যমের ইসলাম ও মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সংবাদের একটি বিশ্লেষণে দেখা যায় তারা ৯৪.১২ শতাংশ সংবাদ করে থাকে "এন্টি-ইসলামিক সেন্টিমেন্ট" উসকে দেওয়ার জন্য। এসব সংবাদ দেখে দর্শকরা ইসলামকে সন্ত্রাসের ধর্ম মনে করবে সেটাই স্বাভাবিক। ইসলামোফোবিয়া হল ইসলামের বিপরীতে ভীতি সৃষ্টি করে যুদ্ধ, লুটপাট ও গণহত্যার সমর্থন আদায় করার একটি সহজ পদ্ধতি। মুসলমানদের বর্বর-সন্ত্রাসী হিসাবে পরিচয়ের কারণেই ইসলাম ধর্মের অনুসারী মৃত্যুবরণ করলে অথবা বৈষয়িক ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হলে অনেকেই আনন্দিত হয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলে অনেকেই তাতে সমর্থন দেয়। এই নিবন্ধে আমরা আলোচনা করব মিডিয়ায় উপস্থাপিত ইসলাম নিয়ে। এই আলোচনার বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে আমরা এক নজর বুলিয়ে আসব এডওয়ার্ড সাঈদের 'কাভারিং ইসলাম' বইয়ে।

এডওয়ার্ড সাঈদ ১ নভেম্বর ১৯৩৫ সালে ফিলিস্তিনের জেরুসালেমে জন্মগ্রহণ করেন।[৭৯] বিশ্বাসগত দিক থেকে তিনি ছিলেন পোটাস্ট্যান্ট ধর্মের অনুসারী। শ্বেতবর্ণের এই লোকটি পেশায় ছিলেন একজন শিক্ষক, দার্শনিক। সত্যউচ্চারণে নির্ভীক সাঈদ ছিলেন পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ। সাঈদকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। সাঈদ একজন বাস্তববাদী অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি। সত্যিকারের একজন জানা মানুষের দায়িত্ব তিনি সমগ্রজীবন পালন করেছেন। তার অবস্থান ছিলন্যায় ও ন্যায্যতার পক্ষে। তার সবচেয়ে বিখ্যাত কর্ম হচ্ছে, ওরিয়েন্টালিজম। চিন্তার জগতে বিপ্লব সৃষ্টিকারী এই গ্রন্থটি রচিত হয় ১৯৭৮ সালে। প্রাচ্যকে নিয়ে পাশ্চাত্যের সুদূরপ্রসারী ও সুগভীর কলাকৌশলগুলো তিনি চিত্রিত করেছেন এই বইয়ের পৃষ্ঠাজুড়ে। ওরিয়েন্টালিজম সারাদুনিয়ার বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ওরিয়েন্টালিজমের মাধ্যমে সাঈদ প্রাচ্যতন্ত্রের স্বরূপ উদঘাটন করে এ বিষয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার আরেকটি বিখ্যাত বই হচ্ছে, 'কাভারিং ইসলাম : হাউ দ্য মিডিয়া এন্ড দ্য এক্সপার্টস ডিটারমাইন হাউ উই সি দ্য রেসট অব দ্য ওয়ার্ল্ড'।

কাভারিং ইসলাম বইয়ে তিনি তথ্য-উপাত্ত দিয়ে প্রমাণ করেন, পশ্চিমের করপোরেশনগুলো কীভাবে তাদের মিডিয়াকে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। তার গভীর অনুসন্ধান পাশ্চাত্যে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে পূর্ব থেকে চলে আসা অনৈতিক অথচ জোরালো প্রচারণার স্বরূপ তুলে ধরেছে। বিশেষত ইউএসএ মিডিয়ার সংকীর্ণ অভিব্যক্তির বাদানুবাদ করে সাঈদ শক্তিশালীভাবে ইসলামের অবস্থান তুলে ধরেছেন। সাঈদ দেখিয়েছেন, পশ্চিমের তাঁবেদার গোষ্ঠী যাদের মাঝে আবার অনেক ইসলামিস্টও রয়েছেন, মূলত তারা ওরিয়েন্টালিস্ট [প্রাচ্যবিদ] বলেই খ্যাত, এরা ভিন্নধারার ইসলামিক দৈত্যের উপকথা হাজির করেন।

সাঈদ এখানে তুলে ধরেন কেন পাশ্চাত্য জগতে ইসলাম এবং আরব বিশ্বকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেমনটা তারা নয়! কেন পাশ্চাত্য মিডিয়াতে ইসলাম ও আরব বিশ্বের লোকদের নামে প্রোপাগান্ডা করা হয়! ইরানের ইসলামি বিপ্লবের সাথে পাশ্চাত্য দুনিয়ার এমন কি সমস্যা ছিল যার জন্য খোমেইনীর বিপ্লবকে পাশ্চাত্যে ভালোভাবে দেখা হয়নি! কেন ইহুদী এবং

---

[৭৯] ক্যান্সারে আক্রান্ত সাঈদ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সালে পরলোকগমন করেন। লেবাননের পোটাস্ট্যান্ট সমাধিক্ষেত্রে তাকে সমাহিত করা হয়।

খ্রিস্ট ধর্মের কাছাকাছি ধর্ম সত্ত্বেও ইসলামকে অতিরঞ্জিত প্রদর্শনীর মাধ্যমে দানবীয় এবং সন্ত্রাসী ধর্মে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়!

এই গ্রন্থটিতে সাঈদ দাবি করেছেন, পাশ্চাত্য জগতে ইসলামের প্রদর্শনী কোন নতুন বিষয় নয়। সাঈদ তার ওরিয়েন্টালিজমের উদ্ধৃতি টেনে এই গ্রন্থে দেখিয়েছেন, কীভাবে ইতালির বিখ্যাত মহাকাব্যিক দান্তে তার "ডিভাইন কমেডিতে" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'নরকে' পাঠিয়েছিলেন, যেখানে দান্তের কমেডিতে সাম্রাজ্যবাদী রোমান সম্রাট ট্রজানের অবস্থান ছিল স্বর্গে।

এছাড়াও সাঈদ বর্ণনা করেছেন, কীভাবে রাজনৈতিক প্রয়োজনকে বৈধতা দিতে পোপ দ্বিতীয় আরবান ধর্মের নামে খ্রিস্টান্দের ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডে পাঠিয়েছিলেন। তিনি জানান দিয়েছেন, এরকমটা ভাবার কোন কারণ নেই যে, ধর্ম হিসেবে পাশ্চাত্য জগতের সাথে ইসলামের কিংবা নবি মোহাম্মদের সাথে পাশ্চাত্যের কোন সমস্যা আছে। পাশ্চাত্যের প্রধাণ সমস্যা হল, ইসলামের অনুপম আদর্শের সাথে।

সাঈদ দেখিয়েছেন কীভাবে উত্তর-আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য বিশ্বের তেলের চাহিদা পূরণের জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা লিপ্ত তারা। উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন, পাশ্চাত্য বিশ্বের দুই তৈলশিকারী ডব্লিউ টাকার এবং ডি পি মইনিহানের প্রতিবেদনের কথা। যারা তাদেরে রচনাতে প্রমাণ করতে চেয়েছেন মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তেলের দাম বৃদ্ধি করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে তেল আমদানি ও রপ্তানিতে বাঁধার সৃষ্টি করছে। এজন্য তারাা সুপারিশ করেছে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে যেন সামরিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সাঈদ বিশ্বাস করতেন, "মানবজাতি সে বিষয়ের প্রতি সবচেয়ে বেশী সচেতন হয়, যা তারা বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা উপলব্ধি করে, এবং তাদের এই অভিজ্ঞতা হয় পরোক্ষ, যা তারা অন্যদের থেকে পায়।"- এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সাঈদের দাবি, পাশ্চাত্য মিডিয়ার কল্যাণে লোকে ইসলাম সম্বন্ধে অসত্য এবং বানোয়াট ধারণা গ্রহণ করে। এই মিডিয়ার উপকরণগুলো হল, টেলিভিশন, রেডিও, দৈনিক সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, চলচ্চিত্র, প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, গ্রন্থ ইত্যাদির মাধ্যমে।

সাঈদ এই গ্রন্থটিতে আরও ব্যাখ্যা করেন, ইরানের ইসলামি বিপ্লব না ছিল সমাজতান্ত্রিক, না পুঁজিবাদী, তবুও পাশ্চাত্য মাধ্যম এই বিপ্লবের সাথে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল, কারণ খোমেইনীর পূর্ববর্তী শাহ শাসকেরা আমেরিকার পুতুল হয়ে থাকার শপথ করেছিল, যা খোমেইনী মেনে নেননি। যার দরুন পাশ্চাত্য মিডিয়া ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে সনাতন প্রোপাগান্ডা শুরু করেছিল, এবং বলেছিল, নবি মোহাম্মদ ভন্ড নবী (আল্লাহ আমাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন), আয়াতুল্লাহ বিংশ শতাব্দীতে আল্লাহ্‌র ছায়া। আমেরিকার টিভি চ্যানেল এবিসি এসময় পর্দা, মোল্লাহ, শিয়া, সুন্নী ইত্যাদি ব্যাপারগুলোকে খুবই বাজেভাবে উপস্থাপন করে।

সাঈদ তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সেসকল ঘটনাবলির সর্বোৎকৃষ্ট ইলাস্ট্রেশন করেছেন, যেখানে দেখানো হয়েছে বিপ্লব পূর্ব ইরানের সাথে আমেরিকার মধুর সম্পর্ক এবং একই সাথে সাম্প্রতিক সময়ে ইরান সংকট পাশ্চাত্যমিডিয়ায় কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষত ইরানের পরমাণূ কর্মসূচি, যার উদ্যেক্তা মূলত পশ্চিমা দুনিয়া। নিউইয়র্ক পোস্ট-এর বরাত দিয়ে তিনি জানান, নিউইয়র্ক পোস্টের সিনিয়র রিপোর্টার জর্জ কারপুজি। কারপুজি নিজস্ব যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে খোমেনির ইসলামি সরকার বই প্রসঙ্গে দাবি করেন, খোমেনি ও হিটলার প্রায় সমকক্ষ। মানে, সেই যুগের এডলফ হিটলারের মতো আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনিও একজন অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী ও শান্তি বিঘ্নকারী শাসক। মেইন ক্যাম্পের-এর লেখক আর ইসলামি সরকার-এর লেখকের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে, একজন নাস্তিক, অন্যজন নিজেকে আল্লাহরমানুষ বলার ভান করেন।

সাঈদের মতে, ১৯৮৩ থেকেই দেখা যায় মুসলিম সন্ত্রাসীরা পাশ্চাত্য মাধ্যমের সর্বত্র বিবৃতি দিয়ে বেড়াচ্ছে ইসলামের প্রতি তাদের আস্থা ও বিশ্বাস সম্বন্ধে, যেমনটা আগে লক্ষ্য করা যায়নি। কিন্তু বাস্তবতা ছিল এই যে এদের মদতদাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ছিল পাশ্চাত্য গণমাধ্যমের কার্যাদির দিকনির্দেশক। যে নির্দেশকের পরামর্শে পাশ্চাত্য মিডিয়ার বিশেষ কৃপায় লোকে জানতে পেরেছিল, ১৯৯৫-এ ওকলহামা সিটিতে মুসলিম সন্ত্রসীরা বোমা বিস্ফোরন করেছে; যদিও এই কর্ম অন্য সন্ত্রাসী গ্রুপ দ্বারা সাধণ হয়েছিল।[৮০]

---

[৮০] 'মিডিয়া কন্ট্রোল' ও '৯/১১'-নোয়াম চমস্কি এবং 'আমেরিকাস ওয়ার অন টেররিজম'-কসডোভস্কির

সাঈদ তার কর্মে উল্লেখ করেছেন ১৯৮০ এর দশক থেকে হলিউডের চলচ্চিত্রগুলোতে, যেমন "প্রিন্সেস এপিসড", "ডেল্টা ফোর্স", "ট্রু লাইস", "জিহাদ ইন আমেরিকা" আরব বিশ্বের লোকেদের জীবনধরণ ও সংস্কৃতি নিয়ে কীভাবে ভ্রান্ত প্রদর্শনী শুরু হয়েছিল। এসমস্ত চলচ্চিত্রের মাধ্যমে গোটা দুনিয়া জেনেছিল আরবরা নিষ্ঠুর, কট্টরপন্থী, কুৎসিত, সন্ত্রাসী, আত্মঘাতী বোমাবিস্ফোরণকারী।

পশ্চিমা মিডিয়া আমাদেরকে একথা বিশ্বাস করাতে চায়, তৃতীয় বিশ্বের প্রতিবাদী ও সচেতন আন্দোলনগুলো, বিশেষ করে ধর্মীয় পরিচয় বহনকারী আন্দোলনগুলো মূলত ইসলামি জঙ্গিবাদী আন্দোলন। ব্রিটিশ বা ফরাসি প্রচারমাধ্যম থেকে মার্কিন প্রচারমাধ্যম একটু ভিন্নধর্মী। পশ্চিমা সমাজ, ভোক্তা গোষ্ঠী, সংগঠন ও তাদের স্বার্থও ভিন্নধরনের। প্রত্যেক মার্কিন সাংবাদিকের মাথায় একটা কথা সবসময় উপস্থিত থাকে, তার দেশ পৃথিবীর একমাত্র পরাশক্তি, যার নির্দিষ্ট স্বার্থ রয়েছে এবং সেই স্বার্থ হাসিলের দায়িত্ব তার আছে; অন্য দেশের লোকদের-সাংবাদিকদের মাথায় এসব চিন্তা থাকে না। প্রত্যেক মার্কিন সাংবাদিক বিশ্ব সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করার সময় এ ব্যাপারে সচেতন থাকেন, তার চাকরিদাতা কর্পোরেশনটিও মার্কিন ক্ষমতার অংশীদার।

স্নায়ুযুদ্ধোত্তর যুগে পাশ্চাত্য বিশ্বের বুদ্ধিজীবীরা ভবিষ্যতবাণী করতে শুরু করে যে ইসলাম হবে ভবিষ্যতের জন্য আতংক। এদের মধ্যে বার্নার্ড লুইস, স্যামুয়েল হান্টিংটন, ড্যানিয়েল পাইপ ছিল সর্বাধিক অগ্রগামী। তারা দাবী করে, "আমাদের (আমেরিকার) পৃথিবী হল ইসরায়েল এবং পাশ্চাত্যের, আর তাদের পৃথিবী হল ইসলাম এবং অবশিষ্টদের, সামরিক ইসলাম হল পৃথিবীর জন্য আতংক এবং আমাদের সভ্যতার প্রধাণ শত্রু, এবং ভবিষ্যত সভ্যতার সংঘাত হবে পাশ্চাত্য ও ইসলামের মধ্যে, রাজনৈতিক ইসলাম হল সাম্যবাদ আর ফ্যাসীবাদের মত অযৌক্তিক এবং অসন্তোষজনক।" এ ধরণের অযৌক্তিক দাবীর জবাবে সাঈদ আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের তথ্যের উদ্ধৃতি দেন, যেখানে বলা হয়েছিল, "অপকর্মের দিক থেকে বিচার করলে আরব বিশ্বের সন্ত্রাসীদের অবস্থান পৃথিবীতে ষষ্ঠ পর্যায়ে রয়েছে।" এমনকি ২০০৮ সালের ইউরোপলের রিপোর্টেও বলা হয়েছে ইসলামি সন্ত্রাসীদের

সন্ত্রাসবাদের পরিমাণ .০৪শতাংশ, তবে ৯৯.৯৬শতাংশ সন্ত্রাসী অন্য ধর্মের হওয়া সত্ত্বেও তাদের ধর্মকে ধূয়া তুলশী পাতা বানিয়ে কেন কেবলমাত্র ইসলামকেই সন্ত্রাসীদের ধর্ম হিসেবে মিডিয়াতে প্রচার করা হয়?

পরিশেষে সাঈদ দাবী করেন, যেভাবে পাশ্চাত্য জগতে ইসলামকে প্রচার করা হয়, আসলে ইসলাম তা নয়। ইসলাম কি এটা বুঝা পাশ্চাত্য দুনিয়ার পক্ষে দুঃসাধ্য, যতক্ষণ না তারা ইসলামের বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করবে। ইসলামকে শয়তানের ধর্মে পরিণত করার জন্য আজকের পাশ্চাত্য মিডিয়া প্রকৃত ইসলামকে পর্দার অন্তরালে লুকিয়ে তাকে বহুরূপে বিভক্ত করেছে। যেমন, কট্টরপন্থী ইসলাম, গোঁড়া ইসলাম, সন্ত্রাসী ইসলাম, সহিংস ইসলাম, সামরিক ইসলাম, রাজনৈতিক ইসলাম এবং পরিবর্তিত ইসলাম। ইসলামের এই প্রতিটি রূপের আবর্তন হয় পাশ্চাত্যশক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুসারে যে কাজটি তদারকির দায়িত্ব পালন করে পাশ্চাত্য মিডিয়া। পাশ্চাত্য মিডিয়া নিজেদের প্রয়োজনে ইসলামের বিরুদ্ধে পৌরাণিক গল্প তৈরী করে এবং জনগণের মাঝে তা বিতরণ করে, যাতে লোকেরা জানে, আরবরা কল্পনার জগতে বাস করে, সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করে, ফতুয়ার চর্চা করে, ধর্মের নামে মানুষ হত্যা করে, নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় না, গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল থাকে না ইত্যাদি।

সমগ্র বইটি জুড়ে সাঈদ আলোচনা করেছেন কেন পশ্চিমা মিডিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। সাঈদ বইটিতে কোন ধরণের অতিরঞ্জিত তথ্য দেননি, এবং নিজের কর্মকে প্রসিদ্ধ করার জন্য কোন ধরণের ছলনার আশ্রয় নেননি। তিনি দ্ব্যর্থকণ্ঠে দাবী করেছিলেন, কেউ জানে না, এটি হল পশ্চিমা মিডিয়া, যা ইহুদী-খ্রিষ্টানদের ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে, ইসলামকে শয়তানের ধর্মে পরিণত করার অপচেষ্টা চালায়, ইসলামকে সন্ত্রাসীদের ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করে, যার বদৌলতে লোকে জানতে ব্যর্থ হয় যে ইসলাম শান্তির উৎস; দাবী করে ইসলাম মধ্যযুগীয় ভাবধারা নিয়ে চলে, যদিও আধুনিকতার সূচনা করেছিল ইসলাম; বলে ইসলামে নারীর অধিকার নেই, যদিও এরিষ্টটলীয় দর্শনে যা বলা হত- (অপবিত্র এবং কুলষিত আত্মা থেকে যে সন্তানের জন্ম হয়, তা হল নারী) তা থেকে নারীর অবস্থার উন্নয়নের জন্য ইসলামই প্রথম নারীকে অধিকার দিয়েছিল। সাঈদ এই বইটিতে যা উপস্থাপন করেছিলেন ইসলামি দুনিয়ার প্রতি তাই ছিল পাশ্চাত্য জগতের প্রকৃত মনোভাব।

সর্ব সমেত সাঈদ সহজবোধ্য ভাষায় মন্তব্য টানেন, জটিল সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহের, যেগুলো পশ্চিমের ইসলাম সম্পর্কিত অভিজ্ঞতায় প্রভাবশালী ভূমিকা রাখে। তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন মিডিয়ার রসালো সেসকল উপাদান সম্পর্কে, যা ইসলাম ও প্রাচ্য বিষয়ে পশ্চিমাদের অবস্থান নির্ধারণ করে। পরবর্তীতে ষোল বছর পর ১৯৯৭ সালে সাঈদ যখন ভিন্টেইজ প্রকাশনী থেকে এই গ্রন্থটির পুনঃমুদ্রণ করেন, তখনও সাঈদ দাবী করেন, এত বছরেও মুসলিম বিশ্বের প্রতি পাশ্চাত্যের ব্যবহারের কোন পরিবর্তন আসেনি।

সাঈদ বলতে চান, মধ্যপ্রাচ্যের অমীমাংসিত বিষয়াবলি নিয়ে বছরের পর বছর ধরে চলে আসা দ্বিমুখী বক্তব্য, পশ্চিমের নেতিবাচক ও অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিভঙ্গি। অথচ এর বিপরীতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ইসলামের শক্তিশালী অবস্থান ও মানবিক মূল্যবোধ, যা পশ্চিমারা কখনো বলে না। তাঁর রচনাবলি পাঠ করে গভীর মননশীল ব্যক্তি মাত্র উপলব্ধি করতে পারবেন এ সময়ের নানা রাজনৈতিক ও সামরিক মেরুকরণ, ৯/১১ উত্তর পাল্টে যাওয়া বিশ্ব পরিস্থিতি ও পশ্চিমী করপোরেট সাংবাদিকতা ও প্রাচ্য তন্ত্রের স্বরূপ। নিম্নে সাঈদের একটি মতামত সংযুক্ত করা হলো। লেখাটি প্রকাশের ৪০ বছর পরও তার কথাগুলো মিলে যায় সংবাদপত্রের প্রতিটি পাতার সাথে।

সাঈদের দৃষ্টিভঙ্গিঃ মার্কিন সম্রাজ্যে আরব ও মুসলিমদের দৃশ্যায়ন[৮১]

এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রতিজন মুসলিম অথবা আরব নাগরিক নিজেকে শত্রু শিবিরের সদস্য জ্ঞান করে। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, দেশটিতে মুসলমানরা পরিকল্পিত বিদ্বেষের শিকার হচ্ছে। তাদের সঙ্গে শত্রুতামূলক আচরণ করা হচ্ছে। সরকারি বিবৃতিতে বলা হচ্ছে, 'ইসলাম ও মুসলিমরা যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু নয়'; তবে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন কথাই বলছে। শত শত আরব তরুণকে আটক করা হয়েছে এবং গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই ও পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। মুসলিম অথবা আরবীয় নাম হলে রক্ষা নেই। এমন নামের মানুষ বিমানবন্দরে উপস্থিত হলেই তার প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয় এবং তাকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা হয়। কোন কোন

---

[৮১] ইনকিলাব, ২৫ মে ২, ভাষান্তর- শাহাদাত হোসাইন খান

ক্ষেত্রে জামা-কাপড় খুলেও পরীক্ষা করা হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। আরবদের প্রতি বৈষম্যের এমন ভুরি ভুরি ঘটনা রয়েছে। কেউ আরবিতে কথা বললে অথবা আরবিতে লেখা কোন কাগজপত্র পাঠ করলে তার প্রতি কটাক্ষ করা হয়।

প্রচার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ, ইসলাম ও আরবদের ব্যাপারে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার জন্য বহু বিশেষজ্ঞ ও 'ভাষ্যকার নিয়োগ করা হয়েছে। এদের উচ্চারিত প্রতিটি ছত্রই ইসলামের প্রতি বৈরিতায় পরিপূর্ণ। শুধু তাই নয়, তারা আরবের ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ভুল ধারণা দিচ্ছে। প্রচার মাধ্যম আফগানিস্তানে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী লড়াইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে এবং ইরাকে সম্ভাব্য হামলার ব্যাপারেও তারা একই ভূমিকা পালন করছে। সোমালিয়া ও ফিলিপাইনসহ বেশ কয়েকটি দেশে মার্কিন বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করেছে। ইরাকের বিরুদ্ধে সমরসজ্জা গড়ে তোলা হচ্ছে। ইসরাইল পরিকল্পিতভাবে ফিলিস্তিনী মুসলমানদের হত্যা করছে এবং এতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি রয়েছে। প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড ও অন্যরা যা বলছেন আমেরিকা ঠিক তা নয়। প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার উপদেষ্টারা বলছেন যে, তারা একটি 'ন্যায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন এবং তারা এ যুদ্ধকে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী লড়াই হিসেবে। আখ্যা দিচ্ছেন।

আমাকে এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী অভিবাসীদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, আমাদের অবশ্যই এ যুদ্ধের যৌক্তিকতা মেনে নিতে হবে এবং এ ব্যাপারে আমাদের কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। আরও বলা হচ্ছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করার অনুমতি পাওয়ায় আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতা হচ্ছে ভিন্ন। আমেরিকা বরাবরই একটি অভিবাসীদের দেশ। এদেশে ঈশ্বর নয়, জনগণই আইন তৈরী করে। আমেরিকায় আজকে যারা বসবাস করছে তাদের প্রায় সবাই অভিবাসী এমনকি প্রেসিডেন্ট বুশ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও। এ দেশের সত্যিকার বাসিন্দা হচ্ছে রেড ইন্ডিয়ানরা। যুক্তরাষ্ট্রে এককেজন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর জন্য সংবিধান আলাদা নয়। কিন্ত্র আমেরিকানরা তাই মনে করছে। মার্কিন সন্ত্রাসীরা অন্যের বাক-স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। মিঃ বুশ আমেরিকায় ধর্মের গুরুত্বের উপর জোর দিচ্ছেন। তিনি চীন এবং অন্যান্য দেশে গিয়ে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রচার করছেন। কিন্তু তিনি তার মতামত নাগরিকদের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না অথবা

তার সুরে কথা বলতে বাধ্য করতে পারেন না। মার্কিন সংবিধান রাষ্ট্র ও সংবিধানের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য টেনেছে। গত নভেম্বরে প্যাট্রিয়ট এ্যাক্ট নামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনে প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম সংশধোনীর পুরো ধারা হয় বাদ দেয়া হয়েছে নয়তো উপেক্ষা করা হয়েছে। নতুন আইনে ঘটনার শিকার ব্যক্তি আইনজীবী নিয়োগ সমস্যায় পড়বে এবং সে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবে। এ আইনে গোপনে বিচার, আড়িপাতা ও অনির্দিষ্টকাল আটক রাখার জন্য সরকারকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এটি মার্কিন সরকারকে 'যুদ্ধবন্দীদের অস্ত্রহরণ' তাদেরকে অনির্দিষ্টকাল আটক এবং জেনেভা কনভেনশন লঙ্ঘন করার ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে। এ আইন পাস হওয়ার জন্যই গুয়ানতানামো ঘাঁটিতে বিদেশি বন্দীদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করা এবং তাদেরকে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী প্রাপ্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র জেনেভা কনভেনশনে স্বাক্ষরদানকারী একটি দেশ।

স্বাক্ষরদানকারী কোন দেশ তাই এই আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করতে পারে না। তবু এদেশে তাই ঘটেছে। এ ব্যাপারে খোদ যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতিবাদ উত্থিত হচ্ছে। ওহাইও'র ডেমোক্রেট দলীয় কংগ্রেস সদস্য ডেনিস কুচিনিচ গত ১৭ ফেব্রুয়ারী এক জ্বালাময়ী ভাষণে বলেছেন যে, সীমা-পরিসীমা ও যুক্তি ছাড়া সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ (অপারেশন এনডিউরি ফ্রীডম) ঘোষণার, প্রতিবছর ৪০ হাজার কোটি ডলারের বেশী সামরিক বাজেট বৃদ্ধি এবং বিল অব রাইটস বাতিল করার ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট অথবা সরকারের নেই। এ ধরনের ক্ষমতা তাদেরকে কেউ দেয়নি। তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে আরও বলেন, আমরা চাইনি যে, ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী হামলায় নিহত নিরীহ মানুষের রক্তের বদলা নেয়ার জন্য আফগানিস্তানের নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা করা হোক। কংগ্রেসম্যান কুচিনিচই মার্কিন সরকারের আগ্রাসী নীতির প্রতিবাদকারী সর্বোচ্চ মার্কিন কর্মকর্তা। আমার মতে, তার বক্তব্যে আমেরিকার নীতি ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে। এজন্য আমি চাই যে, তার ভাষণটি আরবিতে পুরোপুরি প্রকাশিত হোক, যাতে আরবিভাষী মানুষ জানতে পারে যে, বুশ ও ডিক চেনিই যুক্তরাষ্ট্রের সবকিছু নয়।

বর্তমান মার্কিন নীতির সমালোচনা চলছে এবং নানা কথা হচ্ছে। কিন্তু সরকার এগুলো চাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও নজিরবিহীন ক্ষমতাকে কিভাবে মোকাবেলা করা যায় সেটাই আজকের বিশ্বের সমস্যা।

বুশের আশপাশে যে ক'জন মুষ্টিমেয় লোক রয়েছে তারা বিশ্বাস করে যে, মার্কিন স্বার্থ ক্ষুন্ন হলে ওয়াশিংটন যা খুশী তাই করতে পারে। এ ব্যাপারে অন্যান্য দেশের সমর্থন অথবা তাদের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষারও কোন প্রয়োজন নেই। যুক্তরাষ্ট্রের এ মনোভাব এখন আর গোপন নেই। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্য প্রশ্নে মার্কিন নীতিতে ইসরায়েলীকরণ ঘটেছে। জর্জ বুশের মনয়োগ কেবলমাত্র সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াইয়ে। অন্য কিছু নিয়ে ভাবার তার সময় অথবা প্রয়োজন কোনটাই নেই। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন বুঝতে পেরেছেন যে, ফিলিস্তিনীদের হত্যার এটাই সুযোগ, তাই তিনি ফিলিস্তিনী জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

কথা হচ্ছে যে, ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্র নয়, আবার যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল নয় । কিন্তু এ বাস্তবতা সত্ত্বেও ইসরায়েল প্রেসিডেন্ট বুশের সমর্থন পাচ্ছে। ইসরাইল একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র যার ভৌগোলিক অবস্থান হচ্ছে মুসলিম আরব রাষ্ট্রগুলোর ভেতরে। তাকে টিকে থাকতে হবে ঐ এলাকার পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে, মার্কিন সমর্থন অথবা আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে নয়। এই সত্তা অধিকাংশ ইসরায়েলিও অনুধাবন করতে পারছে। তাই তারা শ্যারনের আগ্রাসী নীতিকে আত্মঘাতী বলে আখ্যায়িত করছে। ফিলিস্তিনী ভূখণ্ডে আগ্রাসী অভিযানের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের রিজার্ভ সৈন্যরাও প্রতিবাদ করছে। রিজার্ভ সৈন্যদের সঙ্গে কোন কোন ইসরায়েলিও কণ্ঠ মিলাচ্ছে। এদের সংখ্যা দিন দিনই ভারি হয়ে উঠছে। খোদ ইসরায়েলীদের মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা হলেও মার্কিন নীতিতে পরিবর্তন আসছে না। যুক্তরাষ্ট্র একের পর এক কাল্পনিক ভীতির পেছনে ছুটছে এবং নিজেকে সংঘর্ষে জড়িয়ে ফেলছে। প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার পরিষদবর্গও মনে করছেন যে, তারা সঠিক পথে রয়েছেন। বিগত সপ্তাহগুলোর পত্র-পত্রিকা যারা পাঠ করেছেন তারা একথা বুঝতে পেরেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে জনগণ মার্কিন নীতির অস্পষ্টতায় বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে যে, যে কোন দেশকে টার্গেট করার অধিকার তাদের রয়েছে। এ ধরনের মনোভাব থেকে সে বিশ্বজুড়ে নতুন নতুন শত্রু সৃষ্টি করছে এবং এসব শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছে। লক্ষ্য অর্জন এবং যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। দুই সন্ত্রাসবাদ দমন বলতে যুক্তরাষ্ট্র কি বুঝাতে চায়? সে তার বিরুদ্ধাচরণকারী প্রত্যেককে উৎখাত অথবা তার ইচ্ছামত বিশ্বের মানচিত্র বদলাতে পারে না। আমরা যাদেরকে

সুবোধ ব্যক্তি অথবা সাদ্দাম হোসেনের মত যাদেরকে 'দুর্বত্ত' বলে আখ্যায়িত করি, তাদের কাউকে সে উৎখাত করতে পারে না। ওয়াশিংটনের কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রকে একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে দেখতে চান এবং এ লক্ষ্যে তারা একটি দূরবর্তী টার্গেট হিসেবে বিশ্বকে বেছে নিয়েছেন। তাদের চিন্তাধারা হচ্ছে বাস্তবতাবর্জিত। কারণ, তারা বসে থাকেন পেন্টাগনের ডেস্কে। তাদের কাছ থেকে যে কোন দুবৃত্ত রাষ্ট্রের দূরত অন্তত ১০ হাজার মাইল। তবু এসব রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্র হুমকি হিসেবে গণ্য করছে। হাজার হাজার জঙ্গী বিমান, ১৯টি বিমানবাহী জাহাজ, কয়েক ডজন সাবমেরিন, প্রায় ১৫ লাখ সৈন্য ও হাজার হাজার পারমাণবিক অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট বুশ ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কনডোলিসা রাইস স্বস্তি পাচ্ছে না।

ইতোমধ্যেই প্রতিরক্ষা খাতে হাজার হাজার কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে, তারপরেও প্রতিরক্ষা খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বুশ দেশকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এদেশের প্রায় সকল বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিক তাকেই সমর্থন করছেন। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তারা এড়িয়ে যাচ্ছেন। তারা এটা বুঝতে চান না যে, যে বিশ্বে আমরা বসবাস করছি সে বিশ্ব গতিশীল এবং বিশ্বকে বুঝতে হলে বিশ্ব রাজনীতিকে বুঝতে হবে। মার্কিনীদের মধ্যে এমন একটা ধারণা কাজ করে যে, আমেরিকা বরাবরই ন্যায়ের পক্ষে এবং তার শত্রুরা অন্যায়ের পক্ষে। টমার্স ফ্রিডম্যান অক্লান্তভাবে বক্তৃতা-বিবৃতি দিচ্ছেন এবং এসব বক্তৃতা বিবৃতিতে তিনি আরবদেরকে আত্মসমালোচনাকারী হওয়ার জন্য বারবার পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু তার মত অন্য মার্কিনীদেরও যে আত্মসমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে তা তিনি মানতে নারাজ।

১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার জন্য তিনি চোখের পানি ফেলছেন এবং এ হামলায় নিহতদের জন্য রোদন করছেন। তার মনোভাব এরকম যে, যুক্তরাষ্ট্রেই কেবল এ ধরনের ভয়ংকর হামলা হয়েছে এবং মার্কিনীরাই কেবল সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য দেশে ১১ সেপ্টেম্বরের চেয়েও ভয়াবহ ঘটনায় যারা নিহত হয়েছে এবং হচ্ছে তাদের প্রতি তার কোন অনুভূতি নেই এবং অন্যান্য দেশে সংঘটিত ঘটনাগুলো তার বিচারে কোন ঘটনাই নয়। ইসরায়েলি বুদ্ধিজীবীদের অবস্থাও মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের অনুরূপ। ইসরায়েলি বুদ্ধিজীবীরা শুধু নিজেদের লোকজনের মৃত্যুই দেখতে

পায়; কিন্তইসরায়েলি ট্যাংক, বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রতি মুহূর্তে যে অগণিত ফিলিস্তিনী নিহত হয়েছে সেদিকে তাদের চোখ যায় না। এজন্য তাদের কোন দুঃখবোধ নেই। জুলুমের প্রতি সহনশীল হওয়া অথবা দেখেও না দেখার ভান করা আজকের বিশ্বে একটি স্বভাবে পরিণত হয়েছে। বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে চক্রান্তের অংশীদার হওয়া অথবা ফাদে পা দেয়া শোভনীয় নয়। এ ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তাদেরকেই উদ্যেগী হতে হবে। সকল মানুষের দুর্ভোগ সমান, একথা মুখে উচ্চারণ করে পরবর্তী মুহূর্তে শুধু নিজেদের লোকজনের জন্য বিলাপ করাই যথেষ্ট নয়। বিরোধে জড়িত শক্তিশালী পক্ষ কী করছে তা দেখতে হবে এবং শক্তিশালী পক্ষের কার্যকলাপ সমর্থন করার পরিবর্তে এগুলোা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে হবে। বৃহৎ শক্তিকে সমালোচনা করা এবং এ শক্তির বিরোধিতা করাই বুদ্ধিজীবীদের কাছে বিবেকের দাবি। বুদ্ধিজীবীরা বিবেকের এ দাবি পূরণ করছেন না বলেই ভিকটিমকে উল্টো দোষারোপ করা হচ্ছে এবং অত্যাচারীরা উৎসাহিত হচ্ছে।

৬০ জন মার্কিন বুদ্ধিজীবী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের লড়াইকে সমর্থন দিয়ে একটি বিবৃতি দেন। এ বিবৃতি ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী ও ইউরোপের বড় বড় কাগজে প্রকাশিত হলেও ইন্টারনেট ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে কোন পত্রিকায় ছাপা হয়নি। এক সপ্তাহ আগে এক ইউরোপীয় বন্ধু এ বিবৃতি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বিস্মিত হই। এ বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেন স্যামুয়েল হান্টিংটন, ফ্রান্সিস ফুকয়ামা, ড্যানিয়েল প্যাট্রিক ময়নিহাস প্রমুখ। রক্ষণশীল নারীবাদী বুদ্ধিজীবী জীন থেকি এসটেইন বিবৃতিটি তৈরী করেছিলেন। অধ্যাপক মিশেল ওয়ালজারের উৎসাহে তিনি এ বিবৃতি তৈরি করেন। অধ্যাপক ওয়ালজার ইসরায়েলি লবির লোক হিসেবে পরিচিত। এ লোকের দৃষ্টিতে ইসরায়েলের কোন ভুল ধরা পড়ে না। বরং ইসরায়েল যা কিছু করে সবকিছুই তার কাছে ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত। অধ্যাপক ওয়ালজার একজন মেকি সমাজতন্ত্রী। সমাজতন্ত্রীর খোলস গায়ে দিয়ে তিনি ইসরায়েলের পক্ষে ওকালতি করেন। তবে এ বিবৃতি তৈরীতে উৎসাহ যোগানোর সময় তিনি তার সমাজতন্ত্রী খোলস খুলে ফেলেন। তিনি তার বর্তমান ভূমিকার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমেরিকাকে সন্ত্রাস ও শয়তানের বিরুদ্ধে একটি আদর্শ যোদ্ধাা হিসেবে আখ্যা দেন। এবং বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল হচ্ছে এমন দু'টি দেশ যাদের লক্ষ্য হচ্ছে অভিন্ন। অধ্যাপক ওয়ালজারের উক্তি সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। ইসরায়েল হচ্ছে

এমন এক রাষ্ট্র যেখানে ইহুদি ছাড়া আর কেউ নাগরিক নয়। পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে সকল নাগরিকের দেশ।

ওয়ালিজারের একথা বলার সাহস কখনোহবে না যে, তিনি ইসরায়েলকে সমর্থন করতে গিয়ে বরং ইসরায়েলের ইহুদীবাদি নীতিকেই সমর্থন দিচ্ছেন। ঘটনাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রকে শ্বেতাঙ্গ ও খ্রিস্টান রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হলে তিনি নিশ্চিতভাবে বিরোধিতা করবেন। বিবৃতির পেছনে অধ্যাপক ওয়ালজারের ভূমিকা যেমন গোপন রাখা হয়েছে তেমনি মুসলমানদের ধোকা দেয়ার ইচ্ছাও গোপন রাখা হয়েছে। বিবৃতিতে মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের এ লড়াই নয়, বরং যারা সকল ধরনের ন্যায়-নীতির বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে এ লড়াই। সকল মানুষ সমান। ধর্মের নামে নরহত্যা পাপ, বিবেকের স্বাধীনতা সবার উপরে, মানুষই হচ্ছে সমাজের মূল শক্তি এবং মানুষের মৌলিক বিকাশের শর্তগুলো লালন এবং রক্ষা করাই হচ্ছে সরকারের কাজ। বিবৃতিতে এসব নীতিকথা উল্লেখ করে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্র আক্রান্ত। এজন্য কোথাও কোথাও ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটছে। ধর্ম, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা সম্পর্কে নীতিবাক্য আউড়ে বিবৃতির শেষাংশে একটি ফিরিস্তি দেয়া হয়। এ ফিরিস্তিতে ১৯৮৩ সালে বৈরুতে বোমা বিস্ফোরণে মার্কিন সৈন্যদের হতাহত হওয়ার ঘটনাসহ কোন আরব ও মুসলিম দেশে এবং অন্যান্য ঘটনায় কতজন মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়। তবে ইরাকে মার্কিন মদদে জাতিসংঘ অবরোধ কতজন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, ফিলিস্তিনে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরী ইসরায়েলি বিমান হামলায় এবং আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক অপারেশনে নিহতদের সম্পর্কে বিবৃতিতে একটি লাইনও নেই।[৮২]

ইসলামোফোবিয়ার চ্যালেঞ্জ বনাম মুসলিমবিশ্বের করণীয়

হাবিবুর রহমান রাকিব ॥ রকিব মুহাম্মদ

> (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও জীবনের ব্যাপারে (আরও) পরীক্ষা করা হবে এবং তোমরা 'আহলে কিতাব' ও 'মুশরিক' উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে অনেক পীড়াদায়ক কথা শুনবে। তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয়ই এটা অতি বড় হিম্মতের কাজ (যা তোমাদের অবলম্বন করতেই হবে)। [৮৩]

আমেরিকান ও পশ্চিমাদের অন্তরে ইসলাম কোনো ধর্ম নয়, আমেরিকার জন্য তা বিপত্তিকর আর মুসলমানদের আমেরিকার সাথে কোনো সম্পৃক্ততা নেই। প্রচার-প্রচারণায় এসব চিত্রিত করে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে জনমনে ভীতির সঞ্চার করাই ইসলামোফোবিয়ার অন্তরালের তত্ত্ব। আমেরিকার হাসপাতালগুলোতে কি কোনো মুসলমান চিকিৎসক নেই? কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কি বিদ্যমান যেখানে মুসলমান অধ্যাপক পাঠদান করেন না? মুসলমান প্রকৌশলী ব্যতীত কোনো স্বয়ংক্রিয় শিল্পকারখানা কি চলমান? তালিকা তো পাওয়াই যায়। হাসপাতালে আমেরিকান অমুসলিম সহকর্মীরা মুসলিম সহকর্মীর হাতে তাদের জীবন ন্যস্ত করে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ন্যস্ত করে বাচ্চাদের মেধা-মনন গঠনের দায়িত্ব, তাদের সম্পদ ও যন্ত্রপাতি ন্যস্ত করে সয়ংক্রিয় শিল্পকারখানাগুলোতে। মুসলমানরা কি কোনো জীবন ধ্বংস করেছিল বা শিল্পাঙ্গনে কি করেছিল কোনো নাশকতা কিংবা তাদের শিক্ষানবিশদের মনন কি করেছিল কলুষিত!

এটি হালের কোনো অনুযোগ নয়; বরং প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এক তুরুপের তাস। নুহ আ.-এর সময়কাল থেকে বিশ্বনবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমসাময়িকরা তাদের বিরুদ্ধে সমাজে বিষবাষ্প ছড়ানোর নানা অভিযোগ এনেই শুধু ক্ষান্ত হয়নি; বরং তাদের দমনে গ্রহণ করেছে নানা ষড়যন্ত্র আর সুদৃঢ় পদক্ষেপ। এমনকি তাদের অনেকে নির্যাতিত-

---

[৮৩] তাফসিরে তাওযীহুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান-১৮৬

নিপীড়িত হয়ে পান করে শাহাদাতের অমীয় সুধা। প্রেক্ষাপট তো বলা হলো। এবার আসুন আমেরিকান সহকর্মীদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি ইসলামোফোবিয়ার বীজ যারা ছড়িয়ে চলছে তাদের সাথে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত? এ বিষয়ে শরিয়তে ঐশ্বী ও নববি কোন আলোকচ্ছটা আছে কি না- সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাক!

উত্তর প্রদানের পূর্বে এটা জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত সমাধানই শ্রেষ্ঠ সমাধান। যা সর্বজনীন নির্দেশনা এবং মানবজীবনের সকল দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। সূরা আলে ইমরানের ১৮৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইসলামোফোবিয়ার সাথে আচরণের নমুনা তুলে ধরেছেন। আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলিম জাতি পরীক্ষিত হবে সম্পদ ও জীবনের ক্ষেত্রে এবং তাদের কর্ণকুহর জর্জরিত হবে কতিপয় অমুসলিমদের কর্কশ বাক্যবাণে। আর সাথে প্রদত্ত হয়েছে তা মোকাবিলার স্বরূপ।

নির্দেশনার বিবরণ

আয়াত অনুযায়ী নিঃসন্দেহে আমরা বর্তমান মুসলিম, পূর্ববর্তী মুসলিম ও অনাগত মুসলিম জাতি কতিপয় অমুসলির দ্বারা মৌখিকভাবে নিগৃহীত হবে। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় আমাদের দুটি বিষয় আমলে নিতে হবে।

১. তাসবিরু (তোমরা ধৈর্য ধারণ কর)
২. তাত্তাকু (তোমরা খোদাভীতি অর্জন কর)

ধৈর্য ধারণ করা, নিষ্ক্রিয়তা নির্দেশ করে না। বরং তা বুঝায় সংবেদনশীল ও উত্তেজিত না হয়ে বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা-হেকমতের সাথে ঐ অভিযোগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা। আর 'খোদা ভীতি অর্জন করা'র অর্থ কেউ যদি ধরে নেয় যে, আল্লাহ তায়ালার ভয়ে তার নির্দেশাবলি মান্য করে চলা অর্থাৎ সবর তথা ধৈর্য ধারণ করা তাহলেও আমি দ্বিমত হবো না। তবে এ ক্ষেত্রে আমার নিকট 'খোদাভীতি অর্জন করা' বলতে ইসলামোফোবিয়া ছড়ানোর দ্বারা এবং আমাদের অমুসলিম সহকর্মীদের তা শিক্ষা লাভের দ্বারা যেসব অনিষ্ট আমাদের জেঁকে ধরতে পারে তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা।

১. আপনার সম্পত্তি: আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন যে আমরা সম্পদের ব্যাপারে পরীক্ষিত হবো। ইসলামোফোবিয়া মোকাবিলায়

সম্পদ ব্যয় ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় ব্যয় বলে গণ্য হবে।

২. ইসলামোফোবিয়া নিরসন কল্পে শারীরিকভাবে কোনো কার্যকলাপে অংশগ্রহণ, এটাও উল্লিখিত আয়াতের অংশ (ওয়া ফি আনফুসিকুম- আর তোমাদের জীবনও পরীক্ষিত হবে)

৩. নাগরিক অধিকারমূলক সংগঠন আরও বিভিন্ন সংস্থায় স্থানীয় বা জাতীয়ভাবে আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধব থাকে। সাংবিধানিক অধিকারের ওপর ভিত্তি করে বৈষম্য দূর করতে আমাদের এ বন্ধুত্বকে কাজে লাগাতে হবে।

কার্যকর সাংবিধানিক পদ্ধতিতে বুদ্ধিমত্তার সাথে ইসলামোফোবিয়ার মোকাবিলা করলে ইনশাআল্লাহ নিশ্চিতভাবে আমরা আনন্দদায়ক ফলাফল পাবো। প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী চমকপ্রদ সব উপমায় ঠাঁসা। মক্কায় কী পরিমাণ লোককে তার কথা শোনা, তার নিকট গমন করা, এমনকি তার সাথে কথা বলার জন্য হুমকি দেয়া হয়েছে? কত আরব যে নবিজীকে হত্যা করার প্রয়াস চালিয়েছে অথচ পরবর্তীতে তারা মুসলমান হয়েছে।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যারা মিথ্যাচার করে বেড়ায় তাদের নিজস্ব এজেন্ডা রয়েছে। আর তারা সর্বদা মুসলমানদের ফাঁদে ফেলার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে। আমাদের বিচক্ষণতার সাথে সব অনিষ্টকর ফাঁদ থেকে বাঁচতে হবে।

ইসলামোফোবিয়া-ঘৃণার বীজ বপনকারী এবং কুরআন মাজিদ অগ্নিদাহকারীদের জন্য আমাদের দোয়া থাকবে। তাদের বংশধরদের মধ্যে শুধু ইসলামের সমর্থকই নয় রবং ইসলামের ঝাণ্ডাবাহীও জন্মগ্রহণ করুক- এই দোয়া করি সর্বদা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন যে, 'ভালো-মন্দ সমান হতে পারে না, মন্দকে উত্তমতা দিয়ে প্রতিহত করো। তুমি প্রত্যক্ষ করবে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে-ই তোমার নিকটতম বন্ধুতে পরিণত হবে।'

এছাড়াও সমাজের প্রতিকূল পরিস্থিতি ও ইসলাম-বিরোধী মনোভাব প্রতিহত করার জন্য মুসলমানদের প্রয়োজন উন্নত কৌশল প্রণয়ন। মুসলমানরা যা কিছু করুক আর বলুক না কেন, নিন্দুকেরা তাতেই নিন্দার মশলাপাতি খুঁজে নেবে- 'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা'। বস্তুত এতো কুরআনেরই ভবিষ্যদ্বাণী। মুসলমানদের সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে শয়তান সর্বদা ওঁৎ পেতে থাকবে, নিরপেক্ষদের মনে ধর্মীয় বাণী নিয়ে সন্দেহের বীজ ছড়িয়ে দিতে সর্বদা থাকবে সচেষ্ট। তাই মুসলমান হিসেবে আমাদের করা-বলার সাথে সাথে বিরোধিতা প্রতিহত করার সওদাও জুগিয়ে রাখতে হবে।

বিদ্বেষীদের প্রত্যুত্তর দেয়ার চেয়ে বরং মুসলিম সংগঠনগুলোর স্কুল, কর্মস্থল, মসজিদগুলোতে জনবল নিয়ে তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রয়াস গড়ে তোলা উচিত, যেখানে তারা ইসলাম সম্বন্ধে বিষোদগার ছড়ানো কথাগুলোর সমাধান খুঁজে ফিরবে।

মুসলমানদের সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিতে বেশি বেশি অংশ নিতে হবে যা আমেরিকান জনগণ টিভিতে মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ, সামান্যতেই প্রলয়কাণ্ড ঘটানোর নায়ক হিসেবে মুসলমানদের চিত্রায়ণের বিকল্প রূপ জনসমক্ষে দেখতে পাবে। মানব সম্বন্ধীয় ও মানবতামুখী প্রোগ্রামের মাধ্যমে ইসলামের মহৎ রূপ জনগণের সামনে তুলে ধরাই হবে হাল আমলের সর্বোত্তম বিনিয়োগ।

এছাড়াও ইসলামোফোবিয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিম্নোক্ত বিষয়কে সামনে রেখে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন– দাওয়াতের ফরযিয়্যাত আদায় : সব নবি আলাইহিমুস সালামদের আল্লাহর দিকে আহ্বানের হুকুম দেয়া হয়েছে। শেষ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এই আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন–

"হে নবি! আমি আপনাকে সাক্ষীরূপে প্রেরণ করেছি। সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভীতিপ্রদর্শক হিসেবে। আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদের প্রতি দায়ী হিসেবে। এবং প্রদীপ্ত চেরাগ হিসেবে।" [৮৪]

"এর পাশাপাশি উম্মাতে মুসলিমার প্রত্যেকটা সদস্যকে এই গুরুদায়িত্বের উপযুক্ত জ্ঞান করা হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ; যাদের মানুষের

---

[৮৪] সূরা আহযাব ৩৩ : আয়াত ৪৫-৪৬

হেদায়েত এবং এসলাহের জন্য মাঠে নামানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করো, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো, এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখ।"[৮৫]

এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, মুসলিম উম্মাহ সৎকাজের আদেশ প্রদান এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ প্রদানের শর্তেই শ্রেষ্ঠ উম্মত। এবং প্রত্যেকটা মুসলমানকে আল্লাহর দিকে আহ্বানের ফরযিয়্যাতকে আঞ্জাম দেয়ার জন্য দায়িত্বশীল বানানো হয়েছে। এটা শুধু কিছু বিশেষ মানুষ, সংগঠন, দল এবং আলেমদের কাজ নয়; বরং উম্মতে মুসলিমার আওতাভুক্ত সকলেরই দায়িত্ব–

"আপনি তাদের পরিষ্কার বলে দিন যে, আমার পথ তো এটাই আমি আল্লাহর দিকে ডাকি। আমি নিজেও পূর্ণ আলোয় আমার পথ দেখতে পাই। এবং আমার সঙ্গীরাও। এবং আল্লাহ পবিত্র এবং মুশরিকদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।" [৮৬]

বর্তমানে দাওয়াত ইলাল্লাহর ফায়দা এবং গুরুত্ব আগ থেকে বহুগুণ বেড়ে গেছে। কেননা পূর্ব-পশ্চিমে সত্যানুসন্ধানীরা সঠিক পথ নির্ণয়ে হতাশায় ভোগেন। কিন্তু তাদের দোরগোড়ায় সত্যের বাণী পৌঁছে দেয়ার মতো কেউ নেই। মুসলিমরা দাওয়াত ইলাল্লাহর ফরযিয়্যাতের সাথে উদাসীনতার আচরণ করছে। এখন সময় এসেছে সমগ্র মুসলমান মিলে এই পুণ্যকর্মের আঞ্জামে মেধা-শ্রম-মন দিয়ে পুরোদমে লেগে যাবে।

---

[৮৫] সূরা আল-ইমরান ৩ : আয়াত ১১০
[৮৬] সূরা ইউসুফ ১২ : আয়াত ১০৮

ইসলামোফোবিয়া মোকাবেলার পদ্ধতি

রকিব মুহাম্মদ

ইউরোপে ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ ও মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে সংঘটিত অসৌজন্যমূলক ও অবমাননাকর ঘটনাবলির বিস্তারে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল অমুসলিমরা ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং ইউরোপে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। ঠিক যেভাবে মুসলিমবিশ্ব থেকে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হওয়ার পর প্রাচ্য ও পশ্চিমের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পর্ক স্থাপন, ইসলাম গবেষকদের স্বীকৃতি ও পশ্চিমাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে ইউরোপে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহর অনুগ্রহ পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা, ইসলামি জীবনব্যবস্থা ও ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণার পরিমাণ বেড়েছে। পশ্চিমাদের বৈরী মনোভবের কারণে পশ্চিমা সমাজের শিক্ষিত ও সচেতন মানুষের ভেতর ইসলামের ব্যাপারে কৌতুহল বেড়েছে। কেননা তারা এখন পশ্চিমা বিশ্বের ইসলামবিরোধিতার কারণ জানতে আগ্রহী। ফলে তারা পশ্চিমা সভ্যতার প্রতারণা ও চাতুর্য সম্পর্কে জেনে যাচ্ছে। একইসঙ্গে তাদের সামনে পশ্চিমাদের সভ্যতার জনক ও পথপ্রদর্শক এবং মানবাধিকার, মুক্তচিন্তা ও সাম্যের প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার দাবির বাস্তবতাও স্পষ্ট হচ্ছে। বিপরীতে তাদের সামনে ইসলামের স্বরূপ উন্মোচিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে শত্রুর ঘরে ইসলামের পক্ষে আওয়াজ উঁচু হচ্ছে।

বহু নওমুসলিমের স্বীকার করেছেন তারা ইসলামি জীবনপ্রণালী দ্বারা প্রভাবিত। ইসলামি জীবনপদ্ধতি অনুসরণ করে তারা সুখ, স্বস্তি ও সৌভাগ্য লাভ করেছে, ইসলাম তাদের পারস্পরিক আস্থা ও মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান করতে শিখিয়েছে এবং ইসলামবিরোধী প্রচার-প্রচারণার কারণে তাদের মনে যেসব সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর হয়ে গেছে। এসব নওমুসলিমদের অনেকেই পরে ইসলামের একনিষ্ঠ প্রচারক হয়েছেন, ইসলামের সেবায় ও ইসলাম রক্ষায় নিজের জীবনোৎসর্গ করেছেন। এ ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ আসাদ ও মারিয়াম জামিলার নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। যারা পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্ধকার প্রকাশ করে দিয়েছেন। পরবর্তীতে এই

তালিকা আরও দীর্ঘ হয়। তাদের সঙ্গে যুক্ত হন রজা জারুদি, মরিস বুকাইলি, মুরাদ হফম্যান, ইউসুফ ইসলাম প্রমুখ। এসব প্রাজ্ঞ মানুষ শুধু আনুষ্ঠানিক ইসলাম গ্রহণ করেননি; বরং ইসলাম ও ইসলামি জীবন নিয়ে দীর্ঘ অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা লাভের পর পরিতৃপ্ত হয়েই তারা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজেদের জীবন ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেন।

এক সময় মুসলিমরাই বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ইসলাম রক্ষায় কাজ করতো, পরবর্তী এমন সব লোক এ দলে শামিল হয় যারা খুব কাছ থেকে পশ্চিমা সভ্যতা দেখেছেন এবং পোড় খাওয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। যারা পশ্চিমা সমাজের নাস্তিক ও আস্তিক উভয় ধারা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। এরপর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে পশ্চিমা সমাজের ধ্বংসযাত্রা নিয়ে মুখ খুলেছেন, ইসলাম ও ইসলামি সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। যা বহু মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের প্রভাবিত করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে।

এ বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ ও আন্দোলনের ফলে পুরো পৃথিবীতে ইসলামের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ ও উগ্র মতাদর্শ ছড়িয়ে দেয়ার অপবাদ সত্ত্বেও ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা দিনদিন বাড়ছে। স্বয়ং ইউরোপে ইসলাম ও মুসলমানের ইতিহাস পাঠের আগ্রহ বেড়েছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদে জানা যায়, ইসলাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচারণ ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যেমন ডেনমার্কে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের পর সে দেশে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী পাঠ বেড়ে যায়। একপর্যায়ে ডাচ ভাষায় প্রকাশিত সিরাতের বইয়ের সংকট তৈরি হয় এবং বহু অমুসলিম তখন মুসলিম হয়। এমন বহু দৃষ্টান্ত এখানে দেয়া যাবে– যা প্রমাণ করে ইসলাম বিরোধিতাই সব সময় ইসলামের অগ্রযাত্রার কারণ হয়েছে। মহান আল্লাহ যেন এদিকে ইঙ্গিত করেই বলেছেন, 'হয়তো তোমরা কোনো কিছু অপছন্দ করবে এবং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ২১৬)

আশাব্যঞ্জক এই চিত্র আমাদের একটি নতুন কর্মপন্থার নির্দেশনা দেয়। তা হলো হামলার বিপরীতে হামলা, আক্রমণের পাল্টা আক্রমণ গ্রহণযোগ্য নয়। এতে নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যই কেবল খর্ব হয়। প্রত্যক্ষ আক্রমণ, আঘাত ও সমালোচনার উত্তরে প্রজ্ঞাপূর্ণ উত্তর, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ, শান্তিপূর্ণ

আলোচনা, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহনশীলতাই সময়ের শিক্ষা ও দাবি। শান্তি ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতির সুফল এখন স্পষ্ট। সম্প্রতি ওয়াশিংটনে 'আসনা'-এর উদ্যোগে একটি আন্তঃধর্ম সম্মেলন হয়েছে। তাতে মুসলিম, ইহুদি, খ্রিস্টান, শিখ ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা অংশগ্রহণ করেছে। অংশগ্রহণকারী সবাই একমত হয়েছে যে, ইসলামের নামে সব ধরনের অপপ্রচার বন্ধ করা হোক। কেননা ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। সুতরাং ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও কঠোরতার কারণে অন্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় সমালোচনা করা যাবে না। শান্তিপূর্ণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক নানামুখী প্রচেষ্টার কারণে ইউরোপীয় সমাজের বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতদের অনেকে ইসলাম, মুসলমান ও মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নগ্ন আঘাতের সমালোচনা করছেন এবং তারা স্বজাতির এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করছেন। যেমন পাদ্রী টেরি জনস কুরআনের কপি পোড়ানোর ঘোষণা দেয়ার পর তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছিলেন, 'এমন আক্রমণাত্মক কাজ প্রান্তিকতা বৃদ্ধি করবে এবং চরমপন্থা মাথাচাড়া দেবে। সব ধর্মের প্রতি সম্মান করা এবং যারা ঘৃণা ও শত্রুতা ছড়িয়ে দিতে চায় তাদের নিন্দাজ্ঞাপন করা উচিত।' অন্য ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা শুধু ওবামা বলেননি; বরং যারাই উদার মনে ইসলাম-সমালোচনা ও তার পরিণতি নিয়ে চিন্তা করেছে, তারাই সব ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা বলেছেন। তারা ইসলামভীতির বিরুদ্ধে সরব। ইসলামের ওপর নগ্ন হামলার আরেকটি কল্যাণকর দিক হলো এতে মুসলমানের আত্মমর্যাদা, আত্মরক্ষার চিন্তা ও দ্বিনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

ভারতবর্ষের কিছু সংগঠন ও ব্যক্তি অমুসলিম বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতদের মধ্যে পবিত্র কুরআনের তরজমা ও মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী গ্রন্থ বিতরণ করার পর ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে। ইসলাম তার অনুসারীদের ধৈর্য্য, সহনশীলতা ও ক্ষমার শিক্ষা দেয়, অবিচারের বিপরীতে সুবিচার এবং বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে শান্তি ও শৃঙ্খলার নির্দেশ দেয়। মোটকথা পরিবর্তিত পৃথিবীতে বুদ্ধিবৃত্তিক, প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সহনশীল পদ্ধতিতে কাজ করার কোনো বিকল্প নেই।

প্রচারমাধ্যমের যথাযথ ব্যবহার

ইসলামের বাস্তবিক ছবি বিকৃতকরণে মিডিয়া ব্যাপক কাজ করে যাচ্ছে। ইসলাম-দুশমন মিডিয়া এবং ইসলাম প্রশ্নে আপত্তিকারীরা বিষোদগারী কথাবার্তা এবং বয়ান দেয়ার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করেন না। পশ্চিমা এবং ইউরোপের লোকদের মিডিয়া ইসলামের মূর্খ লোক এবং পথভ্রষ্ট আখ্যা দেয়। ওপরদিকে ওখানকার লোকদের ইসলাম সম্পর্কে যে ধারণা রয়েছে; তারা হয়তো সেটা সংবাদপত্রের কল্যাণে অর্জন করেছে অথবা টিভির মধ্যমে। আর এই মাধ্যমটি ইসলামের সবচে বিকৃত চিত্র সর্বদা জনগণের সামনে পরিবেশন করে। **zou gov**-এর এক জরিপানুযায়ী ওখানকার শতকরা ৫৭ শতাংশ মানুষ ইসলাম সম্পর্কে টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে এবং শতকরা ৪১ শতাংশ মানুষ ·বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করে। এরই ধারাবাহিকতায় মিডিয়াকে সংবেদনশীল এবং গুরুতর হওয়া উচিত। এবং মুসলিমদের হেকমতকে মিডিয়ায় ভালো পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে হলেও ফলাও করে প্রচার করা উচিত। এটা শুধু দেখানোর জন্যই না; বরং দাওয়াতি কাজের জন্যই এটা এখন সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি হয়ে উঠেছে।

চিন্তাগত প্রস্তুতি

আমরা পশ্চিমাদের বলি না যে, আপনারা ইসলাম, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কুরআন এবং ইসলামি সভ্যতার ওপর শাস্ত্রীয় সুতার ভিত্তিতে সমালোচনা করবেন না! বরং আমাদের আকাঙ্ক্ষা তো এটাই যে, বাজারি জবানে ভিত্তিহীন আপত্তি এবং প্রোপাগান্ডা ও মিথ্যা অপবাদ আরওপ করা থেকে বিরত থাকেন। প্রফেসার খুর্শিদ আহমদের ভাষ্য–

> *ইসলাম উপস্থাপনে তারা ব্যাপকভাবে কুসংস্কার, প্রান্তিকতা এবং অবৈজ্ঞানিক পন্থাবলম্বন করেছে। ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা ভ্রান্ত, অপূর্ণাঙ্গ এবং ওভারস্টেটেডেই গন্ডিবদ্ধ। তাদের এই অধিকার আছে যে, তারা ইসলামের সমালোচনা করবে। কিন্তু সেটা অবশ্যই পছন্দনীয়, নির্ভরযোগ্য, গভীর এবং ওজনদার পন্থায়।*[৮৭]

[৮৭] প্রফেসার খুর্শিদ আহমাদ; ইসলাম অ্যান্ড দ্যা ওয়েস্ট, ইসলামিক পাবলিকেশনস, লাহোর, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা- ৬২

কিন্তু মুসলমানদেরও জবাব দেয়ার জন্য রেওয়ায়াতি তরিকা পরিহার করে এক নতুন ভাষাভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে আসা চাই। তাদের আপত্তিসমূহ, অপবাদ এবং ইসলামের নবি আলাইহিস সালামদের জীবনের ওপর করা আক্রমণের জবাবে কিছু প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভ কোনো সমাধান নয়। আর না জযবাতি হয়ে কোনো কিছু করা। এবং রাগান্বিত হয়ে আঘাতের বদলে আঘাত করে জবাব প্রদান; ইসলামের কোনোরূপ কল্যাণই বয়ে আনবে না। বরং ইলমি এবং চৈন্তিক ভুবন চষে উত্তম তরিকায় জবাব প্রদানই কাম্য।

ইসলামের প্রোজ্জ্বল শিক্ষাকে ব্যাপক করা

ইসলামি বিশ্বের সামনে ইসলামি শিক্ষাকে ব্যাপকতা প্রদানের ধারায় কনফারেন্স, কর্মশালা (ওয়ার্কশপ), দাওয়াতি লাইন, প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, কার্যালয়, কিতাবাদি, আলাপ-আলোচনা– এছাড়াও আরও সম্ভাব্য সম্যক পন্থায় পশ্চিমা এবং ইউরোপীয় চক্রান্ত এবং খ্রিস্টানদের উন্মোচিত করা যায়। ইসলামের প্রোজ্জ্বল শিক্ষাকে এভাবে ব্যাপক করা যায় যে, প্রত্যেকেই তাদের শিক্ষা দেখে প্রভাবিত হবে।

ইসলামের শিক্ষাকে ব্যাপক করা হবে। বিশেষত; বঙ্কীয় ব্যাপারটা আদম সন্তান, ন্যায়ের বিষয়, রহমত এবং নিরাপত্তা ইত্যাদির উপর ইসলামের শিক্ষাকে ব্যাপকতা প্রদান করা হবে। তেমনিভাবে সুদ, জুয়া, বঙ্কীয় গড়িমা, মালের লোভ ইত্যাদির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে; যাতে করে ইসলামোফোবিয়ার প্রকৃত পয়েন্টে করাঘাত করা যায়। এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য পথ সহজ হয়ে যায়।[৮৮] এই ধারায় পারস্পরিক এবং মতাদর্শিক মতানৈক্য ও শাখাগত মাসলাকে একপাশে রেখে উম্মতের বৃহৎ ফায়দার স্বার্থে নানা পলিসি এবং লক্ষ্য স্থির করা যেতে পারে।

ইসলামের অপর নামই হলো- শান্তি ও নিরাপত্তা। এবং ইসলাম ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পশাপাশি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ইসলামের ভিত্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি হলো; নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং ইনসাফ। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী জুলুম, কঠোরতা, ফ্যাসিবাদ, বিশৃঙ্খলা, যুদ্ধ, খুন, লুটপাট ইত্যাদি ব্যাপকমাত্রায় হচ্ছে। এই ধারায় ইসলাম এবং ইসলামভিত্তিক

[৮৮] আব্দুর রশীদ আগওয়ান, ইসলামোফোবিয়া, রুজহানাত, আছরাত, তাদারুক, আকলেত্তু-কে হবাক আওর ইসলামোফোবিয়া, ইফা পাবলিকেশনস, দিল্লী ২০১১, পৃষ্ঠা- ৫১৭

শিক্ষাসমূহকে বর্তমানে ব্যাপকতা প্রদান করার এটাই মোক্ষম সময়। কেননা বর্তমান পৃথিবী ইসলামের নিরাপত্তা এবং বরকতের আশায় বিলাপ করছে। পশ্চিমাবিশ্ব আজো পর্যন্ত ইসলাম ও ইসলামের নবি এবং ইসলাম-শিক্ষায় কেবল ভুল বুঝেরই শিকার নয়; বরং অজ্ঞও! একটি জরিপানুযায়ী পশ্চিমে শতকরা ৬০ শাতংশ মানুষের বক্তব্য এমন যে, আমরা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ! সেখানে মাত্র শতকরা ১৭ শতাংশ লোকের বক্তব্য আমরা ইসলামের মৌলিক ধারণা রাখি না। [৮৯]

ইসলামোফোবিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামকে সামনাসামনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে ছুঁড়ে দেয়াই শুধু মুসলিমদের প্রয়োজনীয়তা নয়; বরং ইসলামকে মানবিক পৃথিবীর কাছে পৌছানোর কাজে কষ্ট-মুজাহাদা করা আরও আধিক প্রয়োজন। যাতে করে পৃথিবী ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারে। এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রোপাগান্ডার এই চক্রান্ত খোদ পশ্চিমেই ইসলাম-পরিচিতির মাধ্যম বনে যায়।

বিপ্লবের পথ সুন্দর হোক

আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মদিকে অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এ শ্রেষ্ঠের ভিত্তি তাদের ওপর অর্পিত সুমহান দায়িত্ব। তা হলো, আল্লাহ কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মাদিকে যে পরম সত্যের সন্ধান দিয়েছেন তা তারা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করবে এবং অন্যের কাছেও সে বাণী পৌঁছে দেবে। শুধু পৌঁছে দিয়েই শেষ করবে না; বরং সে কথা যেন অন্যদের বোধগম্য হয় এবং তারা তা গ্রহণ করে সে চিন্তাও মুসলিমরা করবে। তারা ইসলামের বাণী চাপিয়ে না দিয়ে তা এমনভাবে উপস্থাপন করে যা অন্যদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। ইসলামের ওপর আরওপিত সব প্রশ্ন, সব সংশয় ও সব অস্পষ্টতা দূর করার দায়িত্বও তারা পালন করবে।

কাউকে সত্য মানতে বাধ্য করা মুসলমানের দায়িত্ব নয়। আল্লাহর প্রেরিত বার্তা এমন অর্থপূর্ণ ও কল্যাণের ধারক যে মানুষ সহজেই তা গ্রহণ করে নেয়। যদি না সে অসুস্থ মানসিকতা, ইসলামবিদ্বেষ ও গোড়ামি লালন করে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে মুসলিম জাতির প্রতি যে মন্দ ধারণা ও ইসলাম বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছে তার পেছনে মুসলিম জাতির ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলাও দায়ী। প্রমাণ হলো, পৃথিবীর যেখানেই ইসলামের শ্বাসত বাণী

---

[৮৯] দ্যা ইউ গভ. সার্ভে

যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে প্রচার করা হচ্ছে সেখান থেকেই সুসংবাদ আসছে, মানুষ তা গ্রহণ করছে। ইউরোপ-আমেরিকায়ও যারা দ্বিনের প্রচার ভালোবাসা ও সহমর্মিতার সঙ্গে করছে, যাদের কাজে সততা ও নিষ্ঠা রয়েছে তারা সুফলও পাচ্ছে। ১১ সেপ্টেম্বরের ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার আগে আমেরিকায় মুসলিম বিদ্বেষ প্রবল ছিল না। তখন প্রতিবছর ২০ হাজারের মতো মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিত। ১১ সেপ্টেম্বরের পর ঘটনার দায় মুসলিমদের ওপর চাপানো হয়– যদিও আমেরিকার মতো একটি উন্নত রাষ্ট্রে হামলা করার মতো যোগ্যতা ও উপকরণ মুসলিমদের হাতে থাকার কথা নয় এবং মার্কিন মুলুকে ইসলাম বিদ্বেষ চরম রূপ ধারণ করে। এতে একদিকে মুসলিমরা চরম ক্ষতি ও হুমকির মুখে পড়ে, অন্যদিকে ইসলামের প্রতি মানুষের কৌতূহল জন্মে, তারা ইসলাম জানতে আরম্ভ করে, পুরো পশ্চিমা বিশ্বে মুসলিম জাতি ও তাদের ধর্মাদর্শ নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা শুরু হয়। অনুসন্ধানের পর তারা ইসলামের স্বরূপ জানতে পারে এবং তাদের বিদ্বেষ ভালোবাসায় পরিণত হয়। এখন (২০০৩) ২০ হাজারের পরিবর্তে প্রায় অর্ধ লাখ মানুষ ইসলামের ছায়া গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এটাই পরম সত্যের শক্তি। যা ঘৃণা-বিদ্বেষকে ভালোবাসায় পরিণত করে।

মুসলিম জাতি যদি নিজের জীবনাচারকে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শের আলোকে গড়ে তোলে এবং দাওয়াতি দায়িত্ব পালন করে, তবে তারা পৃথিবীর চেহারা বদলে দিতে পারে। এতে তাদের ওপর আপতিত বিপদ ও সংকটের পরিণাম কমবে, আল্লাহর সুরক্ষা-নিরাপত্তা ও সাফল্য লাভ করবে। বিভিন্ন দেশে মুসলিমরা যে রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে তার পরিমাণও কমে আসবে। কেননা তখন ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি জাতিগত বিদ্বেষ কমে যাবে এবং শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো অবশিষ্ট থাকবে। আর মুসলিমরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটগুলো বুদ্ধিমত্তার সঙ্গেই মোকাবিলা করতে পারবে। মুসলিম জাতির ভেতর যদি আল্লাহর নিঃশর্ত আনুগত্য, সত্য দ্বিনের সেবক হওয়ার অনুপ্রেরণা বিদ্যমান থাকে এবং তারা সুস্থ চিন্তাধারা, সহমর্মিতা ও মানুষের প্রতি কল্যাণকামিতা লালন করে তবে সমাজ থেকে মুসলিম বিদ্বেষও বিদায় নেবে। তখন পার্থিব লাভ-ক্ষতির হিসাবই কেবল অবশিষ্ট থাকবে আর তা সমাধান করা কঠিন কোনো বিষয় নয়।

মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তার পেছনে রয়েছে তাদের সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ। তাদের অপকর্ম আড়াল করতে মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে পশ্চিমা মিডিয়া নানামুখী অপপ্রচার চালিয়েছে। মুসলমানের উচিৎ তাদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা বিচার করা। মধ্যপ্রাচ্যের শাসকরা– তারা সামরিক বাহিনী থেকে আসুক বা রাজনৈতিক দল থেকে আসুক সবাই পশ্চিমা রাজনীতিক ও দার্শনিকদের প্রতি অতি আস্থাশীল। তারা ইসলামকে কেবল নিজের পৈতৃক ধর্ম মনে করে এবং জনগণের মনতুষ্টির জন্য ইসলামের আনুগত্যের ঘোষণা দেয়। এজন্য পশ্চিমা রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা সহজে মধ্যপ্রাচ্যের শাসকদের নিজেদের ক্রীড়ানকে পরিণত করতে পারে, তাদের স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এর চেয়েও বড় কথা হলো প্রাচ্যের শাসকরা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অর্থনৈতিক জালে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, তাদের বিরুদ্ধে শক্ত কথাও বলতে পারে না। আর যদি কেউ পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে সাহসী হয়ে ওঠে তবুও শক্তিমত্তা, প্রযুক্তি ও অস্ত্রের অভাবে বেশি দূর এগুতে পারে না।

মুসলিম জাতির সুদিন ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজন সত্যের বাহক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করা, আল্লাহ প্রদত্ত সম্মান রক্ষায় মনোযোগী হওয়া, সময়োপযোগী শিক্ষা, প্রজ্ঞা ও উপকরণ গ্রহণ করা। মুসলিমরা স্বীকার করুক আর নাই করুক তারা পশ্চিমা রাজনীতিক ও বিজ্ঞানীদের প্রতি তাদের আস্থা ও বিশ্বাস অনেক বেশি, তাদের সঙ্গে যোগাযোগও বেশি। ফলে মুসলিম সমাজে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে সত্য উচ্চারণের সাহস খুব কম লোকেরই আছে। অবশ্য মুসলিম সমাজে রাতারাতি পরিবর্তনেরও আশা করা যায় না। এখন প্রত্যেক মুসলমানের প্রথম দায়িত্ব ব্যক্তিগত্য জীবনে দ্বিন পালনে যত্নশীল হওয়া, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দ্বিনি দায়িত্ব পালন করা, ইসলামবিরোধীদের ধোঁকা ও প্রতারণার ব্যাপারে সচেতন থাকা। আল্লাহ সবাইকে তাওফিক দিন। আমিন।[৯০]

সমাপ্ত

[৯০] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ রাবে হাসানি নদভি, তামিরে হায়াত

ইসলাম একটি আদর্শিক জীবনব্যবস্থা। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় ইসলামের ভূমিকা অত্যুজ্জ্বল। ইসলাম তার আবেদন নিয়ে পৃথিবীর সমগ্র মানচিত্রে ছড়িয়ে দিয়েছে এক অনুপম প্রাণশক্তি। ইসলামের মহান আদর্শই ইসলামবিদ্বেষীদের প্রতিহিংসার কারণ। বিশ্বব্যাপী তাদের অনুদার ও সংকীর্ণ প্রচারণায় ইসলামকে প্রতিনিয়ত দানবীয় রূপে হাজির করা হচ্ছে। প্রোপাগাণ্ডার মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে 'ইসলামোফোবিয়া' তত্ত্ব। ফলশ্রুতিতে আধুনিক বিশ্বের অনেকের কাছেই ইসলাম একটি ভীতিকর শব্দ, তাদের কাছে ইসলাম ধর্মের অনুসারী মানেই সন্ত্রাসী-উগ্রপন্থী।

ইসলামবিদ্বেষী এ মহামারীতত্ত্ব ছড়িয়ে পড়ছে পশ্চিম থেকে প্রাচ্যে; এমনকি বাংলাদেশেও এ তত্ত্বের আমদানি করা হচ্ছে সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে। 'বিহাইন্ড দ্য ইসলামোফোবিয়া' বাংলাভাষায় এ বিষয়ে সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। বইটিতে দেশ-বিদেশের গবেষকদের অনুসন্ধানী কলমে উঠে এসেছে পাশ্চাত্যে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে অনৈতিক প্রচারণার স্বরূপ। বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে বয়ান করা হয়েছে—কেন পাশ্চাত্য জগতে ইসলাম ও আরববিশ্বকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়! কেন ইসলামকে অতিরঞ্জিত প্রদর্শনীর মাধ্যমে দানবীয় ও সন্ত্রাসী ধর্মে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়! কীভাবে রাজনৈতিক প্রয়োজনকে বৈধতা দিতে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা ছড়ানো হয়।

বইটি পাঠ করে গভীর মননশীল ব্যক্তিমাত্র উপলব্ধি করতে পারবেন, ইসলামের অনুপম বিষয়াবলি নিয়ে বছরের পর বছর ধরে চলে আসা পশ্চিমের দ্বিমুখী বক্তব্য, নেতিবাচক ও অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিভঙ্গি। অথচ এর বিপরীতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ইসলামের শক্তিশালী অবস্থান ও মানবিক মূল্যবোধ—যার ওপর কখনো পশ্চিমা পণ্ডিতদের চোখ পড়ে না। এ সময়ের নানা রাজনৈতিক ও সামরিক মেরুকরণ, নাইন-ইলেভেনউত্তর পাল্টে যাওয়া বিশ্ব পরিস্থিতি ও পশ্চিমি করপোরেট রাজনীতি ও তথাকথিত মানবতার স্বরূপ সম্পর্কেও জানা যাবে।